বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের সূচনাপর্ব
ইতিহাসের
কাঠগড়ায়
আওয়ামীলীগ
আহমেদ মুসা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা পর্ব

ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামীলীগ

আহমেদ মুসা

প্রচ্ছদ : রেজাউন্নবী

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

দাম : নিউজপ্রিন্ট ৪৫.০০ টাকা
সাদা কাগজ ৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে : বুক প্রমোশন প্রেস,
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০

Bangladeshe Rajnaitik Hattakander Suchana Parba
Etihasher Kathgoraye Awami League

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে অনেক লোকের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতা দেবেন সিকদার, আমজাদ হোসেন, আবদুস সালাম, শান্তি সেন ও সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। কিছু অংশ অনুবাদে সাহায্য করেছেন বন্ধু হাসান তারিক এবং আরেক বন্ধু জাকির হোসেন বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়তনের একটি দেশে, মাত্র আট মাস বাইশ দিন সময়ের মধ্যে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্ত ঝরার বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর সঙ্গত কারণেই কেউ আর প্রত্যাশা করেননি এদেশে নতুন করে রক্তপাত ঘটুক। স্বাধীনতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল অবশ্যই কিছু অঙ্গীকার নিয়ে, অন্যায় রক্ত-পাতের সম্ভাবনাকে চিরতরে নির্মূল করাও ছিলো সেই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বাংলাদেশ আবার প্রত্যক্ষ করলো নতুন রক্তপাত, নব আঙ্গিকে। আর এই রক্তপাত করলো সেই আওয়ামী লীগ, যার কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক, জাতি যার ওপর আরোপ করেছিলো সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে যে সব প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল আও-য়ামী লীগ সরকার ও তার নীতির বিরোধিতা করেছে সে সব দলের নেতাদের দাবি মতে, সে আমলে ২৫ হাজার ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। এ বিষয়ের উপর আজ পর্যন্ত কোনো জরিপ যেহেতু হয়নি সেহেতু বলা চলে সংখ্যার হের-ফের ঘটতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসনামলে সে দলের সৃষ্টি করা বিভিন্ন বাহিনীর এবং দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের হাতে বেশ কয়েক হাজার মানুষকে, বিশেষ করে বামপন্থী নেতা-কর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই হতভাগাদের হত্যা করা হয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে, যে নৃশংসতা অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী সৈন্যদেরও ছাড়িয়ে গেছে। খুন, সন্ত্রাস, নির্যাতন, হয়রানি, নারী ধর্ষণ, লুন্ঠ কোনো কিছুই বাদ রাখা হয়নি।

সূত্রানুযায়ী একটি হত্যা আরেকটি হত্যাকে সম্ভাবিত করে, কিংবা বলা চলে একটি হত্যা অনেক ক্ষেত্রে আরেকটি হত্যার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কোনো হত্যা-কাণ্ডই 'জাস্টিফাইড' নয়—এটাই বোধহয় গণতন্ত্র বা আইনের কথা। কিন্তু সে আমলে বাহাত্তুরের মতো একটি সংবিধান, যেটাকে অনেকে এখনো 'চমৎকার' মনে করেন, বহাল থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে গণতন্ত্র, সংবিধান বা আইনের বাণীকে আড়াল করে, রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে এবং গায়ের জোরে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হত্যাকাণ্ডের যে ছড়াছড়ি, যে প্রবণতা জাতিকে বঞ্চিত করেছে স্বাধীনতার সুফল থেকে, সে হত্যাকাণ্ডের সূচনা ও উৎস খুঁজে বের করা ভবিষ্যতের খাতিরেই প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন ইতিহাসেরও।

এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এবং বিভিন্ন স্তরের রাজনীতিক ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, দুর্নীতি-দুর্ভিক্ষ নয়, আওয়ামী লীগের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের উপর হত্যা, সন্ত্রাস, নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো। তৎকালীন গোপন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, যাদের অধিকাংশকেই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী আত্মগোপনে বাধ্য করেছে, আমার কাছে বলেছেন যে, তাদের নির্মূল করাই ছিলো আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

জাসদ নেতারা বলেছেন যে, জাসদের মতো একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম ও বিকাশ আওয়ামী লীগ মেনে নিতে পারেনি। গড়ে ওঠার পরই দমন-পীড়ন নেমে এসেছে দলের উপর। তারপর বিকাশ রুদ্ধ করার জন্য চালানো হয় হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই জাসদকে গণবাহিনী গঠন করতে হয়েছে।

আর বিরুদ্ধ মতকে দমন-নির্মূল করার জন্যই আওয়ামী লীগকে গঠন করতে হয়েছে রক্ষীবাহিনী, যে বাহিনীর ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, অস্ত্র-শস্ত্রসহ সবই ছিলো প্রবল ও প্রচুর। পাশাপাশি সংকোচিত করা হয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলি-

শের ভূমিকা এবং সুযোগ-সুবিধা। সূত্রগতভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বাহিনীগুলোর মধ্যে। তাই সরকার যখন 'নক্সাল' দমনের নির্দেশ দেন তখন সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিলো নিরপেক্ষ এবং পুলিশের ভূমিকা ছিলো প্রায় নীরব। অন্যদিকে রক্ষীবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বিচারে হত্যা ও সন্ত্রাস চালায়। এ ব্যাপারে মুজিববাদীরা তাদের সহায়তা করে। দ্বন্দ্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বামপন্থীদের ধরে ছেড়ে দিয়েছে কিংবা তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরাসরি জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সামগ্রিক ঘটনায় এই বিষয়গুলো ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষীবাহিনী যখন গঠন করা হয় তখন সেনাবাহিনীর প্রায় সব সদস্যই মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। পুলিশদেরও বিরাট অংশ ছিলো তাই। সুতরাং তাৎক্ষণিক সে দ্বন্দ্ব ছিলো সূত্রাবদ্ধই।

'অপব্যয় হ্রাস'-এর নামে শেখ মুজিব যেখানে সেনাবাহিনীর আয়তন ছোট ও উপকরণ সীমাবদ্ধ রাখার নীতিতে বিশ্বাস করতেন, সেখানে বাড়তি ২৫ হাজারের একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার সময়ই একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়েছিলো। যে প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গেলো প্রতিপক্ষ দমন শুরুর পর।

যে প্রত্যয় নিয়ে আওয়ামী লীগ রক্ষীবাহিনীসহ তার অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে বিরুদ্ধ মতকে নিশ্চিহ্ন ও দমন করতে চেয়েছিলো সে প্রত্যয় ছিলো 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠা। এক কথায় মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা যে কোনো উপায়ে দূর করাই ছিলো তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মৌলবাদী ও ডানপন্থী দলগুলো তখন নিষিদ্ধ, নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল। সঙ্গত কারণেই প্রত্যক্ষ টার্গেট ছিলো বামপন্থী দলগুলোর সে অংশ, যেগুলো মুজিববাদের বিরোধিতা করেছে। আর এই মুজিববাদের বিষয়ে শেখ মুজিব মৌখিকভাবে নীরবতা পালন করলেও সেই নীরবতা ছিলো সম্মতিসূচক। এবং বস্তুগতভাবে তিনি এই প্রয়াসে সহায়তাই করেছিলেন। কিন্তু যে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এত রক্তপাত সেটি যে সুযোগ সন্ধানীদের ভেদ-বুদ্ধির অত্যন্ত নিম্নতরজাত স্তাবকতা ছিলো সে বিষয়টি অনেকের কাছে পরিষ্কার ছিলো তখন। এবং বিষয়টি এতই স্থূল ছিলো যে, যারা এখনো শেখ মুজিবের আদর্শ বাস্তবায়নের কথা বলেন, তারাও এখন আর মুজিববাদের কথা বলেন না। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবীর

সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী ও অবান্তর একটি 'বাদ'-এর। কিন্তু এর জন্য জাতিকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য— বহু রক্তের আকারে।

শেখ মুজিব একাত্তরে রাজাকার-আলবদর ও দালালদের ক্ষমা ঘোষণা করে পাশাপাশি বললেন, 'নক্সাল দেখলেই গুলী করো।' তার এই নির্দেশের হাজারো অপব্যবহার ঘটেছে বাংলাদেশে। মুজিব সরকারের ও তার রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী বাহিনী এই নির্দেশকে হত্যার লাইসেন্স হিসাবে গ্রহণ করে নিধন করেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ব্যক্তিগত শত্রু, এমনকি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের। অর্থনৈতিক স্বার্থও হাসিল করেছে অনেকে। নজিরবিহীন এই নির্দেশ কতটা সংবিধান যা গণতন্ত্রসম্পন্ন ছিলো, বিশেষ করে শেখ মুজিবের মতো একজন নেতার পক্ষ থেকে, যাকে জনগণের বিপুল অংশ দেবতার আসনে ঠাঁই দিয়েছিলেন, সেসব বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে যে, এই নির্দেশ পরোক্ষভাবে হলেও তাকে দান করেছিলো হাজার হাজার মানুষ হত্যার নেপথ্য পৌরহিত্য। এর-পর সিরাজ সিকদার হত্যাকাণ্ডের পর 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' বলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে তিনি অনুমোদন করলেন একটি অকাম্য ধারাকে। তার নক্সাল ও সিরাজ সিকদার বিষয়ক দু'টি বাক্যের মধ্যে সময়ের যে পার্থক্য ছিলো সে সময়টুকুতে ফুঁসে ওঠেছে সারা বাংলাদেশ। একজন সাধারণ মানুষ যার সংস্কৃতির ঘাটতি নেই, এটা উপলব্ধি করেন যে, অন্যায়ভাবে কোন হত্যাই কাম্য নয় এবং কোনো হত্যার খবরই উল্লাসের হতে পারে না। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন চলছিলো শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানী জেলে এবং দলের প্রভাবশালী নেতারা কোলকাতায়। কিন্তু এরপরও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতার লড়াই চলেছে শেখ মুজিবের নামে এবং মূলতঃ যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিলো আওয়ামী লীগের হাতে। এবং শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু তার দলীয় সংকীর্ণতা এবং ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন দমন-পীড়ন দলের পতনকে ত্বরান্বিত ও অনিবার্য করে তোলে।

এবং এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পতনের মূল সূত্র রাজনৈতিক হত্যাণ্ডের মধ্যেই জাতির আশা ভঙ্গের প্রধান কারণও নিহিত রয়েছে। এবং আজকের

বাংলাদেশ তারই উত্তরাধিকার। গণমানুষের স্বপ্নকে, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ধূলিস্যাৎ করেছিলো আওয়ামী লীগ এভাবে। অবশ্য আমি একথা বলতে চাচ্ছি না আওয়ামী লীগের পতন না হলে দেশ 'ধনে-ধান্যে' সমৃদ্ধ হয়ে সোনার বাংলা হয়ে যেতো। সেটি সম্ভব ছিলো না। কারণ তারা মনে করতো, যে মনে করা তাদের রাজনৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত যে, তাদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে লুটপাট করার অধিকারও কেবলমাত্র তাদেরই। কিন্তু বাস্তবতঃ স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছে কিছু চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সমগ্র জাতি, কিন্তু দেশ লুণ্ঠন করেছে এককভাবে আওয়ামী লীগ। তাই এই দলের পতনের কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের অঙ্গীকার ও স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়নি, বরং সে দলের পতনের মূলে যে সব উপকরণ বিদ্যমান ছিলো, যার প্রধানটি ছিল হত্যাকাণ্ড, তার জন্যই আশা ভঙ্গ ঘটেছে জাতির। তাই অবশ্য উন্মোচিত হওয়া উচিত তার স্বরূপ। সেই লক্ষ্যেই আমার এই প্রয়াস।

আমি বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সব অঞ্চলে যেতে পারিনি। যে সব অঞ্চলে গিয়েছি সেখানকার দীর্ঘ বর্ণনাও সংযত করেছি কলেবরের কথা ভেবে। মুজিব আমলের হত্যা-সন্ত্রাসের একটি অসম্পূর্ণ প্রয়াস এটি। তবে পরবর্তী সংস্করণ ও ভল্যুমে আরো তথ্য যোগ করার চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে যাদের কাছে তথ্য আছে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করছি।

মুজিব আমলে পাঁচজন সংসদ সদস্যসহ বেশ কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীও নিহত হয়েছেন। তাদের একাংশ নিহত হয়েছেন উপদলীয় কোন্দলে ও আঞ্চলিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে। আরেক অংশ নিহত হয়েছে চারু-মজুমদারের ভ্রান্ত লাইন অনুসারী বামপন্থী দলের এবং জাসদের গণবাহিনীর হাতে, অনেক ক্ষেত্রে বামপন্থী হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে। তাদের বিষয়েও তথ্য প্রকাশের চেষ্টা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে নয়, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের অপধারার বিরোধিতা করেই আমি এই কাজে হাত দিয়েছি। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সার্বভৌমত্ব

এসেছে দেশের। কিন্তু আজো মায়ের বুকে সন্তানের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারে বারে খালি হচ্ছে মায়ের বুক। রক্ত আর অশ্রু ধুয়ে-মুছে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিঃশেষ কিংবা নিদেনপক্ষে হ্রাস হবার ক্ষেত্রে আমার এই গ্রন্থ যদি সামান্য কিছুও অবদান রাখে তাহলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

উৎসর্গ

এতো ভারবাহী বেদনারাশি বুকে নিয়ে এই বৃদ্ধ কি করে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে আছেন এখনো, আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। মনে হয়েছে কি অন্তর্ঃপ্রাবী যন্ত্রণা এই সুস্থতায়! হয়তো মৃত্যু কিংবা উন্মাদনাই তাকে মুক্তি দিতে পারতো এই নারকীয় যন্ত্রণা থেকে। এবং মন-মননের সূত্র অনুযায়ী তার জন্য সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়। আপন দাওয়ায় বসে বৃদ্ধ বলেছিলেন তার জীবনের দুঃখতম অভিজ্ঞতার কথা। কপালে বেদনার ভাঁজ, চোখে অশ্রু। আঙ্গুল দিয়ে একটা জায়গাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐখানে, ঐখানে আমাকে ও আমার ছেলে রশিদকে হাত-পা বেঁধে তারা খুব মারলো। রশিদকে আমার চোখের সামনে গুলী করলো। ঢলে পড়লো বাপ আমার। একটা কসাই আমার হাতে একটা কুঠার দিয়ে বললো, "তোর নিজের হাতে ছেলের গলা কেটে দে, ফুটবল খেলবো তার মাথা দিয়ে।" আমার মুখে রা নেই। "না দিলে" বললো তারা "তোরও রেহাই নেই।" কিন্তু আমি কি তা পারি? আমি যে বাপ। একটানা দেড় ঘণ্টা মারার পর আমার বুকে ও পিঠে বন্দুক ধরলো। শেষে নিজের হাতে কেটে দিলাম ছেলের মাথা। আল্লা কি সহ্য করবো? বলেন বাবা?

বাজিতপুরের ইকোরাটিয়া গ্রামের এই হতভাগা কৃষক বৃদ্ধের নাম আবদুল আলী, যিনি রাজনীতি বোঝেন না; বোঝেন-না সমাজ বিন্যাস, শোষণ, মার্কস-লেনিন কিংবা ফ্যাসিজম, কিন্তু রাজনীতির নামে তার বুকে চিরস্থায়ী দুঃখের অসহনীয় বীজ রোপণ করা হলো, যে বীজ দিবানিশি কোদাল চালায় চেতনায় আর জাগিয়ে তোলে বেদনাকে। ষাট পার হয়ে গেছে নীলকণ্ঠী এই বৃদ্ধের বয়স।

পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর সে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কিছুদিন পর দুঃসহ যাতনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ইলা মিত্র। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীনতার দাবিদার সংগঠনের লোকেরা তাদের প্রকৃত-স্বরূপ তুলে ধরলো অরুণা সেনের কাছে। মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীদের সীমাহীন অত্যাচার-লাঞ্ছনা সইতে না পেরে অরুণা সেন অন্তকরণের সমস্ত ঘৃণা দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমার অভিশাপে তোরা শেষ হয়ে যাবি।" অরুণা সেনের বয়সও ষাট পেরিয়ে গেছে।

বেঁচে থাকা বৃদ্ধ আবদুল আলী ও বৃদ্ধা অরুণা সেন এবং যারা যুগে যুগে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে জীবন দিয়েছেন আমার এই গ্রন্থ তাঁদের উৎসর্গ করলাম।

অধ্যায় ঃ সন্ত্রাসী বাহিনীসমূহ গঠনের তাত্ত্বিক দিক

আওয়ামী লীগ আমলে প্রবল দমন-পীড়নের মুখেও কিছু পত্রিকা ও গ্রন্থকার সাহসের সঙ্গে সন্ত্রাসী বাহিনী গঠনের পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে পরবর্তীকালেও লেখালেখি হয়েছে। আমি কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

মুজিব আমলে রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য নির্যাতনকারী বাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'সাপ্তাহিক হলিডে' ছিলো বেশ সোচ্চার। এসব বাহিনীর গঠন, উদ্দেশ্য ও সন্ত্রাস সম্পর্কে সে সময় হলিডেতে বেশ কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। আমরা এখানে তিনটি লেখা তুলে ধরলাম।

'দি কেস অব টেরর' শীর্ষক রচনায় লেখা হয়ঃ 'স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এস্টাবলিস্টম্যান্ট কর্তৃক সৃষ্ট সন্ত্রাস তার নগ্নরূপ লাভ করছে। শাসকদের অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস ও আধাসন্ত্রাসের ব্যাপকতার কারণে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।... মুজিববাদের আদর্শ ব্যর্থ হবার পর সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ অবধারিত হয়ে পড়েছে তাদের জন্য। স্বত্ববঞ্চিত নতুন শ্রেণী, যারা এস্টাবলিস্টমেন্টের উচ্চপদে আরোহণ করেছে, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় তারা প্রাথমিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে মুজিববাদের ছায়াতলে। কোন আদর্শ নয়, কেবল তাদের স্বার্থ রক্ষায় তারা ব্যবহার করছে নেতার ক্যারিশম্যাটিক ইমেজ এবং ভুয়াধ্বনি তুলছে সমাজতন্ত্রের। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী যারা সদ্য সম্পদশালী হয়েছে জাতির শ্রমে, তারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও তার নিরাপত্তার জন্য গড়ে তুলছে নতুন উপকরণ। আগের বাহিনীগুলোকে তারা তাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করছে, উপরন্তু নতুন করে গড়ে

তুলেছে নতুন নতুন বাহিনী। নতুন বাহিনীগুলো দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) লাল বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ন্যায় আধা সরকারী প্রাইভেট বাহিনী (খ) প্যারামিলিটারী সংস্থা জাতীয় রক্ষীবাহিনী (জে, আর, বি)।'

'বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজেদের স্বানাধিকারের জন্য আধাসামরিক বাহিনী তৈরী শাসকদের সহজাত স্কীম। জাতীয় রক্ষীবাহিনী তৈরী শাসকগোষ্ঠীর সেই স্কীমেরই অংশ। আধাসামরিক সংস্থা এ ধরনের রাষ্ট্রের সঙ্গে বস্তুতঃ যুক্তই হয়ে থাকে, যা প্রাইভেট আর্মি নয়। এ ধরনের বাহিনী তৈরী কোন সরল বা রুটিনগত ব্যাপার নয়। শাসকগোষ্ঠী বাইরের সহায়তা ছাড়া এ ধরনের বাহিনী গড়ে তুলতে পারে না। সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে সেসব কাজ করানো হবে যে সব কাজ সেনাবাহিনী বা পুলিশের সীমাবহির্ভূত। কিন্তু সে কাজগুলো কি? আসল লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীও সীমান্তের অপর পারে তাদের মদদদাতাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করা। তারপর থেকে রক্ষীবাহিনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন অত্যাচারিত ব্যক্তি রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা, বাড়াবাড়ি ও নির্মমতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনছেন তাতে স্পষ্ট হচ্ছে এই বাহিনী তৈরীর আসল উদ্দেশ্য। এসব প্রমাণ করছে যে, রক্ষীবাহিনী মুজিববাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপমাত্র। গঠনের দিক না হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায়।'

'রক্ষীবাহিনী গঠনে বাইরের শক্তির ভূমিকা চিহ্নিত করা কঠিন। নব্য উপনিবেশে সামরিক প্রতিষ্ঠান সব সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বরকন্দাজ হয়ে থাকে, স্ট্যাটাসকোতে যার খুঁটি রয়েছে। কারণ, এসব দেশের নিজস্ব সম্পদ এত বেশী নয় যা দিয়ে অত্যাধুনিক সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী পালন করা যায়, যেগুলো যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা চালাবে এবং অন্য সময় নির্যাতন চালাবে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাইরের প্রকাশ্য বা গোপন সাহায্য ছাড়া এ ধরনের বাহিনী তৈরি ও লালন-পালন অসম্ভব। আমাদের এ ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির ভূমিকা বলতে প্রতিবেশীর কথাই বুঝানো হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যার স্বার্থের সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে, যেখানে

অবজেকটিভ যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নটি ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে (রাজনৈতিক কুসংস্কার ও প্রতিবেশীর উপদেশে) সেখানে ১৭ হাজারের শক্তিশালী ও বিশেষ বাহিনী বা রক্ষীবাহিনী গড়ার সময় অর্থের টান পড়েনি। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, রক্ষীবাহিনী গড়ার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে বিভ্রমাত্মক স্বার্থ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রক্ষীবাহিনীর গঠন ও পরিচালনা সব কিছুর মধ্যেই একটা গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। এই বিশেষ ও স্বায়ত্তশাসিত আধা-সরকারী বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তুলনা করতে পছন্দ না করলেও এই বাহিনীর কাজের সঙ্গে অনেকেই আবিষ্কার করেছে ভারতের সেণ্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স (সি আর পি)-এর কাজ যে বাহিনী সন্ত্রাসবাদ আক্রান্ত পশ্চিম বাংলায় তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রক্ষী-বাহিনীর নির্দয় অপারেশন, যেখানে সংবেদনশীলতার লেশমাত্র নেই ইত্যাদি তাকে (সি আর পি)র সমগোত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী মূর্তিমান সন্ত্রাস। একে গঠন করা হয়েছে জনগণকে দমনে, বিপ্লবী রাজনীতি উৎখাতকরণে এবং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও তার মুরব্বী ভারতের স্বার্থ রক্ষায় লাঠিয়ালের কাজ করতে। (হলিডে ঃ মে – ১৩, ১৯৭৩)

'ডিসেজ অব কাউণ্টার রেভ্যুলুশন' শীর্ষক রচনায় লেখা হয় ঃ

'জাতীয় রক্ষীবাহিনী এবং ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের মধ্যে কার্য-প্রণালী ও নির্যাতনের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে থাকার শোচনীয় অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে তারা হয়তো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ভীতিকর সংস্থা 'সার্ভিস সেপাশ গ্রুপে'র (এস এস জি) সঙ্গেও সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। দেশ ও নামকরণ নির্বিশেষে এই ধরনের সংস্থাগুলোতে আগাগোড়াই এক ধরনের গঠনমূলক সাদৃশ্য বিরাজ করে—যেহেতু এরা হচ্ছে মূলতঃ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পুঁজিবাদের প্রতিরক্ষায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রতি অনুগত নব্য উপনিবেশের সরকারগুলোর অবস্থান সুরক্ষায় ব্যবহৃত প্রতিবিপ্লবের অস্ত্র। এখানে সাম্রাজ্যবাদ বলতে একচেটিয়া পুঁজির

প্রসার ছাড়াও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও উপ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকেও বোঝানো হয়েছে। শেষের নামকরণটি ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সম্প্রসারণবাদী প্রবৃত্তিকে বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে।'

'বিপ্লবের মতো প্রতিবিপ্লবও একটি বহুল অপব্যবহৃত শব্দ। সমাজতন্ত্রের মতো এটাও শাসক শ্রেণীর ব্যবসার পুঁজি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রায়ই সম্ভাব্য সামরিক বিপ্লবের তোড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য একে ব্যবহার করা হয় কাকতাড়ুয়ার মতো। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জনগণের ভিত্তির দৃঢ়তার সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পায় প্রতিবিপ্লবের তীব্রতা। প্রতিবিপ্লব তার শাব্দিক অর্থের মতোই বিপ্লবের প্রতিপক্ষ। এবং সামন্তবাদ, আধা-সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনাকে প্রতিহত করার জন্য (প্রতিবিপ্লব) ব্যবহার করে শুদ্ধিকৃত উৎপীড়ন। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে এবং এর কুৎসিত চেহারা লুকানোর জন্য পরিধান করে বিবিধ মুখোশ।

হার্ভার্ড মার্কারের ভাষায়, 'প্রতিবিপ্লব' প্রধানতঃ এবং পাশ্চাত্যে সম্পূর্ণরূপেই নিরোধমূলক। এখানে কোনো নতুন বিপ্লবকে বাতিল করা নয় এবং অদূর ভবিষ্যতেও তেমন কিছু নয়। তবুও বিপ্লবের ভীতি, যা সৃষ্টি হয় সাধারণ স্বার্থে, গড়ে তোলে প্রতিবিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ও ধরন।

অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক গঠন প্রণালীতে প্রতিবিপ্লব খোলাখুলিভাবেই আক্রমণাত্মক, যেহেতু একে মুখোমুখি হতে হয় সর্বোচ্চ মাত্রার—বিপ্লবী সম্ভাবনার, এমন কি কখনো বিপ্লবেরও। সেই জন্যই এর নিষ্ঠুরতা আর দমন কৌশলে সে নির্লজ্জ হয়ে থাকে।'

'একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা পরিষ্কারভাবেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতিবিপ্লবের চরিত্র তুলে ধরে। জনগণকে দাবিয়ে রাখার বাধ্যতামূলক ইচ্ছা এবং পরিব্যাপ্ত অথচ অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল বিদ্রোহী সংগ্রামের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় সামরিক আমলাকে নির্বিবাদে গণহত্যার দিকে ধাবিত করে। এবং আমাদের নেতৃত্ব যে নির্দোষভাবে পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ কর্তৃক

"কথার ফাঁদে" পা দিয়ে এবং অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে দুর্বিনীত প্রচারণার মাধ্যমে জাতীয় দমন নীতির বিরুদ্ধে জনগণের এই বিপ্লবী প্রচণ্ডতাকে ছাড়িয়ে যেতে সমপরিমাণে উৎসাহী ছিলেন তাও অস্বীকার করা যায় না।'

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মতো প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলোর কার্যপ্রণালী চরম নিদর্শন বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্যই এইসব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গ ছিলো আজকের থেকে ভিন্ন। প্রসঙ্গ ছিলো জাতীয় দমন এবং অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ, যার একক প্রকাশ ঘটেছিলো তৎকালীন পূর্ব বাংলায়। তখন থেকেই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছে বাংলাদেশের জনগণের যুদ্ধ শুরু এবং প্রতিবিপ্লবের ধাত্রীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও অকালজাততা। সেটা ভিন্ন ও দীর্ঘ প্রসঙ্গ।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। একইভাবে বৈপ্লবিক উত্থানের (যাকে সাধারণভাবে বলা হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব) পূর্বেই তা বিভ্রান্ত করার জন্য (যেহেতু এটা দমনের সাধ্যাতীত) প্রতিবিপ্লবী সংগঠন হচ্ছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী। পূর্বের অনুচ্ছেদে (সন্ত্রাসের স্বরূপ) বর্ণানুযায়ী পুলিশ ও সেনা-বাহিনীর মতো দমনের ঐতিহ্যবাহী হাতিয়ারগুলোকে বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল একে। কারণ হচ্ছে যে, এই দু'টো সংগঠন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে আর কোনভাবেই সঠিক অর্থে এদের নিজেদের উত্তরাধিকারী সংগঠনে পরিণত হয়নি।

বস্তুতঃ এই সংগঠন দু'টোর বিরাট এক অংশ জনগণ ও তরুণ গেরিলাদের (যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা সংগঠনগুলোর সাথে দ্রুত যোগ দেয়) ঘনিষ্ঠ সহ-যোগিতায় সশস্ত্র প্রতিরোধে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। সে জন্যে আমরা সব সময় দেখেছি যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মুজিবনগরের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (যোদ্ধা সংগঠনগুলোকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখেছেন। এইভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের পরা-মর্শ-নির্দেশদাতা ভারতীয় শাসক শ্রেণীর ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে

সশস্ত্র এক জাতি হয়ে গেলো বিতর্কিত। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ধীরে ধীরে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। তথাকথিত জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেই ভেঙ্গে দেয়া হলো শুধুমাত্র তাদেরকেই হতাশ করার জন্য, যারা রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। গ্রাম নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নিয়ে এবং তা আবার সরকারই ভেঙ্গে দিয়েছে— যেহেতু যোদ্ধাতরুণদের উৎপাদনক্ষম উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর কোন লক্ষ্য এই ধরনের সংগঠনগুলোর ছিলো না। লক্ষ্য ছিলো ভারতীয় সামরিকযন্ত্র ও শাসকশ্রেণীভুক্ত তাদের সহযোগীদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে জনগণের মাঝে সন্ত্রাস আর দমন ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা। জাতীয় রক্ষীবাহিনী হচ্ছে এই নারকীয় পরিকল্পনার ফসল এবং স্বাধীনতার চেতনাধারী সংগ্রামীদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, পাছে প্রতিবিপ্লবী বলপ্রয়োগে নীরবে অংশগ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আড়ালে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব বাহিনী হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্মসচিব এই সংগঠনের বেসামরিক প্রধান বলেই পরিগণিত হতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নিয়ন্ত্রণ ছিলো অন্যখানে। গঠনমূলক ও কার্যকরীভাবে রক্ষীবাহিনী হচ্ছে ভারতের সিআরপি-র প্রতিচ্ছবি। পার্থক্য হচ্ছে ভারতে সি আর পি গঠন করা হয় সেখানকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দমনের জন্য এবং সেটি নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। আর রক্ষীবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশিক্ষণদাতাদের মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। রক্ষীবাহিনীর কথিত পরিচালক তার পরিচালিত সংগঠনে কি হচ্ছে তা জানেন কিনা ভাববার বিষয়।'

'এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রক্ষীবাহিনী প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যসব স্তরের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, বিশেষতঃ সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে। (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনীতে ডেপুটেশনে আসা নন-কমিশণ্ড অফিসাররা রক্ষীবাহিনীর কাঠামোতে তাদের অসঙ্গতির কারণে সেনা-বাহিনীতে ফিরে গেছেন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের উদাহরণ প্রচুর এবং সেনা-

বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে ছোটখাটো দুর্ব্যবহার বিভিন্ন জায়গায় [বিশেষভাবে চট্টগ্রামে] গোলমালের সূত্রপাত করেছে। জেলা-মহকুমা শহর বা গ্রামগুলোতে রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা না করে আলাদাভাবেই পরিচালনা করা হয়েছে। আমি নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহ [যা রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়] উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম যা এমনকি সরকারী ও আধাসরকারী সংবাদপত্রে, অবশিষ্ট ক'টি বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রের কথা বাদ দিলেও, ছাপা হয়েছে)।

এখন এই বিরুদ্ধাচারণ কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাকি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাভাবিক ? আমি মনে করি, এটা যতটা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক, ততটাই উদ্দেশ্যমূলক। তাছাড়া বলপ্রয়োগ হচ্ছে ঘৃণার। একজন সহানুভূতি-শীল ব্যক্তিকে রোবটে পরিণত করার জন্যে, যে নিপীড়ন ব্যক্তির চিৎকার ও যন্ত্রণার প্রতি থাকবে নির্মম, প্রতিবিপ্লবী বলপ্রয়োগের সংগঠনকে করা হয় মনুষ্যত্ব-হীন। অতএব সমবেত করা লোকদের লম্পট ও নৃশংস হতে শিক্ষা দেয়া হয়। তাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয় সীমাহীন শক্তির চেতনা। তাদের শিক্ষা দেয়া হয় অন্যদের ঘৃণা করার মাধ্যমে নিজেদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে, যাতে করে মানবীয় সহানুভূতিগুলো তাদের মন থেকে দূর হয়ে যায়। রক্ষীবাহিনীর নির্যা-তনের ভয়ানক কাহিনীগুলোর সঙ্গে শুধুমাত্র হিটলারের এস, এস, ভারতের সি, আর, পি, পাকিস্তানের এস, এস জি, ইন্দোনেশিয়ার ধর্মান্ধ যোদ্ধা ও তাদের মতো অন্যদের নির্যাতনের বিভীষিকার সঙ্গেই তুলনা মেলে।

রক্ষীবাহিনীর অপারেশন ও তার সাথের সন্ত্রাসের কিছু ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া যাক। এইগুলো সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় (রক্ষীবাহিনী কর্তৃক নির্বাচন-পূর্ব তচনচ এখানে উল্লেখ করা হয়নি) প্রচুর নির্যাতন চলছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী খুলনায় রক্ষীবাহিনী আবারও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। দু'জন নিরপরাধ লোকের জীবনাবসান হয়েছে তাদের হাতে। (এপ্রিলের দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৭২)। এইভাবে চার মাসের মাঝে রক্ষীবাহিনীর হাতে পাঁচজনের মৃত্যু হলো। রিপোর্ট

আরো বলা হয়েছে, অবৈধ অস্ত্র রয়েছে শুধুমাত্র এই সন্দেহে রক্ষীবাহি[illegible] আশরাফুল ইসলাম নামক একজন ছাত্র এবং ফেরদৌস শেখ নামক একজ[illegible] ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের গৃহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পূর্ণা[illegible] তল্লাশীতেও অভিযোগ করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। গ্রাম থেকে তি[illegible] মাইল দূরে দৌলতপুর থানায় অন্য বারোজন সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাদে[illegible] দু'জনকেও আনা হয়, দৌলতপুরের পুলিশ ভয়ের সঙ্গে দেখল যে, ছয়জনে[illegible] মধ্যে দু'জন মৃত। রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত অন্য তিনজন হচ্ছেন খুলনা, যশো[illegible] বাহিরদিয়ার আবদুল জব্বার ও আবদুল খালেক এবং কৃষক সমিতি[illegible] কমলেশ চন্দ্র দাস। জনৈক দুর্নীতিপরায়ণ আওয়ামী লীগ সদস্যের হত্যাকাণ্ডে[illegible] সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথম দু'জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হ[illegible] এবং কমলেশকে গুলী করে মারা হয়।'

'অন্যান্য আরো ঘটনাবলী রয়েছে, যার কিছু উদাহরণ আমি লিপিব[illegible] করছি। রাজশাহী জেলার রক্ষীবাহিনী কমাণ্ডার বি, কে সরকার ছাত্রলীগে[illegible] (রব-সিরাজ) কর্মী নার্গিস সিদ্দিকীকে ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর তা[illegible] বস্তাবন্দী মৃতদেহ পাওয়া যায়। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়ে অ[illegible] একজন জাসদ কর্মী চুন্নু এখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন পাবনা জেলে।'

'এই সমস্ত ঘটনাবলী বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোমহর্ষক অত্যা-চারের এবং খোদা না খাস্তা পশ্চিমবঙ্গের সি আর পি-র হত্যাকাণ্ডের কথ[illegible] মনে করিয়ে দেয়। তারা হত্যা ও বিনাশ করছে "দুষ্কৃতকারীদের"। প্রশাসন ও[illegible] তাদের প্রভুদের মতে "দুষ্কৃতকারী" শব্দটি বোঝায় মওলানা ভাসানী থেকে[illegible] শুরু করে মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল মতিন পর্যন্ত সবাইকে। এবং বর্তমানে[illegible] সমস্ত জনসাধারণ হচ্ছেন "দুষ্কৃতকারী"। পাকিস্তানী সময়ের মতো বাঙালীরা হচ্ছেন "দুষ্কৃতকারী" জাতি।

এইভাবে রক্ষীবাহিনী হচ্ছে প্রতি-বিপ্লবের অস্ত্র যার উপর এমনকি সর্বভুক শাসক শ্রেণীরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর অনুগত এক[illegible]

সরকারকে এবং ভারতীয় উপ-সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণবাদী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এটা হচ্ছে সি আর পি'র সম্প্রসারণ। এর নিঃশ্বাসে রয়েছে মৃত্যু আর ভীতি। আপনি অথবা আমি যে কেউ হতে পারি এর শিকার এবং বাংলাদেশের প্রশাসনের পুস্তকে আমরা পরিচিত হব "দুষ্কৃতকারী" হিসেবে। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের নিজেদের ও জনগণকে রক্ষীবাহিনীর কার্য-ক্রম, গঠন ও আর্থিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে— যেহেতু এটা (সরকার) এমনকি রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধেও যেতে পারে, পাছে রক্ষীবাহিনী নিজস্ব এক পথ বেছে নেয়।

(হলিডে ঃ ২০ মে, ১৯৭৬)

'স্যাংশান টু দি ফিল ভিসেণ্টার' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়ঃ 'একজন প্রধানমন্ত্রী যখন প্রকাশ্য জনসভায় নির্দেশ দেন যে "নক্সালদের দেখামাত্র গুলী কর" তখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য অন্য কোন অনুমোদনের আর দরকার পড়ে না। বাংলাদেশের প্রধান কুলপতির শীতল এই ঘোষণার মধ্যেই সম্ভবতঃ নিহিত ছিল তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত মনস্তত্ত্ব যার প্রকাশ ঘটেছে অবচেতনভাবে। আর এই খেলার প্রকাশ্য রূপ দেখা গেল, যাতে প্রতিভাত হলো যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ তারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবে না।'

'তাই পুলিশ ফোর্স, যারা গত বৃহস্পতিবার সকালে ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালের প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো রক্তের স্বাদ গ্রহণ করেছে, হয়তো তারা নেড়ে-চেড়ে পরিষ্কার করছে তাদের নবগৃহীত অটোমেটিক অস্ত্রগুলো, যাদের পছন্দনীয় শিকারদের রক্তপাতের জন্য জ-বাবদিহির সম্মুখীন হবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্লিপ্ত হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাদ পড়বেনা সরল রাজ-নৈতিক পর্যবেক্ষকরাও। বাঙালীদের মধ্যে নক্সালরা যেখানে আলাদাভাবে চিহ্নিত কোন জীব নয় সেক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতের যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বুলেটের খোরাক হবার পথ প্রশস্ত করা হলো, এটা করা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের ক্ষমতা সংরক্ষণের স্বার্থে।'

'নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতাযুদ্ধ সমাপ্তির পর সশস্ত্র বিক্ষোভের ফলে সৃষ্ট তীব্র ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজনীতির মোড়কে এ ধরনের বক্তব্যদান জাতিকে দুর্ভাগ্যজনক ও ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে। এই নির্দেশ পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করবে এবং বিভিন্ন বাহিনীর ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পথে ঠেলে দেবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক পুলিশকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে নিয়োজিত করার ফলে, যা অতীতের শাসক-শোষকরা করেছিল, একথাই প্রমাণিত হবে যে, আমাদের নেতারা ইতিহাসের প্রাথমিক শিক্ষাও গ্রহণ করেননি। ... "নক্সাল"দের গুলী করার হুকুম এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত বিশেষ করে বামপন্থীদের প্রতি হুমকি, একমাত্র ফ্যাসিবাদের মুখোশই উন্মোচন করবে।

(হলিডে, ২ এপ্রিল ১৯৭২)

এ সম্পর্কে মওদুদ আহমেদ তার গ্রন্থ 'বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল'-এ লিখেছেন: একটিমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমে এ সমস্ত বহুবিধ সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হয়, এবং সেটি হলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আধা-সামরিক বাহিনী। এর আগেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছিলো যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শান্তি রক্ষার পথে বড় রকমের বিপর্যয় আসা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবে না। উপরোক্ত সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কোলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মনেই রেখাপাত করেছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো যে, এই বাহিনী হবে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত। দেশের অভ্যন্তরে আইন রক্ষার জন্য এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে, এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবে সেনাবাহিনীকে। অন্যদিকে এই বাহিনী থাকবে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে একটি সুসজ্জিত আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের কাজটি অবশ্যই

অসঙ্গত হবে না। একথা সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া ছিলো।'

'রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটি আইন প্রাণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাহিনীতে সদস্য নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য এসময় ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হবার আগেই এই বাহিনী তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। এভাবে ভারতীয় উপদেষ্টা এবং সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হবার সাথে সাথেই ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।'

'একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা প্রয়োজন সেনাবাহিনী বা পুলিশ আইনের মতো তেমন একটি আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিলো অনুপস্থিত। একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হলেও এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই আইনের সংজ্ঞায় 'রক্ষী' শব্দটি বাহিনীর অফিসার পদে সাধারণ সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হবে সরকার-নির্ধারিত পন্থায় এর জন্য 'রক্ষী' এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে (অনুচ্ছেদ ১৮)। উক্ত বাহিনী পরিচালনা ব্যবস্থাপনার জন্য আইনে উল্লেখ করা হয় যে, এই বাহিনী

তদারকীর দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং আদেশে উল্লেখিত আইন ও তার বিধানাবলীর ভিত্তিতে পরিচালকের মাধ্যমে এই বাহিনী প্রশাসিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অথবা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এ বাহিনী কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ৭)। সরকার তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক এবং অন্যান্য অফিসার বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করবেন। আইনের আওতাধীন রক্ষী এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং শৃঙ্খলাবিধি আরোপ করা হচ্ছে বলে আইনের ১১ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়। ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উক্ত আদেশবলে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিংবা বিশেষভাবে নির্দেশিত নিয়মে, এই আদেশের আওতাধীন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুত করা যাবে।'

'আদেশে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাহিনীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবেন।'

'এই ছিলো রক্ষীবাহিনী আদেশের মূল গঠন বৃত্তান্ত। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, 'অপরাধ দমন এবং সূত্র অনুসন্ধানের' জন্য পুলিশ বাহিনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী আদেশ ছিলো পুরোপুরিভাবে নীরব এবং ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও যুক্তি এ প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরনের এবং বাহিনীর বিস্তারিত কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তার ছাপ ছিলো না।'

কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারি কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগগিরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানতঃ যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তাহলো বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মত এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিকভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে 'ভুয়া রেশন কার্ড' উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি নিরূপণের কোন বিধান ছিলো না। অচিরেই এগুলো আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যেকোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুরসংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং এর ফলে জনমনে ক্রমশঃ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে।'

'যেকোন আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিলো দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ

ধরনের সংস্থার মতো কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিলো না। তাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য আইনের প্রক্রিয়া অনুসরণ, যেকোন গৃহ তল্লাশী বা সম্পত্তি সীজকরণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলাবারুদের হিসাব রাখার কোন বালাই ছিলো না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন আচরণবিধি কিংবা কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিলো না।'

'যখন রক্ষীবাহিনীর আচরণ এবং ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন ২০ মাস কার্যধারা পরিচালানায় ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনী কোনো কোনো তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেও একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের মূল আদেশে প্রথমবারের মতো একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ৮ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে অনেক পিছিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যেকোনো আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যেকোনো সদস্য বা অফিসার ৮ নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যেকোনো আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশতঃ যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার; (২) যেকোনো ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশী বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকানো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তার সম্পত্তি হস্তগত করার পর একটি রিপোর্টসহ তাকে নিকটবর্তী থানায় হেফাজতে প্রেরণ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

'আইনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা

তাদের যেকোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।'

'রক্ষীবাহিনী সরকারের কোন নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হতো। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজকর্ম করতো। বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ এবং সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত দাবীর পরেও এদের গঠনপ্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি।'

'জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসতো। এদের পোশাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাকের সাদৃশ্য ছিলো এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর নির্মাতা বলে দাবী করতো। রক্ষীবাহিনীর আওয়ামী লীগপন্থী আচরণের ফলেই জনমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর গঠনপ্রণালী এবং কাজের ধরন ও পদ্ধতি ছিলো ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অনুরূপ। এটা সত্য যে, ভারতে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় প্রশিক্ষকরাই প্রথম রক্ষীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়। তবে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভারতীয় বাহিনী থাকার অভিযোগ সত্য ছিলো বলে মনে হয় না।'

'যাই হোক, জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনো ভালো কাজই করেনি, একথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণ বেআইনী অস্ত্র এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারী এবং অবৈধ গুদামজাতকারীরা রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই আতংকবোধ করতো। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করায় এই সুনাম তারা ধরে রাখতে পারেনি। চোরাচালানকারী, মজুতদার, দুর্বৃত্ত এবং বেআইনী অস্ত্রধারীদের

যে বিশাল অংশ আওয়ামী লীগের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলো, অভিযানকালে রক্ষী-বাহিনী অনেক সময় তাদের উপর চড়াও হয়নি। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করতেও রক্ষীবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলো। কাজেই যথার্থ একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে রক্ষীবাহিনী অচিরেই এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি প্রায়ই সাধারণ এবং নিরপরাধ লোকদের জীবন-যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। সরকারের বিরোধী দলীয় যে কাউকে তারা দেশবিরোধী বলে মনে করে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। ফলে দুর্ভাগ্য-জনকভাবে সরকারের একটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী হিসেবেই রক্ষীবাহিনী তার পরিচিতি অর্জন করে।'

'সুনির্দিষ্ট কোন আচরণবিধি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে রক্ষীবাহিনীর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলাও অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। পদমর্যাদা নির্ধারণ থেকে শুরু করে খাদ্য, রেশন সামগ্রীর পরিমাণ পর্যন্ত ছিলো এই কলহের কারণ। জনগণের কাছে ভাবমূর্তি হারাবার সাথে সাথে রক্ষীবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলছিলো। রক্ষীবাহিনীর আয়তন বাড়ার সাথে সাথে এদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে সরকার পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনীর আদেশে একটি সংশোধনী আনেন। একটা বিশেষ বিষয় হলো যে, সরকার রক্ষীবাহিনীর জন্য কোন আচরণবিধি প্রণয়ন না করে পক্ষান্তরে আইনেই সংশোধনী এনে বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের চেষ্টা চালান।

'প্রধানতঃ বাহিনীর সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণ এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনের লক্ষ্যেই এই সংশোধনী আনা হয়। আদেশের সংজ্ঞা বা অনুচ্ছেদ-২ গোটা পুনর্বিন্যস্ত করে ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানী, প্লাটুন, রেজিমেণ্ট, জোন ইত্যাদি গঠন করা হয়। এর আগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে দুর্বৃত্ত, বিশেষ আদালত, বিশেষ সংক্ষিপ্ত

আদালত ইত্যাদি এবং পদমর্যাদা নির্ধারণের লক্ষ্যে উর্দ্ধতন অফিসার, অধঃস্তন অফিসার ইত্যাদির সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যায়িত করা হয়। এর ৪ নং ধারায় নতুন একটি বিধান সংযোজিত করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনী হবে একটি সুশৃংখল বাহিনী এবং সংবিধানের ১৫২ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সু-শৃংখল বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৫ নং অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে বিরাট সংখ্যার উর্দ্ধতন অফিসার এবং একটি নতুন শ্রেণীর অধঃস্তন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই সংশোধনী বলে যুগ্ম, উপ এবং সহকারী পরিচালক এবং লীডার, সিনিয়র ডেপুটি লীডার ও ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট লীডারের পদও সৃষ্টি করা হয়।

'অফিসার এবং রক্ষীদের মধ্যে শৃংখলা আনয়নের জন্য দুটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে দুটি নতুন অনুচ্ছেদ ১০ (ক) ও ১৩ (খ) সংযুক্ত করা হয়। ১০ (ক) অনুচ্ছেদ ছিল পরিচালক বাদে সমস্ত অফি-সার এবং রক্ষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সমস্ত অপরাধের প্রেক্ষিতে বিচার ও ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশনের বিধান থাকে সেগুলোর মধ্যে ছিলো বিদ্রোহ ও উস্কানী, উর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে অন্যায় আচরণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শত্রু বা অস্ত্রধারী কোন রাষ্ট্রবিরোধীর স্বার্থ সংরক্ষণ, অনধিকারের সঙ্গে কমাণ্ডিং অফিসারকে পরিত্যাগ করা, কলহে লিপ্ত হওয়া, ছুটি ছাড়া গার্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়া, বিনানুমতিতে কোন সম্পত্তি লুটের উদ্দেশ্যে কারো বাড়ীতে হানা দেয়া ইত্যাদি। এসব কারণে সর্বোচ্চ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান থাকে এবং বিশেষ আদালতে এ সমস্ত বিচার পরি-চালনার ব্যবস্থা রাখা হয়।'

'একইভাবে ১০ (খ). অনুচ্ছেদে পরিচালক ব্যতীত অফিসার এবং রক্ষী-দের জন্য ২৫টি বিশেষভাবে চিহ্নিত অপরাধের প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বিশেষ আদালতে বিচারের বিধান রাখা হয়। ওগুলোর মধ্যে ছিলো উন্মত্ততা, কোন সেন্ট্রিকে আঘাত করা, কর্তব্য পালনকালে জুয়া খেলা কিংবা অন্যান্য আইন বহির্ভূত কাজ করা, অধঃস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি। বিশেষ সংক্ষিপ্ত

আদালতে বিচারের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকে। ১৭ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে এই আইন আদেশ জারির দিন থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়।'

'এটা আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে, রক্ষীবাহিনী আয়তনে সম্প্রসারিত হবার অনেক পরে এই সংশোধনী আনা হয় এবং অনেক পিছনের তারিখ থেকে তা কার্যকর করার কথা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই তা বলবৎ করা হয়েছিলো। রেজিমেণ্ট, প্লাটুন ইত্যাদি নামকরণের ক্ষেত্র বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে আসলে রক্ষীবাহিনীকে একটি নতুন বিশেষ ধরনের সামরিক বাহিনী হিসেবেই গড়ে তোলা হচ্ছিলো। সংশোধনীর মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বিধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আচরণবিধির অনুপস্থিতিতে জনগণের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের আচরণ আগের মতোই থেকে যায়। বরং এই সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা এটাই প্রমাণ করে যে, রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা বিদ্যমান ছিলো এবং রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ি সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগও একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না।'

('বাংলাদেশ দা এ্যারা অব শেখ মুজিবুর রহমান' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জগলুল আলম: পৃষ্ঠা: ৭৪—৭৮ ও ৮৩—৮৬)।

হায়দার আকবর খান রনোর অভিজ্ঞতা

রক্ষীবাহিনীর উৎস যে কত শক্তিশালী এবং এর হাত যে রাজনৈতিকভাবে কত প্রসারিত ছিল হায়দার আকবর খান রনো তাঁর এক লেখায় সেটা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন: 'ঝিনুকের জীবনটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। না-ও বাঁচতে পারত। যদি ভাগ্যক্রমে ঘটনার যোগাযোগ এমনভাবে না হতো তাহলে সেদিন যে তরুণ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত,

ক'জনই বা তার নাম জানত? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সদ্য ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর দমন অভিযানের শিকার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের ক'জনের নাম আমরা জানি? বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন বামপন্থী দল বলেছে, আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের রাজত্বকালে কয়েক হাজার দেশপ্রেমিক বামপন্থী কর্মীকে মারা হয়েছে। কিন্তু সঠিক সংখ্যা কে দিতে পারে? হত্যা হয়েছে অনেক এবং তা যে হাজারের ঘরে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেদিন এক আড্ডায় রাজনীতির নানা ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে উঠল শেখ হাসিনার প্রায়শঃ উচ্চারিত একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে, '৭৫-এর পরিবর্তনের পর থেকেই নাকি এদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তা ব্যাখ্য করার প্রয়োজন নেই। কারণ, '৭৫-এর পূর্ববর্তী আর কোনো হত্যার খবর কেউ না রাখলেও সিরাজ শিকদারের হত্যার খবরতো কারো অজানা নয়। তবে এই সময়কালে একমাত্র সিরাজ শিকদারকেই হত্যা করা হয়নি। এই হত্যার তালিকায় কয়েক হাজার নাম হবে। ওই তালিকায় হয়তো আরো একটি নাম যুক্ত হতো—ঝিনুকের নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনুক বেঁচে গিয়েছিল। সেদিন-কার আড্ডায় ওই আলোচনার প্রসঙ্গ ধরেই বলেছিলাম ঝিনুকের কাহিনী।

ঢাকার নিকটস্থ শিবপুর উপজেলার যুবক মজিবর রহমান। ডাক নাম ঝিনুক। ১৯৭১ সালে সে ছিল একজন সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭৪ সাল। তারিখটা ঠিক মনে নেই। ঝিনুককে গ্রেফতার করা হলো মতিঝিলের এক রেস্তোরাঁ 'মধুবন' থেকে। তখন বিকেল চারটা/সাড়ে চারটা হবে। খবরটা নিয়ে এল ঝিনুকের এক বন্ধু। এতটুকুই শুধু খবর নয়, আরো খবর আছে। আজই রাত ১১টার মধ্যে ঝিনুককে মেরে ফেলা হবে, রক্ষী-বাহিনীর সিদ্ধান্ত। ঝিনুক ভাসানী ন্যাপ করতো। বন্ধুটিও পাকিস্তান আমলে তা-ই করত। কিন্তু স্বাধীনতার পর সে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে যোগদান করেছে এবং সামান্য কিছু ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে। দলীয় সোর্স

থেকেই সে জেনেছে রক্ষীবাহিনীর এই সিদ্ধান্তের কথা। বন্ধুটি যতই এখন আওয়ামী লীগ যুব লীগ করুকনা কেন, পুরোনো বন্ধুর এই খবর তাকে বিচলিত না করে পারেনি। কিন্তু কিভাবে বন্ধুর জীবন রক্ষা করা যায়। সে নিজে দলের যে নীচু পর্যায়ে অবস্থান করে, তাতে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই সে প্রায় উদভ্রান্তের মতো হয়েই ছুটে এসেছে আমাদের কাছে—আমরা যারা তখন বিরোধী দলে ছিলাম। দলীয় কার্যালয়ে তখন ছিলাম আমি, বন্ধু মেনন ও কাজী জাফর আহমদ। কিন্তু আমরাই বা কিভাবে বাঁচাবো? ফোন করলাম রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে। তাকে পাওয়া গেলনা। যোগাযোগ করলাম ঢাকার ডিসি ও এসপি-কে। তাঁরা জানালেন, রক্ষীবাহিনী ধরেছে, তাদের কিছু করার নেই। উপায়ান্তর না দেখে গেলাম জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছে। তিনি এখন মৃত। তাঁকে ঘটনাটা বললাম। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কখন ধরেছে। বললাম, বিকেল চারটায়। মন্ত্রী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দিনের বেলায় সবার সামনে থেকে ধরলে মারা হবে না, ভয় নেই। বলা বাহুল্য এই অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বললাম, যদি মারে? মন্ত্রী বললেন, দেন আই শ্যাল নট লেট ইট গো আন প্রোটেস্টেড। আমি বললাম, প্রোটেষ্ট করে কি হবে, জীবন কি ফিরে পাওয়া যাবে? যাই হোক, কোন কাজ হলো না। ফিরে এলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, সর্বোচ্চ অথরিটিকেই একবার এপ্রোচ করা যাক। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকেই সরাসরি টেলিফোন করা হলো। তিনি তখন ৩২ নম্বরের বাসভবনে ছিলেন। তিনি ফোন ধরলেন এবং আমাদের কথা শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কে ধরেছে—রক্ষীবাহিনীর নাম শুনে তিনি আবার বললেন, ঠিক করে বল, কে ধরেছে রক্ষীবাহিনী না স্পেশাল পুলিশ? তিনি আরো বললেন, রক্ষী বাহিনীর এই অথরিটি নেই। এই কথার তাৎপর্য তখন ঠিক বুঝিনি। বোধ হয় ঢাকা শহরে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা চালানোর এখতিয়ার ছিল না। ঢাকার জন্য রয়েছে স্পেশাল পুলিশ। স্পেশাল পুলিশেরও বহু লোমহর্ষক কাহিনী তখন আমাদের জানা ছিল। তবে ঝিনুকের কেসটা শিবপুরের, ঢাকার বাইরের, তাই রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করেছে। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী

কথা দিলেন, 'আমি এখনই খবর নিচ্ছি'। পরে জানতে পেরেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করেন এবং ঝিনুককে আর মারা হয়নি। শুধু তাই নয়, পরদিন সকালে সে মুক্ত হয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো। এমনকি তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাও দায়ের করা হয়নি। বস্তুতঃ বিরোধী দল করে এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার মতো কোন ঘটনাও ছিল না।

ঝিনুক নিশ্চয়ই প্রাণ রক্ষার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু গোটা ঘটনাটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? এটা কি ক্ষমতার শীর্ষ ব্যক্তির মহানুভবতারই একটি দৃষ্টান্ত? তিনি যদি মহানুভব হয়েও থাকেন, তবুও তো প্রশ্ন থেকে যায়। কয় জায়গায় ক'জন এই রকম সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জীবন ভিক্ষার আর্জি পেশ করার সুযোগ পেয়েছে? বস্তুত তখন সারাদেশেই রক্ষীবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের এক তাণ্ডবলীলা চলছিল। যশোরের (ঝিনাইদহের) কালীগঞ্জের এক রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প উঠে গেলে সেখানে এক গণ কবর আবিষ্কার করা গেল। ৬০টি কংকাল পাওয়া গিয়েছিল।

'তাহলে রাজনৈতিক হত্যা' '৭৫-এর পর থেকে শুরু হয়নি। সবক'টি আমলেই রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে এবং এইসব হত্যার পিছনে ক্ষমতাসীন শাসক দলই ছিল। মুজিব আমলে হয়েছে, মুশতাক আমলে হয়েছে, জিয়ার আমলে হয়েছে, এই আমলেও হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জ ডিমিটভ (সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা) বলেছিলেন, এখন সব পুঁজিবাদী দেশেই কম-বেশী ফ্যাসিবাদের ঝোঁক দেখা যায়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী করে সত্য। ফ্যাসিবাদী প্রবণতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে রাজনৈতিক হত্যা। শাসকগোষ্ঠীই রাজনৈতিক হত্যা চালায়। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন বিরোধী দলও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালায়। যেমন আমাদের দেশে চালিয়েছে সর্বহারা পার্টি, গণবাহিনী, ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নামধারী কোনো কোনো দল। কিন্তু এই সব বিরোধী দল যত না শাসক দলের লোক মেরেছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী মেরেছে শাসক দল। উপরন্তু প্রতিটি সরকারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়,

শাসক দলই প্রথম হত্যা শুরু করে। সর্বোপরি যদি শাসক দল গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, যদি আইনের প্রতি তাদের অনুগত্য থাকে, তবে বিরোধী দলের সশস্ত্র তৎপরতা বিকাশতো দূরের কথা, জন্মও নিতে পারে না। কিন্তু হায়, এত 'যদি' কখনো কি সত্য হতে পারে। আমাদের মতো দেশে লুটেরা ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি শাসকরা কেউই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না।

রাজনৈতিক হত্যা প্রধানত হয় বিরোধী দলকে নিঃশেষ করার জন্য। সব হত্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকেনা। শাসক দলের স্থানীয় নেতারাই সাধারণত স্থানীয় প্রতিপক্ষকে শেষ করে ফেলার জন্য কাপুরুষের মতো হত্যার পথ বেছে নেয়। আবার একই দলের মধ্যে প্রতিপক্ষকে শেষ করার জন্যও খুনোখুনি হয়। বাংলাদেশে এই ঘটনাও অনেক আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক মাসের মধ্যেই আগরতলা মামলার আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে হত্যা করা হলো। এখানে খুনী এবং যাকে খুন করা হলো উভয়পক্ষই আওয়ামী লীগের। ১৯৭২ এর জানুয়ারী মাসে ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথ থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে তুলে নিয়ে হত্যা করে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই হত্যা করা হয় নরসিংদীর বীর মুক্তিযোদ্ধা নেভাল সিরাজকে। নেভাল সিরাজ ছিলেন ভাসানী ন্যাপের লোক এবং নরসিংদী অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা। একদিন বিকেলে কোনো অজানা গুপ্তঘাতকের গুলীতে তিনি নিহত হলেন। তবে গুপ্তঘাতক কারা তা একেবারে অজানা ছিলনা। তারা ছিল স্থানীয় মুজিব বাহিনীর লোকজন। স্বাধীনতার উষালগ্নেই এইভাবে শুরু হলো হত্যার রাজনীতি।

সেই সময়ের কথা যাদের স্মরণ আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মহসীন হলের টিভি রুমে সাতজন ছাত্রকে গুলী করে হত্যার কাহিনী। এই ঘটনাটি ঘটেছিল শাসক আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের অন্তর্বিরোধের কারণে। হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হন শফিউল আলম প্রধান, তখন তিনি মুজিববাদী ছাত্রলীগ নেতা। প্রধান পরে গ্রেফতার হন, কিন্তু জিয়াউর রহমান আমলে তিনি মুক্তও হন। মহসীন হল হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে আরেকটি ঘটনা ঘটে

জগন্নাথ হলের কাছে। সন্ধ্যাবেলায় চারজন যুবককে হাতপা বাঁধা অবস্থায় গুলী করে হত্যা করে। কে বা কারা তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় একটি সরকারী সংস্থাই পরিকল্পিতভাবে এই হত্যা সংগঠিত করে। বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে সরকারী পর্যায়ে সংগঠিত করা হয় স্পেশাল পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী। তাছাড়া আরো ছিল শাসক দলের রাজনৈতিক কর্মীদের উচ্ছৃংখল সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। তারা সন্ত্রাস চালাতো। ইচ্ছামতো খুন করার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পুলিশ তাদের দেখেও না দেখার ভান করতো অথবা পরোক্ষভাবে সাহায্যই করতো। ফ্যাসিস্ট ইতালীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন সাংবাদিক জে কার্টার নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছিলেন (১৯২১), সারা ইতালীতে ফ্যাসিষ্টরা তাদের বিরোধীদের মারধর করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, অথচ সরকার নিরপেক্ষতার ভান করছে। 'লা ফ্যাসিজম' বইয়ে ফ্যাসিষ্ট সম্বন্ধে জি প্রজোলিনী লিখেছেন, 'তারা (ফ্যাসিষ্টরা) সশস্ত্র বাহিনীরূপে চলা-ফেরা করতে পারতো, খুশীমতো হত্যা করতে পারতো। তারা নিশ্চিত যে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করবে না। আওয়ামী লীগ আমলে অবস্থাটি হুবহু এই রকমই ছিল। রাজশাহীর তানোর অঞ্চলে রক্ষীবাহিনী চালিয়েছিল সংগঠিত হত্যাকাণ্ড—বিরোধী সাম্যবাদী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। জাসদ গঠনের পর পরই শাসক দলের সশস্ত্র গুণ্ডা-বাহিনী হত্যা করল জাসদ নেতা সিদ্দিক মাষ্টারকে (১৯৭২, ১২ নভেম্বর)। একইভাবে '৭৪ সালে হত্যা করা হলো জাসদ নেতা এডভোকেট মোশাররফকে (৩রা জুন '৭৪)। খুন করা হলো জাসদ সমর্থক ছাত্র নেতা জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রোকনকে। একদিন গভীর রাত্রে প্রেমানন্দের বাসগৃহ ঘিরে ফেলল রক্ষীবাহিনী। প্রেমানন্দ দাস মুন্সীগঞ্জের লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা। রক্ষীবাহিনী জানালার ফাঁক দিয়ে রাইফেলের তাক করলো ঘুমন্ত প্রেমানন্দের দিকে, তারপর গুলী চালিয়ে হত্যা করলো। আরো কত ঘটনা বলব? বলে কি শেষ করা যাবে।'

(স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড: তারকালোক ডাইজেষ্ট: জানুয়ারী '৮৭: পৃষ্ঠা ১০–১৫)

'রক্ষীবাহিনীতে কারা ঠাই পাচ্ছে?' শীর্ষক প্রতিবেদনে সাপ্তাহিক মুখপত্র : পত্রিকায় লেখা হয় :

'স্বাধীনতার পর দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য গঠন করা হয়েছে রকমারী বাহিনী। এসব বাহিনী গঠন করে শান্তি রক্ষা কতটুকু সম্ভব হচ্ছে সে কথা জনসাধারণ ভাল করেই ওয়াকেবহাল আছেন। তবে এই রংবেরং-এর বাহিনীর দৌরাত্ম্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ অবস্থা আরও বেগতিক আকার ধারণ করেছে। প্রায়ই দেখা গেছে যে, একই ঘটনায় বিভিন্ন বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এর ফলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। অনেক সময় এ সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরস্পর বিরোধী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাতও হয়েছে। বাহিনীদের এহেন 'হামবড়াই' কাণ্ড-কারখানার জন্য সরকার দায়ী। কারণ, এসব বাহিনী গড়ে তোলার পেছনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সুচিন্তিত বিচার বিবেচনার অভাব ছিল। তা ছাড়া গঠন করার সময় এই বাহিনীদের আওতার সীমারেখা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি, এদের তৈরী করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ভাবটা যেন 'তোদের ছেড়ে দিলাম, চড়ে বড়ে খা'। এদের দৌরাত্ম্যে জনসাধারণের জীবন ওষ্ঠাগত, পুলিশ বাহিনী বিপর্যস্ত। কারণ, পুলিশ বাহিনী আর কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ইত্যাকার বাহিনীরা অযাচিতভাবে পুলিশের কাজে নাক গলাচ্ছে। এর পরিণতি কি তা সময়ই প্রমাণ দেবে। তবে এটা জলবৎ পরিষ্কার যে, এর ফল শুভ হবে না। সময় থাকতে সচেতন হওয়া কি সরকারের পক্ষে ভাল নয়?'

'এ প্রসঙ্গে দেশের রক্ষীবাহিনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে কার্ফ্যুর নামে রক্ষীবাহিনীর হাতে সাধারণ মানুষের হেনস্তা হওয়ার অনেক চাঞ্চল্যকর সংবাদ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে। আইনের নামে এহেন রসিকতার অর্থ জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে। তারা হৃদয়ঙ্গম করেছে, বিগত ২৫ বছরের তোগলকী ভূত বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হয়নি।'

'যা হোক, এ গেল বাহিনীর কার্যকলাপের কথা। এ ছাড়াও শোনা যাচ্ছে যে, রক্ষীবাহিনীতে লোক নিয়োগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। কয়েকটা বিশেষ জেলা ছাড়া অন্য এলাকার লোকদের রক্ষীবাহিনীতে নেয়া হয় না। তবে কি অন্য জায়গায় লোক রক্ষীবাহিনীতে জায়গা পাওয়ার উপযুক্ত নয়? আসল কারণ তা নয়। রক্ষীবাহিনীকে মূলতঃ বিরোধীদের এক হাত দেখানোর জন্য ঠেঙ্গানিয়া বাহিনীতে (ভারতীয় সি, আর, পি গোত্রীয়) পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর জন্য তাই রক্ষীবাহিনীতে প্রবেশ দ্বার উম্মুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ হলগুলোতে কাদেরিয়া বাহিনীর আনাগোনা এবং মুজিববাদ বিরোধীদের ঠেঙ্গানোর খায়েশ এ কথাই প্রমাণ করেছে যে তারা বিশুদ্ধ 'বাদ' প্রেমিক। রক্ষীবাহিনীতে তাই কাদেরিয়া গোষ্ঠীর এত কদর।'

(মুখপত্র ঃ ১০ শ্রাবণ, ১৩৭৯ বাংলা)

রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী গঠনের কারণ সম্পর্কে সাপ্তাহিক হক কথা লিখেছিল ঃ 'বাংলাদেশে বামপন্থীদের ভাগ্যাকাশে মহা দুর্যোগ নেমে আসছে বললে আজ আর মোটেই বাড়িয়ে বলা হবেনা। আর নেমে আসবারই বাকী রয়েছে কি, তাও আমরা ভেবে পাচ্ছি না।'

'এক সময় জামায়াতে ইসলামকে দিয়ে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করার ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারই পুনরাবৃত্তি হবার সকল আলামত দেখা দিয়েছে। একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ প্রোগ্রামে এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের হিসেব হলো, বাংলাদেশে সোয়া লক্ষ বামপন্থী কর্মীকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে শোষণের হাতিয়ার মজবুত রাখা যাবে না। এসব বামপন্থী বলতে বুঝানো হয়েছে বিশেষ করে তাদেরকেই যারা মার্কসবাদ-মাওবাদে বিশ্বাসী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও এর দালাল বিরোধী, সোভিয়েত সংশোধনবাদ ও তার প্রভাব কিংবা হস্তক্ষেপ বিরোধী, ভারতীয় শাসক ও বণিক গোষ্ঠীর

শোষণ বিরোধী এবং যারা খাঁটি জাতীয়তাবাদী হিসেবে যে কোন প্রকার শোষণ ব্যবস্থার বিরোধী ও শ্রমিক জগতের প্রগতিশীল কর্মী, কৃষক সমাজের ত্যাগী সুহৃদ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সচেতন আন্দোলনকারী, কারিগর ও প্রশাসনের দক্ষ বামপন্থী—সবাই কোন না কোন উপায়ে এই মহা ষড়যন্ত্রের শিকার।'

'সম্প্রতি ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রগতিশীল কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক একটা বোঝা-পড়া হয়েছে। তাতে উভয় দেশের মধ্যে অস্ত্র পাচার এবং বামপন্থী দমনজনিত খবরাখবর আদান প্রদানের শর্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ভারতীয় সৈন্যের অপারেশন এর প্রাথমিক আলামত।---- স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বরিশাল, খুলনা, যশোহর, পাবনা, ও টাঙ্গাইলে বহু বামপন্থী মুক্তি সেনাকে হত্যা করা হয়েছে। পাকবাহিনীর মতো মুজিব-ওয়ালারা বামপন্থী ছাত্রীদেরকে অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করেছে। যে সব বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধা পাকফৌজের কবল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করার গৌরব অর্জন করেছে তাদেরকেও পরিকল্পিত পন্থায় হত্যা করা হয়েছে। এমনি ওসমান আলী, শামসুর রহমান, আজিজুল হক, আক্তারুজ্জামান বাদশা, বাহেজ আলী ফ্যাসিস্ট মুজিববাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের স্কুলে কলেজ প্রাঙ্গণে দিবালোকে কয়েকজন বামপন্থী ছাত্রকে হত্যা এবং ছাত্রীকে অপহরণের রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জয়পুরহাট কলেজের ছাত্রী রাফিয়া খানমকে গত জানুয়ারী মাসেই এই পশুরা গুম করেছে। রাজধানী ঢাকায়ও অসংখ্য অপহরণ ও হত্যা অবলীলাক্রমে চলছে। এই ঘটনা প্রবাহ কি যোগসূত্রবিহীন কিংবা বিচ্ছিন্ন? মোটেই নয়। বরং এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে আওয়ামী লীগের লালবাহিনী গঠনের ইতিহাস।'

(হক কথা ঃ ২৬ মে ১৯৭২)

সাপ্তাহিক গণশক্তিতে লেখা হয় ঃ 'ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটি বিমান। বিমানটির নম্বর সি-১৩০, হারকিউলিস। এর গায়ে অংকিত

"রক্ষীবাহিনী"। এর পাইলট একজন শিখ। প্রতিরাত্রে এই বিমানটি ঢাকা ও দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত করে গভীর রাত্রিতে। দিল্লী থেকে দৈনন্দিন নির্দেশ গ্রহণ এবং রিপোর্ট প্রদান হচ্ছে বিমানটির কাজ। এরপরও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, "রক্ষীবাহিনী" ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশ নয় এবং এর উপর নির্ভরশীল শেখ মুজিবের সরকার দিল্লীর নির্দেশ মোতাবেক চলে না?

(গণশক্তি, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৭৫)

আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহম্মদ রেজা লিখেছেন: 'প্রথম থেকেই সরকারের সমালোচনা এবং বিরোধী রাজনীতিকে সহিংস পন্থায় দমন ও তার মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টার কারণে মুসলিম লীগ অনুসৃত নীতির অনুসরণে সরকার বিরোধিতা মাত্রকেই আওয়ামী লীগ ও রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেই সাথে বিরামহীনভাবে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সমুদয় কৃতিত্ব দখলের প্রচেষ্টাও। এর ফলে একদিকে গণতান্ত্রিক বিরোধী দল এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল, অন্যদিকে সরকারী নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সশস্ত্র সন্ত্রাসের পরিণামে দেশ ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। সন্ত্রাসের এই প্রক্রিয়াকে সারা দেশেই সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুবলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং ছাত্রলীগ ছাড়াও লালবাহিনী, নীলবাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন সরকারী ও প্রাইভেট সশস্ত্র বাহিনীকে সরকার বিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

সরকারী রেকর্ড মতে এদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন ৩৭,০০০ রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক ও নিরীহ সাধারণ মানুষ। ঢাকা, টঙ্গী ও চট্টগ্রামসহ শিল্পাঞ্চলগুলোতে এমনকি এল এম জি-র ব্রাস ফায়ার চলেছে, নির্বিবাদে পণ্ড করা হয়েছে প্রতিপক্ষের সমাবেশ, মিছিল এবং হরতাল। শেখ মুজিব প্রকাশেই 'নকশাল' দমনের নামে-বামপন্থীদের হত্যার হুমকি উচ্চারণ করে-

ছেন, 'লাল ঘোড়া দাবড়ায়া' দেবার কথা বলেছেনঃ সুন্দরী কাঠের লাঠি হাতে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদারকে হত্যার পর জাতীয় সংসদের মতো পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়েও এই বলে আস্ফালন করেছেনঃ 'কোথায় সিরাজ শিকদার?' শেখ মুজিবকে অনুসরণ করেছিলেন তার সহযোগীরাও। আওয়ামী লীগের বি-টিম নামে তৎকালে পরিচিত দল সিপিবি-র নেতা মনি সিংহ বায়তুল মোকাররমের প্রকাশ্য জন-সমাবেশে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানীকে 'টুকরা টুকরা করে ফেলার' হুমকি দিয়েছিলেন। এমনিতর নীতি ও হুমকির সূত্র ধরে দেশের সর্বত্রই প্রচণ্ড দমন এবং হত্যাকাণ্ডের সংখ্যাহীন ঘটনা ঘটেছিল। যশোরের কালিগঞ্জ এলাকায় রক্ষীবাহিনীর একটি ক্যাম্পের গণকবরেই পরবর্তীকালে ৬০টি কংকাল পাওয়া গিয়েছিল। রাজশাহীর তানোর এবং আত্রাইসহ বিভিন্ন স্থানেও একই ধরনের গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাছাড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেল থেকে বন্দীদের তুলে নিয়ে হত্যা করার মত ঘটনাও এ আমলে একাধিক ঘটেছে।'

(বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা ঃ ২১ দফা থেকে ৫ দফা ঃ পৃষ্ঠা ৩৩)

'যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় মেজর জেনারেল ওবানের পরিচালনায় দেরাদুনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী, বিশেষ করে তোফায়েল গ্রুপের ছেলেদের নিয়ে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বি এল এফ) নামে অপর একটি বাহিনী বা মুজিববাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর কাজ ছিল মুক্তিবাহিনীতে কর্ম-রত কমিউনিষ্ট বা প্রগতিশীল কর্মীদের হত্যা করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখা।'

(বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ আবু জাফর মোস্তফা সাদেক ঃ পৃষ্ঠা ৫৭)

"জাতির জনক" তখন জনকের জনক সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং জনকের জননী সম্প্রসারণবাদের হাতে 'বন্দী'। তাদের হুকুমের চাকর। জনক-জননী' যাকে বন্দী করার হুকুম করছে 'বন্দী' তাকেই বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ

করেছে কিংবা রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে বাংলাদেশ নামক দোজখ থেকে সোজা বেহেস্তে পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ রুশ-ভারতের নির্দেশে রুশ-ভারত বিরোধী-দের বিশেষ করে নক্সাল বিপ্লবীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। ভারতের হুকুমেই "শুদ্ধি অভিযান"-এর নামে প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ থেকে রুশ-ভারত বিরোধী সন্দেহে কর্মচারীদের দ্রুত অপসারণ করা হয়েছিল এবং সেস্থলে রুশ-ভারতের পছন্দসই লোকদের বসান হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে গুরুত্বহীন রক্ষীবাহিনীকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী করা হয়েছিল।"

(ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই: আসহাব উদ্দিন আহমদ: পৃষ্ঠা ২৪)

'মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' গড়ে উঠতে থাকলো একের পর এক বেসামরিক লাঠিয়াল বাহিনী: আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, জয় বাংলা বাহিনী, লাল বাহিনী এমনি বহু। আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায় এইসব উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী দোর্দণ্ড প্রতাপে চালাতে থাকল হয়রানি, নির্যাতন। যাকে তাকে যখন তখন দিতে থাকল হুমকি।'

(কথামালার রাজনীতি: রেজোয়ান সিদ্দিকী: পৃষ্ঠা ৪)

'সম্ভবতঃ শেখ মুজিব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনীতিক। তাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। এত বড় নেতা অথচ তিনি বুঝতে পারলেন না, মুক্তিযোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলে তার থাকে কি? তাকে নিরস্ত্র করার মানে তো বিপ্লবকে নিরস্ত্র করা, স্বাধীনতাকে নিরস্ত্র করা; মানুষ বিপ্লব করে ঘুনেধরা অতীতে ফিরে যাবার জন্যতো নয়। কিন্তু অস্ত্রহীন শাওয়ারের মনে থাকে জিজ্ঞাসা, প্রাণে থাকে অস্ত্র হারানোর গ্লানি, তাই পিছুটান অস্বাভাবিক নয়। অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধা কেবল সাহসী নয়, সে দায়িত্বশীল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কেবল অস্ত্র ফেরত নেয়া হয়নি, পুন-র্বাসিত রাজাকারদের অস্ত্রের নিচে তাদের ঠেলে দেয়া হয়েছিল। সব রাজাকারদের নির্বিচারে ক্ষমা করা হয়েছিল। শিক্ষা নামে শিক্ষাঙ্গনে নকল করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্কুল কলেজে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। দেশ

শাসনে অংশগ্রহণেরও কোন অবকাশ ছিলনা মুক্তিযোদ্ধাদের। সমরাঙ্গণ থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরত্বে যেসব রাজনীতিবিদরা বসেছিলেন তারাই বাংলাদেশ শাসনের সমস্ত ভার নিজেরা গ্রাস করেন। ঐতিহাসিক কারণে শেখ মুজিব ছিলেন বিপ্লব থেকে, সমরাঙ্গণ থেকে দূরে। অথচ সৃষ্টি করলেন মুজিববাদ। জনগণতো দূরের কথা স্বাধীনতার পক্ষের অন্য রাজনীতিবিদদের আওয়ামী লীগ ডাকেননি সরকারে অংশ নেবার জন্য। তবে জনতাকে শাসনের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন অপর রাজাকার জাতীয় ঘাতক বাহিনী যার ঘৃণ্য নাম রক্ষীবাহিনী। এটাই ছিল বিপ্লবী জাতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও ভারত সরকারের চরম চক্রান্ত। বাংলাদেশের চরম দুর্ভাগ্য। এর কারণেই এসেছে পরবর্তীতে অনস্বীকার্য পরিবর্তনসমূহ যা সব সময়ে কাঙ্খিত ছিল না।

(জাফরুল্লাহ চৌধুরী : উত্তপ্ত জনপদ : বিচিত্রা ১৬ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা)

"পূর্ব বাংলার প্রতি বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পর তারা তাদের নির্যাতন ও লুণ্ঠন জোরদার করেছে। তারা যত্রতত্র লুটতরাজ, হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, অর্থসংগ্রহ, অগ্নি সংযোগ করেছে। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের মতো তারাও বধ্যভূমি তৈরী করেছে। তারা সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-দের নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এভাবে তারা মগের মুল্লুক কায়েম করেছে।'

(সিরাজ শিকদার রচনা সংকলন : পৃষ্ঠা ৯১)

সংসদে রক্ষীবাহিনী বিল পাশের অনেক আগে থেকেই রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাশ হয়েছিল রক্ষীবাহিনী বিল। তখন স্পীকার ছিলেন আবদুল মালেক উকিল এবং প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মোহাম্মদউল্লাহ। রক্ষীবাহিনী বিলটি উত্থাপন করেছিলেন তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর। এই বিলে রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেফতার, তল্লাশী ও আটক করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তখন স্পীকার আবদুল মালেক উকিল বিলের ওপর বিরোধী দলের বক্তব্যের কিছু অংশ প্রোসিডিংস থেকে বাদ দেয়ার কথা ঘোষণা করলে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। তাহের উদ্দিন ঠাকুর তখন এই ওয়াক আউটের নিন্দা করেছিলেন।

অধ্যায় ঃ সন্ত্রাস নিধন

'Is the West Pakistan Government not aware that I am the only one able to save East Pakistan from communism. If they take a position to fight I shall be pushedout of power and the 'Naxalites' will entervene in my name. If I make to many consessions I shall lose my authority. I am in a difficult situation.'

(Lamonde, 31 March 1971)

শেখ মুজিব, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে আত্ম-সমর্পণের আগে ফরাসী পত্রিকা লা মণ্ডের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। ৩১ মার্চ এটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি পাকিস্তানের জেলে। পরবর্তীকালে তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বললেও 'কমিউ-নিজম' ও 'নক্সাল'দের তিনি কি চোখে দেখতেন তা সহজেই অনুমিত হয়। বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে উপরোক্ত প্রবণতাই অব্যাহত থাকে এবং দেশে ফিরে শাসনভার হাতে নেবার পরও শেখ মুজিবের দৃষ্টি-ভঙ্গি পূর্ববতই ছিল সেটাও প্রমাণিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব যাতে বামপন্থীদের হাতে না যায় সেজন্য গঠন করা হয় মুজিববাহিনী। স্বাধীনতার পর 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার জন্য গঠন করা হয় রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী। উভয় পক্ষেই কথিত বাহিনীগুলোর টার্গেট ছিল বামপন্থীদের যে অংশ যারা আওয়ামী লীগের লেজুরবৃত্তি করেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়

থেকেই শুরু হয়েছিল বামপন্থী নিধন। যারা স্বাধীনতার জন্য পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারাও তাদের টার্গেটে পরিণত হয়। এ সম্পর্কিত কিছু নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

এ সম্পর্কে এনায়েতুল্লাহ খান লিখেছেন ঃ

'শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিও এ বাহিনীর ছেদ পড়েনি। সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট প্রতি-বিপ্লবী মুজিববাহিনী একাত্তর সালে তার পক্ষ হয়ে প্রতি-নায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এই বিকল্প বাহিনী ষড়যন্ত্রী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার, মুজিববাদের তথাকথিত ভাবদর্শন, তত্ত্ব, ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি এই একই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।'

'মুজিববাদ ও মুজিববাহিনীর কাহিনী আজো ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব ও সংগঠন শুধুমাত্র ব্যক্তিশাসন কায়েম করবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদ ও মুজিববাহিনীরই সাংগঠনিক রূপ।'

'মুজিববাদ ও মুজিব বাহিনী সৃষ্টির লক্ষ্য ত্রিবিধ। (ক) মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে খর্ব করা, (খ) গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সামাজিক শক্তির মোকাবেলা করা এবং (গ) প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। প্রথম দু'টো কারণের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিববাহিনীর তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল।' এবং তৃতীয় কারণের জন্য সম্প্রসারণবাদের বশংবদ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গেও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।'

'একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই 'এলিট ফোর্স' সৃষ্টির ইতিহাস আরো বিস্তৃত। মুজিববাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের উপর ভিত্তি করে এবং তারই

নির্বাচিত উত্তরাধিকারীদের (?) নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী, এমনকি তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারেরও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলনা। জনৈক ভারতীয় সেনাপতির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সংগঠিত তথাকথিত মুজিববাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল।'

'এই চক্র জোটের এক বছরের প্রতিভূ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের ঋণ শোধ করছিলেন। গণতন্ত্র হরণ, নির্মম নিপীড়ন, কণ্ঠরোধ এবং হত্যা এই প্রক্রিয়ারই অন্যতম পর্যায়। আজও ৬২ হাজার রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুজিব কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্খায় দিন গুণছেন। আর সেই প্রক্রিয়াকে পরমোল্লাসে উস্কানী দিয়েছে কমিউনিস্ট নামধেয় একদল স্খলিত পরজীবী। কেননা দেশ-প্রেমে উজ্জীবিত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত না।

শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃশাসন সহস্র জননীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।'

(শেখ মুজিবের উত্থান-পতন : বিচিত্রা, আগস্ট ১৯৭৫)

'৭১-এ যশোর মুক্তিযুদ্ধের অকথিত অধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখা হয় :

'১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে থেকে দখলদার পাকবাহিনী ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শক্তি সশস্ত্র লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম, এল) তাদের অন্যতম। দেশের বিভিন্ন

এলাকায় পার্টি নেতৃত্বে গঠিত হয় সেনাবাহিনী। যারা দীর্ঘ নয় মাস বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে দখলদার বাহিনীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।'

'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) বা ইপিসিপি (এম এল)-এর এই প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে যশোর জেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে পার্টির সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় বিশাল এলাকা। কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এ মুক্ত অঞ্চলকে ঘোষণা দেয়া হয় কৃষক রাজের এলাকা হিসেবে। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভুল রাজনৈতিক লাইনের কারণে এ যুদ্ধের ফলাফল এক করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে পার্টির বিপর্যয় ডেকে আনে।'

'স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলেই যশোরের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও তাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত থেকে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইপিসিপি (এম এল)-এর নেতৃত্বে দীর্ঘ আটমাস পার্টি বাহিনী জনগণকে রক্ষা করে। এর অসীম সাহসী যোদ্ধারা বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরোধ করতে থাকে দখলদার বাহিনীকে। শহীদ হন অগণিত কর্মী। পার্টির এই ভূমিকা জনগণের কাছে তাদেরকে সেদিন আরও আস্থাশীল করে তুলেছিল। বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত অজস্র লোক এসে সমবেত হয়েছিল পার্টির পতাকা তলে।'

'আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ইপিসিপি (এম এল) বাহিনীর কোন সামরিক সংঘর্ষ হয় না। কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশি বেশি প্রবেশের পরপরই লালবাহিনীর উপর চড়াও হয়। পার্টির প্রতি দরদী মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সদস্য খবর দেন—ভারত থেকে নির্দেশ এসেছে যে কোন মূল্যে লালবাহিনী ও তার নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। ২৮ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন পার্টি সদস্য মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। তারা রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গিয়ে লালবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। লালবাহিনীকে

আক্রমণ, হত্যা ও গ্রেফতার করার অভিযোগে এ সময় মুজিববাহিনীর একটি দলকে আটক করা হয়। পরে অবশ্য সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয় তিন-চতুর্থাংশ অস্ত্র ও গোলাবারুদ রেখে। পুলুম এলাকায় পার্টির বাহিনী কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তাকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পশ্চাদপসারণের সময় পর্যন্ত প্রতিদিনই পাকবাহিনীর আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু লালবাহিনীর সাহসী যোদ্ধারা প্রতিবারই শত্রুকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।'

'জুলাই মাসের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনী লোহাগড়া এলাকায় প্রবেশ করে। পার্টি বাহিনী তাদেরকে নিরাপদে বিভিন্ন এলাকায় যেতে সাহায্য দেয়। এসময় মৌখিকভাবে কথাবার্তা হয় যে, কেউ কারো প্রভাবিত এলাকায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু আগস্ট মাসে ফরিদপুর জেলার একটি এলাকা থেকে লোহাগড়ার শালনগরে মুক্তিবাহিনীর একটি ইউনিট হেমায়েতের নেতৃত্বে পার্টি এলাকায় চড়াও হয়। তারা এখান থেকে শাহাবুল ও মাহবুবুল নামে দু'জন পার্টি সমর্থককে ধরে নিয়ে হত্যা করে। ফলে পার্টি বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব যায় পার্টির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের কাছে। কিন্তু তারা আলোচনায় সাড়া দেয়নি।'

'আগস্টের শেষ সপ্তায় ইউনুসের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর আর একটি দল পার্টির মুক্ত এলাকায় আকস্মিক চড়াও হয়ে নড়াইল-লোহাগড়া আঞ্চলিক কমিটির অন্যতম নেতা মমতাজের বাড়ি ঘেরাও করে। মমতাজ ও পার্টির অন্য একজন যোদ্ধা দুলাল সামরিক সংঘর্ষে না গিয়ে তাদের সাথে আলোনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাতে মুক্তিযোদ্ধারা রাজী না হয়ে মমতাজ ও দুলালকে গুলী করে হত্যা করে। এভাবে রাজাকারবাহিনী ত্রাস বলে পরিচিত সাহসী যোদ্ধা মমতাজ শহীদ হন। মমতাজের আততায়ীরা সে সময় স্থানীয় লোকজনকে জানায়—হাইকমাণ্ডের নির্দেশে পার্টির সবাইকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে।'

'বারুইপাড়া থেকে বিভক্ত হয়ে সরসুনায় আসা পার্টি বাহিনী ও নেতৃবৃন্দ মুজিববাহিনীর নড়াইল অঞ্চলের কমণ্ডার শরীফ খসরুজ্জামানের সাথে আলোচনা করে। এর আগে আগস্ট মাসে পুলুম এলাকায় ভারত থেকে আসার সময় খসরুর ইউনিটের লোকজন পার্টি বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল। এ কারণে পার্টি বাহিনী তাকে আটক করে ও পরে ছেড়ে দেয়। আটককালীন খসরু অঙ্গীকার করেছিল যে, ভবিষ্যতে উভয়পক্ষ কোন সংঘাতে না গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পাক-বাহিনীর মোকাবেলা করবে। সে মোতাবেক ১৮ই অক্টোবর বাবরায় এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্টির পক্ষে শামসুর রহমান, খবির উদ্দীন ও শেখ আবদুস সবুর অংশ নেন। খসরুজ্জামান ছাড়াও তাদের পক্ষে অংশ নেন মুক্তিবাহিনীর লোহাগড়া থানা রাজনৈতিক প্রধান মতিয়ার রহমান বাদশা। সিদ্ধান্ত হয়—পার্টি বাহিনী অস্ত্র জমা দেবে এবং পার্টি ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমাণ্ডে পার্টির বাহিনী পরিচালিত হবে। চুক্তি মোতাবেক পার্টি বাহিনী প্রায় তিনশ' অস্ত্র জমা দেয়। কিন্তু পরে আর যৌথ কমাণ্ডে কোন বাহিনী গঠন করা হয়নি। বরং বিচ্ছিন্নভাবে তারা পার্টি সদস্য ও কর্মীদের হত্যা, বাড়িতে আগুন ও লুট-তরাজ করতে থাকে। অচিরেই পার্টির অনেক শীর্ষস্থানীয় সদস্য ও যোদ্ধাকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে।'

'১৭ই অক্টোবর পুলুম থেকে সামরিক কমিশন প্রধান ও বাহিনী প্রধান পেড়েলী এসে মুক্তিবাহিনীর স্থানীয় ইউনিটের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা আলোচনায় না এসে ২১শে অক্টোবর রাতে আকস্মিকভাবে পার্টির ঘাঁটির উপর আক্রমণ শুরু করে। প্রায় ৩ শ' মুক্তিযোদ্ধা ছিল ভারী অস্ত্র সজ্জিত। জামরিলডাঙ্গা ও সাতবুড়িয়াতে চিত্রা নদীর উত্তর পাশে অবস্থান নেয় মুক্তিবাহিনী। দক্ষিণ পাশে ছিল পার্টি বাহিনীর অবস্থান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। পার্টি বাহিনীর পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। এদের মধ্য পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা লাহড়িয়া কালিগঞ্জের আকবর আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারাও ক্ষয়ক্ষতিসহ শেষ পর্যন্ত হটে যায়।'

'ঐ রাতে পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য ও যোদ্ধারা বৈঠকে বসেন। পেড়েলী থেকে বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবস্থান নেয়া হয় নোয়াপাড়া এলাকার (পূর্বে ভেঙ্গে যাওয়া) পূর্ব উত্তর প্রান্তে বনখলসীখালী বা বড়কুলায়। খুলনার ডুমুরিয়া যাবার পথ নিরাপদ না থাকায় পার্টি বাহিনী সে আশা পরিত্যাগ করে।'

২৫শে অক্টোবর রাতে নূর মোহাম্মদ, বিমল বিশ্বাস, বদ্যিনাথ বিশ্বাস, নাজির হোসেন, জবেদ আলী প্রমুখ পার্টি সদস্যের উপস্থিতিতে এক বৈঠক বসে। এতে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে 'বর্তমান সময় আত্মরক্ষার সময়' বলে ঘোষণা করা হয়। পার্টি, সেনাবাহিনী ও কর্মীদের আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়ে পার্টি, সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী কমিটির প্রকাশ্য অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়।

'এদিকে পেড়েলী থেকে পার্টি বাহিনী প্রত্যাহারের সময় সেখানকার লোকাল বাহিনী প্রধান কওসার ও ৪০ জন যোদ্ধা অস্ত্রসহ থেকে যায়। তারা মূলতঃ এলাকা ত্যাগে রাজী হয় না। ২৪শে অক্টোবর কওসার ও তার বাহিনী অস্ত্রসহ কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামে মুক্তিবাহিনী কমাণ্ডার কালামের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। কালামের নির্দেশে এক সপ্তাহের মধ্যে কওসারসহ ৩০ জন যোদ্ধাকে গুলী ও অন্যান্যভাবে হত্যা করা হয়।'

'তৎকালীন জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দের হিসাব অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্টির কমপক্ষে এক হাজার কর্মী শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে অর্ধেক পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে। আর বাকিটা মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর হাতে বলে পার্টি সূত্র জানায়।'

পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে শহীদ নেতৃস্থানীয় সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন—নজরুল, তেজো, আসাদ, শান্তি, মানিক, নিরাপদ, আলাল, হানিফ, ওহাব, মিজানুর, মুরাদ, ইমরান, বাশার, বিশ্বনাথ, কুটিমিয়া, বিনয়, মন্মথ, রুস্তম মাষ্টার, ও আবুবকর প্রমুখ।

মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক : খবিরউদ্দীন, মমতাজ, রফিক,

হবিবর, হোসেন, ইয়াসিন, রউফ, শাহাবুল, মাহাবুল, পাখি, আতিয়ার, আকবর, আজিজ, তারাপদ মাষ্টার, হাতেম, মহিউদ্দিন, কুদ্দুস, পন্টু, রায়হান, মর্জিনা ও সুফিয়া প্রমুখ।

'মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী ১৯৭১-এর ডিসেম্বর, ১৯৭২-এর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন পর্যন্ত পার্টি প্রভাবিত এলাকায় হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ চালাতে থাকে।'

(শামসুর রহমান : বিচিত্রা : বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৮৪)

'আত্রাই লড়াই' শীর্ষক নিবন্ধের একাংশে আবদুল মতিন লিখেছেন :

'সমগ্র '৭১ সালে আমাদের পার্টি সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল। দেবেন সিকদার, আবুল বাশার প্রমুখ নেতৃত্ব ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কর্মী ভারতে গেলেও সমগ্র পার্টি দেশে থেকেই সামন্তবাদকে প্রধান দ্বন্দ্ব মূল্যায়ন করে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যায়। '৭১-এর মার্চ মাসে পাবনা শহরে টিপু বিশ্বাস ও অন্যান্যের নেতৃত্বে ১৫০ জন পাক সৈন্য নিয়ে গঠিত সেনা ছাউনি নির্মূল করা হয়। আমাদের পার্টি নেতৃত্বে জনগণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ঘেরাও ও তাড়া করে শেষ সৈন্যটিকে পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। আমাদের পার্টি নেতৃত্বে হাজীগঞ্জ এলাকায় বি এম কলিমুল্লাহ এবং বগুড়া এলাকায় মজিবর রহমান বাহিনী গঠন করে তাদের এলাকা খান সেনাবাহিনী মুক্ত রাখে। রাজশাহীতে অহিদুর রহমান ভারতে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল শান্তি কমিটি প্রধানের সহায়তায় পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অহিদুর রহমান এক বাহিনী গঠন করে এবং সমগ্র '৭১ সাল তার অঞ্চল শত্রুবাহিনীর দখল মুক্ত রাখে। বগুড়ায় পার্টি নেতৃত্বে কর্মীরা গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে।'

'বাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে ভারত থেকে অস্ত্র আনতে গিয়ে পশ্চিম বগুড়ায় ছমির মণ্ডল ১০ জন কর্মীসহ পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে শহীদ হন। পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর জেলার সর্বত্র পার্টির নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় ও সংলগ্ন কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার এলাকায় আবুল বাশার, নিজাম উদ্দিন প্রমুখ ইপিআর ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে মিলিতভাবে বাহিনী গড়ে তুললেও আওয়ামী লীগ রাজনীতির নেতৃত্বের কারণে তারা ভারতে চলে যান। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)-র নেতৃত্বে মোঃ তোয়াহা নোয়াখালীর দক্ষিণ অঞ্চলে, প্রফেসর ইয়াকুব আলীদের নেতৃত্বে নেত্রকোনা, বাজিতপুর এলাকায় গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠে। দিনাজপুরের ফুলবাড়িয়া, সাবেক পাবনার সিরাজগঞ্জ এবং যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাংগাইল প্রভৃতি জেলায় কোনো জায়গায় আমাদের কোনো জায়গায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)-র নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে টাংগাইল, পাবনার চরাঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়। দেশের অধিকাংশ জেলায় এইভাবে গড়ে ওঠা গেরিলা বাহিনীগুলি স্ব-স্ব পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে '৭১ সালব্যাপী ভারতে না গিয়ে, ভারতের দ্বারা এতটুকু সাহায্য সহায়তা প্রাপ্ত না হয়ে জনগণের সহায়তায় তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এইসব বাহিনী ৯ মাসব্যাপী শত্রুবাহিনীর আক্রোশ ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হওয়া সত্ত্বেও টিকে থাকে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীগুলিও এদের সুনজরে দেখেনি এবং লক্ষ্যবস্তু হিসেবেই গণ্য করেছে। ভারতেও এইসব বাহিনীগুলিকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তরায় হিসেবে গণ্য করেছে।'

'এই রকম পরিস্থিতিতে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ অর্জিত হওয়ার এবং আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরিচালিত এই বাহিনীগুলির কর্মী ও নেতারা জনগণের সাথে গভীর ও শ্রেণী সম্পর্কের কারণেই ১৬ই ডিসেম্বরের পর নিজেদের আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তখনও তাদের কেউ দেশ ছেড়ে কোথাও যায়নি। মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী কর্মীদের হাতে কিছুসংখ্যক নিহত হয়েছে, ৭/৮ হাজার কর্মী-নেতা কারারুদ্ধ হয়েছে, তার চেয়েও বেশী সংখ্যক আত্মগোপনে থেকে ১৯৭৫-এর পর বেরিয়ে এসেছে। ব্যতিক্রম হিসেবে দু'চারজন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

আত্মহত্যার একটাও নজীর নেই।'

(তারকালোক ঃ ঈদ সংখ্যা ১৯৮৬)

হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন ঃ

'সেকটর ও কমাণ্ডারদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মুক্তিফৌজে যাতে বামকর্মীরা না ঢুকতে পারে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা খুবই সর্তক ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অনেক ক্যাম্প থেকে আমাদের বহু কর্মীকে বের করে দেয়া হয়েছিল। ন্যাপ, কমিউনিস্ট, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এইসব পরিচয় গোপন রাখতে হতো। শুধু যে যুদ্ধ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে, তাই-ই নয়, গ্রেফতার হওয়া, এমনকি নিহত হওয়ার আশংকাও ছিল। তবু কয়েকজন সেক্টর কমণ্ডার যেমন, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, মঞ্জুর আহমেদ, কর্ণেল জামান এবং আরো কয়েকজন আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাম-কর্মীদের রিক্রুট করেছেন, এমনকি দেশের ভিতরের বাম গেরিলা ঘাঁটিগুলির জন্য অস্ত্রও সরবরাহ করেছেন। মুক্তিফৌজের কমাণ্ডারদের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব খুব তীব্র ছিল। এদিকে সরাসরি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছে, এ খবর তারা জানতেন। বিষয়টি তাদের জন্য সুখকর ছিল না। আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের কোন্দল শুধু নয়, রীতিমতো ঠাণ্ডা লড়াইও চলছিল। কল-কাতায় একদিন শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার ও কাজী জাফর আহমদের কথা হলো। তাদের কথায় প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা গেল।'

'এদিকে দেশের ভিতরে আমাদের গেরিলা ঘাঁটিগুলিও খুব নিরাপদ ছিল না। শেষের দিকে পাকিস্তান বাহিনীকে আমরা আর খুব বেশি ভয় করতাম

না। আমাদের গেরিলারা যুদ্ধ করতে করতে একরকম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সেইরকম কয়েকটি অঞ্চলে বিপদ হিসেবে দেখা দিলো মুজিববাহিনী। একেবারে শেষের দিকে তারা দেশে ঢুকেছিল পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং বাম ঘাঁটিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। যেমন শিবপুরে এক গ্রুপ পাঠানো হয়েছিলো মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে। তবে অধিকতর অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকলেও আমাদের সঙ্গে তারা পেরে ওঠেনি। কারণ, তারা যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিলো না। অন্যদিকে আমাদের কর্মীরা দেশের ভিতরে থেকে যুদ্ধ করে যথেষ্ট সাহসী, কৌশলী ও পোক্ত হয়ে উঠেছিলো।'

'এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় কামেল বখতের কথা। সাতক্ষীরায় একটি অঞ্চলে কামেল বখতের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিলো। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সদস্য কামেল বখত। এই টগবগে তেজী তরুণ বিপ্লবী। এক অল্পবয়সী তরুণ নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। সে কলকাতায় এসেছিলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, তার কাজের রিপোর্ট দিতে এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নির্দেশ গ্রহণ করতে। কলকাতায় একদিন থেকেই সে ফিরে গিয়েছিলো। আমার সঙ্গে সারাদিন ধরে বহু বিষয়ে কথা হয়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো আমি সীমান্ত পার হয়ে তার অঞ্চলে যাবো। যাবার দিনও ঠিক করা হয়েছিলো। কিভাবে যাবো, কে নিতে আসবে সবই ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের আগেই খবর আসলো কামেল বখত নিহত হয়েছেন। পরে জানা গেছে, মুজিববাদী-দের ষড়যন্ত্রেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

(স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মওলানা ভাসানী : তারকালোক ডাইজেস্ট, এপ্রিল '৮৭ পৃষ্ঠা ২৬-২৭)

শিবপুরের এদতসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে হায়দার আনোয়ার খান জুনো লিখেছেন :

'মোটামুটি গ্রামাঞ্চলকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। শিবপুরের গ্রামাঞ্চল ছিলো একটি পরিপূর্ণ মুক্ত এলাকা। সেখানে ছিলো ভিন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনগণের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা। প্রত্যেকটি গ্রামে ও ইউনিয়নে জনগণের কমিটি ছিলো—যার হাতে ছিলো এলাকার প্রশাসনের দায়িত্ব ·····এই কমিটিগুলিতে খাঁটি কৃষকের প্রতিনিধিরাই বেশী ছিলো।·····আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই নয় মাসে কেউ এলাকায় ছিলেন না। তবু আমরা ঐক্যের খাতিরে খুঁজে খুঁজে আওয়ামী লীগের দুই একজন লোক যাকে পাওয়া যেত, তাকে কমিটিতে রাখার চেষ্টা করেছি। তবু আমরা শুনতে পেতাম, ভারতে এই এলাকা সম্বন্ধে ভুরি ভুরি রিপোর্ট যাচ্ছে—এটা কমিউনিস্ট এলাকা, এরা আওয়ামী লীগ বিরোধী ইত্যাদি। এলাকাকে ধ্বংস করার জন্য এবং মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করার জন্য ট্রুপ পাঠানোর প্রস্তাবও হয়েছে।·····মুজিব বাহিনীর (যা বাংলাদেশ সরকারের সামরিক বাহিনীর অধীনস্ত ছিলো না) কিছু কিছু ট্রুপ এসেছিলো আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য। কিন্তু তারা পেরে ওঠেনি। কারণ, জনগণ আমাদের সপক্ষে ছিলো। তার উপর আমরা এতদিন যুদ্ধ করে যুদ্ধের ব্যাপারে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তারা ভারত থেকে সদ্য এসেছে। তাই যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের ভীতি ছিলো। তাছাড়া অনেক ট্রুপের বেলায় এমন হয়েছে যে, যাদের পাঠানো হয়েছে মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করার জন্য তারা এলাকায় এসে বাস্তব অবস্থা বুঝে মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আমাদের সঙ্গে যোগদান করে।'

'······আমরা মুজিববাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চেয়েছি এবং নানা কৌশলে তাতে সমর্থ হয়েছি। ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকার ও তার সামরিক কর্মকর্তাদের বোঝানোর জন্য আমরা একবার আগরতলায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করি। সঙ্গে আমরা নিয়ে যাই আমাদের হাতে নিহত পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনের ব্যাজ।'

(শিবপুরে নয় মাস : নয়াযুগ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬)

'যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুজিববাহিনীর নামে

গোপনে আরেকটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর বিরাট অংশ সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বাংলাদেশে প্রবেশের পর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা হয় তখন কিন্তু এই মুজিববাহিনীকে সশস্ত্র রাখা হয়। উপরন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় এই বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে লুট-তরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, লাইসেন্স ও পারমিটবাজ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়।..... মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে ও ক্ষমতাসীন পার্টির সহায়তায় সর্বপ্রকার অসামাজিক কাজের সুযোগ পায়। এইসব পাপের বোঝা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আজও টানছেন।'

(মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সমস্যা: কাজী নুরুজ্জামান: সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনি: ৬ জুলাই-১৯৮০)

নৃশংসতায় অনুসন্ধানী চিত্র

আওয়ামী লীগ আমলে যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশী হত্যা ও সন্ত্রাস হয়েছে সে সবের কিছু অংশে আমি সরাসরি গিয়েছি। আলোচনা করেছি নিহতদের আত্মীয়ের সঙ্গে, আহতদের সঙ্গে এবং স্থানীয় বাম নেতাদের সঙ্গে যারা তখন রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীদের টার্গেট ছিলেন।

সন্ত্রাস : বাজিতপুর

পুরো কিশোরগঞ্জ জেলায়ই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস হয়েছে, এর-মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয়েছে বাজিতপুরে। এখানে প্রাধান্য ছিলো পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ (ল)-এর। পরবর্তীকালে এই অংশ সাম্যবাদী দল গঠন করেন। পার্টির নেতা, কর্মী, সমর্থক, সহানুভূতিশীল, তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং মুজিববাদীদের ব্যক্তিগত শত্রু ছিলো হত্যার টার্গেট। পার্টির প্রথম সারির স্থানীয় নেতা ছিলেন প্রফেসর ইয়াকুব আলী। বাজিতপুর কলেজের শিক্ষকতা করতেন তখন। তারপরের নেতা ছিলেন সাইফুল ইসলাম। তিনি বাজিতপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি মুজিববাদীদের হাতে ধরা পড়েছিলেন দু'জন সঙ্গীসহ। সঙ্গী দু'জনকে হত্যার পর মুজিববাদীরা তাকে জবাই করে চলে যায়, কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন তিনি। তার গলায় এখনো জবাইয়ের দাগ। প্রথমতঃ আমি তার সঙ্গেই কথা বলেছি। তার মতে বাজিতপুরে ১২৬ জনকে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা হত্যা করেছে। তাঁর ভাষ্য তাঁর ভাষায়ই তুলে ধরছি :

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা ভারতে না গিয়ে এলাকায় থেকেই পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমরা আগাগোড়াই মনে করেছি, আওয়ামী লীগকে দিয়ে মুক্তি আসবে না। সে কথা প্রচারও করেছি।'

'স্বাধীনতার পরপরই এই অঞ্চলে মুজিববাদীরা হিন্দুদের বাড়ী দখল, লুণ্ঠন,

নারী নির্যাতন, ডাকাতিসহ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়। জনগণ প্রতিবাদ করলে তাদের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন।'

১৯৭২ সালের গোড়ার দিকেই এলাকার জনগণ মুজিববাদীদের বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিকার করার দাবী নিয়ে আমাদের কাছে আসতে থাকেন। এলাকায় আমাদের প্রভাব ছিলো, বিশ্বস্ততাও ছিলো। প্রকাশ্যেই আমরা তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলাম। জনগণের বিভিন্ন অভি-যোগ নিয়ে পর্যালোচনার জন্য প্রফেসর ইয়াকুব, আনিসুর রহমান ও আমিসহ এলাকার নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীরা আলোচনায় বসলাম। সময় হবে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস। ঠিক করলাম আমাদের পার্টিকে গ্রামে গ্রামে সংগঠিত ও বিকশিত করে মুজিববাদীদের জুলুমের প্রতিবাদ করবো। পার্টি নেতা নগেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এ সময় পার্টির সিদ্ধান্তও অবহিত হলাম।'

প্রথমদিকে আমরা চেয়েছি প্রতিবাদী জনগণকে সংগঠিত করতে। বলতে থাকলাম যে, এই স্বাধীনতায় শুধু পতাকারই পরিবর্তন ঘটেছে। জনগণের মুক্তি এতে আসবে না। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। জনগণ আমাদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। এর কারণ ছিল, মুজিববাদীদের প্রত্যক্ষ স্বরূপ তারা স্পষ্টই দেখছিলেন। হেন অপকর্ম নেই যা তারা করছিলো না। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। তারা যোগাযোগ করলো কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে। শুরু হলো আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগারদের মদদদাতা। তারা আক্রমণ শুরু করলো আমাদের উপর। আমরা প্রথম অবস্থায় হানাহানি এড়াতে চাইলাম। কিন্তু তবুও পরিত্রাণ পেলাম না।'

'মুজিববাদীদের নির্যাতনের মধ্যেও আমরা কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে প্রভৃতিকে সংগঠিত করতে শুরু করলাম, বিভিন্ন সমিতি করলাম তাদের নিয়ে। এতে মুজিববাদী অনেক জোতদার ও ফড়িয়াদের স্বার্থহানি ঘটল।'

'ওই অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৭৩ সালের নির্বাচন এলো। আমরা নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলাম। এই অভিযোগে আলিয়াবাদের মজিবুর নামক আমাদের এক কর্মীকে মুজিববাদীরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাইলো। আমরা বাধা দিয়ে তাকে রক্ষা করলাম। এরপর সে আত্মগোপনে চলে গেলো। এরপর আক্রমণ আসতে থাকলো একের পর এক। যার উপর আক্রমণ এসেছে সেই পালিয়ে আত্মগোপনে চলে গেছে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে রক্ষীবাহিনী এলো বাজিতপুরে। তারা আমাদের কর্মী বোয়ালীর জেলে বলরাম দাসকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। এই ঘটনায় আমরাও সতর্ক হয়ে গেলাম। মুজিববাদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো, এমন বহু লোককে তারা 'নক্সাল' নাম দিয়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে এবং অত্যাচার করিয়েছে তখন। সরিষাপুরের মুর্শিদ, জনু মিয়া আজো যে আঘাত-নির্যাতন বহন করছে তাদের শরীরে। আমি পালিয়ে আমাদের গ্রাম বালিগাঁও চলে গেলাম। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা আমাকে ধরার জন্য তখন হোস্টেলে খোঁজ করেছিলো।'

আমাদের পার্টি ও জাসদ মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বলরাম হত্যার প্রতিবাদের। সমবেতভাবে আমরা সভা ও মিছিল করলাম। রক্ষীবাহিনী মাসখানেক সন্ত্রাস চালিয়ে তখনকার মতো চলে গেলো। অবশ্য কিছু দিন পরই আবার এসেছিলো তারা। আমরা আত্মগোপন থেকে আবার বাজিতপুর ফিরে এসে কাজ শুরু করলাম। জুলাই-আগস্টের ('৭৩) দলে দলে লোকজন আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে লাগলো। আমরা স্টাডি সার্কেলসহ বিভিন্ন গ্রুপ দাঁড় করালাম। কেন্দ্র থেকে সুখেন্দু দস্তিদার, নগেন সরকার, শান্তিসেন প্রমুখ এসে দেখে গেলেন।

১৯৭৩ সালে আগস্টের মাঝামাঝি সময় অধ্যাপক ইয়াকুবকে কলেজে যাবার পথে গ্রেফতার করলো। আমি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীরা পালিয়ে গেলাম আবার। গোপনে সিদ্ধান্ত নিলাম পার্টিকে রক্ষা করার। আমি ও পার্টি কর্মী ইদ্রিস গ্রামে গিয়ে দেখলাম, ইয়াকুবের গ্রেফতারের খবর শুনে

বিভিন্ন গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে লোকজন বাজিতপুর আসছে। আমাদের এক কর্মী মুজিবুর, বি, এ ভর্তি হবার জন্য নরসিংদী কলেজে যাচ্ছিলো। গ্রেফতারের খবর শুনে কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রতিবাদে যোগ দিলো এবং লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে কাজ করার কথা ঘোষণা করলো। মা-বাবার একমাত্র ছেলে মুজিবুরকে পরবর্তীকালে মুজিববাদীরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

গ্রামের লোকজনকে জড়ো করে আমরা থানা ঘেরাও করলাম। দাবি করলাম, প্রফেসর ইয়াকুবকে ছেড়ে দিতে। রাত ১২টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখলাম। যখন বুঝতে পারলাম তাকে ছাড়া হবে না, রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি পরিকল্পনাও তৈরী করলাম। কিন্তু কিছু ভুলের জন্য সফল হইনি। শেষরাতে ইয়াকুবকে কিশোরগঞ্জ নিয়ে গেলো। পরদিন কয়েক হাজার লোক কিশোরগঞ্জ কোর্ট ঘেরাও করলো। পুলিশ সেখান থেকে ২২ জনকে গ্রেফতার করে।

অধ্যাপক ইয়াকুব জেলে যাবার কয়েকদিন পরই মুজিববাদীরা আমাদের কর্মী আতাউর রহমানকে হত্যা করলো। আতাউরের বাড়ী ছিলো নিজোকী। রাজনীতিই ছিলো তার জীবনের ব্রত। ঢাকার তেজগাঁয়ে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর আমি নেতৃস্থানীয় কর্মী মুজিব, ফারুক, রফিক, ওহাব, নাসির, হাবিব, গিয়াস, সামসুদ্দিন, নুরুন্নবী, যুবরাজসহ অনেককে নিয়ে বসলাম। যোগাযোগ করলাম নগেন সরকারের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর কোন অত্যাচারই বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিবো না। প্রফেসর ইয়াকুব তখন জেলা সেক্রেটারী, আমি সদস্য।

সংগঠনে তখন আর্থিক অনটন চলছিলো। দুর্ভিক্ষাবস্থা দেশে। এরমধ্যেও কৃষকরা আমাদের সাহায্য করতে থাকেন। আমাদের সাহায্য-সহায়তা করার অপরাধে অনেককেই ধরে নিয়ে যেতো রক্ষীবাহিনী—অকথ্য অত্যাচার চালাতো তাদের উপর। মুজিববাদীরা সাহায্য করতো রক্ষীদের। মিথ্যা মামলাও

দেয়া হয় অনেকের বিরুদ্ধে। মুজিববাদীরা তাদের ব্যক্তিগত শত্রুদেরও ঘায়েল করতে থাকে এই সুযোগে :

'১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রীট করে অধ্যাপক ইয়াকুবকে ছাড়িয়ে আনলাম। তার মুক্তির পরও আমরা কেউই রাতে বাড়ীতে থাকতাম না। কারণ জানতাম এরপর হাতে পেলে আমাদের সরাসরি খুন করবে। আমাদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। নিসারকান্দী নামক এক গ্রামে রাত যাপন করে ইয়াকুব ও আমি এক ভোর রাতে বাড়ী ফিরছিলাম। ইয়াকুবের বাড়ীর কাছে এসে দেখি রক্ষীবাহিনী বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। গুলীর শব্দও শুনলাম। বাড়ীতে না গিয়ে তখন অন্য পথ ধরলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, শেখ মুজিবের পতন না হওয়া পর্যন্ত আর ঘরে ফিরব না, মরলে মরবো। আমরা বুঝতে পারছিলাম, রীটেরকালে সরকার ইয়াকুবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছিলো না। নইলে মুক্তির সাথে সাথেই আবার রক্ষীবাহিনী আসার কি কারণ থাকতে পারে? এদিকে আমাদের লোকজনের উপরও চলছিলো অবর্ণনীয় অত্যাচার। কর্মীদের মাঠে ডেকে আত্মগোপন ও প্রতিরোধের নির্দেশ দিলাম। ভাগ করে দিলাম বিভিন্ন স্কোয়াডে। যে ক'দিন আমাদের হাতে অস্ত্র ছিলো সে ক'দিন মোটামুটি নিরাপদেই ছিলাম। কিন্তু '৭৪ সালের এপ্রিল মাসে পার্টি থেকে নির্দেশ এলো অস্ত্র ডাম্প করে ফেলতে। প্রথমে অবাক হলেও পার্টির নির্দেশ পালন করলাম। অবাক হলাম একন্য যে, শত্রু যেখানে প্রবল ও সশস্ত্র সেখানে আমাদের নিরস্ত্র করার কারণ কি? পার্টি থেকে বলা হলো, সামরিক শাসন আসতে পারে কিংবা কম্বাইণ্ড অপারেশন চলবে। আসলে সেটা ছিলো কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশের চক্রান্ত। প্রতিবাদ করলেও পরে পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। অধিক পরিশ্রমের কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পার্টি থেকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম যেতে বললো। আমার সঙ্গে থাকবে হাবিব ও মুজিব। হাবিব আমার ও মুজিবের সঙ্গে আশুগঞ্জে যোগ দিলো। দেখা হবার পর হঠাৎ সে বললো যে, "চট্টগ্রাম যাওয়া যাবে না, সেখানে গেলে বিপদ হবে বলে জানতে পেরেছি। চলুন ময়মনসিংহে চিকিৎসা করাবো।" ময়মনসিংহ গিয়ে চিকিৎসা করালাম। সেখান

থেকে এক রাতে কিশোরগঞ্জ এলাম। কিশোরগঞ্জ থেকে আরেক রাতে যাত্রা করলাম বাজিতপুরের দিকে। রাস্তায় নেমে এলো বিপর্যয়।'

'সময়টা হচ্ছে ১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল। কটিয়াদির জাউল্যাবাজ গ্রামে দিনে লুকিয়ে থেকে বিকেলের দিকে রওয়ানা হলাম বাজিতপুরের দিকে। সবসময় রাতেই চলাফেরা করতাম। কিন্তু এই এলাকাটা ছিল 'পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনে'র (একটি কমিউনিস্ট সংগঠন) প্রভাবাধীন এলাকা। তাই ভাবলাম এখানে কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু আমরা জানতাম এর আগের রাতে মুজিববাদীদের হাতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী শাহজাহান নিহত হয়েছেন। সে এলাকার মুজিববাদীরা দিনে আমাদের অবস্থানের কথা টের পেয়ে রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসেছিল। আমরা তিনজন যখন খড়গাঁও মাহমুদপুরের মাঝামাঝি হাওর অতিক্রম করছিলাম হঠাৎ ১০ জনের মতো একটি দল আমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করলো। তাদের হাতে স্টেনগান, কাটা রাইফেল, বল্লম, দা প্রভৃতি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম পালানো যাবে না। আমাদের কারো হাতে কোন অস্ত্র নেই, পার্টির নির্দেশে আগেই জমা দিয়েছি। কয়েকজন আমাকে ঘিরে রেখে হাবিব ও মুজিবকে একশ' গজের মতো দূরে নিয়ে গেলো। আমি তৈরী হলাম মৃত্যুর জন্য। মুজিববাদীদের কয়েকজন আমাকে চিনতো। একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললো, "আচ্ছা স্যার, আপনি তো এখন মারাই যাবেন। মৃত্যুর আগে আপনার কিছু বলার আছে?"

জবাবে বললাম, হ্যা, এক নম্বর কথা হচ্ছে, তোমরা তো আমাকেই খুঁজছিলে, এখন পেয়ে গেছো। এবার বাকী দু'জনকে ছেড়ে দাও। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাকে হত্যার পর তোমরা আমার পার্টির কাছে গিয়ে অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করে বলবে, মৃত্যুর আগে স্যার আমাদের ক্ষমা করে গেছেন, আপনারাও ক্ষমা করে দিন।'

একজন প্রশ্ন করলো, "তা যদি না করি?" বললাম, তা না করলে তোমরা নির্ঘাত মারা যাবে। যে বিভীষিকার রাজত্ব তোমরা

কায়েম করছো তাতে তোমাদের শেখ মুজিবের পতন হবেই, এবং জনগণ তখন তোমাদের কচুকাটা করবে।' এ সময় হঠাৎ দু'টো গুলীর শব্দ শুনলাম। বুঝতে পারলাম হাবিব ও মজিবকে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের বিদায়ী চিৎকার শুনলাম। মরণ চিৎকারের সময়ও বিপ্লবের জয়গান গেয়ে গেলো তারা। আমিও উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলাম ঘিরে রাখা চারজন মুজিববাদীর সঙ্গে। এক পর্যায়ে উত্তেজনায় আমার হাত উপরে উঠে এলো। এতে লোক চারজন হঠাৎ ভড়কে গিয়ে একটু দূরে সরে গেলো। এই ফাঁকে একটি গ্রাম লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড় দিলাম আমি। পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো তারা। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারে তারা ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। গ্রামের কাছের এক ঝোঁপে লুকিয়ে পড়লাম। এই গ্রামটি আমার চেনা। নাম গোদারপোড়া। গ্রামের একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। মুজিববাদীরা খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে চলে যাবার পর আমি সেই শিক্ষকের বাড়ীতে গেলাম। কিন্তু সেই শিক্ষক সেদিন আমাকে কোন সাহায্যই করলেন না। হয়তো ভয়ে। মুজিববাদীরা গ্রামে হয়তো আগেই জানিয়ে রেখেছিলো। সেই শিক্ষকের বড় ছেলে তখন হঠাৎ বললো, "চলুন আপনাকে এক জায়গায় রেখে আসি।" আশান্বিত হয়ে আমি তার পিছু নিলাম। কিন্তু সে আমাকে কসাইদের হাতেই তুলে দিলো। তারা তখন আমাকে না পেয়ে এক বাড়ীতে বসে স্ফূর্তি করছিলো। আমাকে দেখে হৈ চৈ করে ছুটে এলো। তারপর টানতে টানতে আবার নিয়ে গেলো হাওড়ে। একজন বললো, "কোনো চান্স দেয়া যাবে না। জবাই করবো।" অন্ধকার রাত। চিৎকার করে সাহায্য চাইছিলাম, হাত-পা ছুঁড়ছিলাম। জোর করে মাটিতে ফেললো আমাকে। আমি চিৎ হয়ে না শুয়ে উপুড় হয়ে শুইলাম। অনেক টানাটানি করে ঘাড়েই দা চালালো একজন। আমি আমার রক্ত টের পাচ্ছি, টের পাচ্ছি আমার হাড়ে দা'য়ের গড় গড় শব্দ। বেশ কতক্ষণ চললো এভাবে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে 'ইনকেলাব - জিন্দাবাদ' এবং 'মেহনতি জনতার জয় হোক' শ্লোগান দিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কসাই মুজিববাদীটি বললো, "শেষ, চল ফিরে যাই।" যাবার সময় ছোরা দিয়ে

মেরুদণ্ডের একপাশে জোরে আঘাত করে উল্লাস করতে করতে তারা ফিরে গেলো। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি একটি বিভ্রমের মধ্যে আছি। একটি দুঃস্বপ্ন যেনো। ভয়ে ঘাড়ে হাত দিতে পারছি না, যদি দেখি আমার মাথা আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন? স্বাভাবিক চিন্তা লোপ পেয়েছে তখন। হঠাৎ মনে হলো, নিশ্চয়ই বেঁচে আছি আমি, নইলে চিন্তা করছি কি করে? ভয়ে ভয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি হাড় পর্যন্ত কাটা। আর কয়েকটি চাপ দিলেই হয়তো গলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। পিঠের আঘাত পেট ভেদ করেছিলো। মনে হচ্ছিলো নাড়ি-ভুড়ি হয়তো বের হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে সেখানেও হাত নেড়ে দেখলাম বেশ পিচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, নাড়ি-ভুড়ি নয়, রক্ত। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। লুঙ্গী ছিঁড়ে পেট ও পিঠের ক্ষতস্থান বাঁধলাম। ভোর রাত হয়ে গেছে তখন। দিগ্‌জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি। আন্দাজের উপর নির্ভর করে বাজিতপুরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু আমার আন্দাজ ছিল সম্পূর্ণ ভুল। আমি আসলে উল্টো দিকেই হাঁটছিলাম, যেদিকে শত্রু বেশী। কৃষকরা মাঠে যাওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু আমার কাছে তখন সবাইকেই শত্রু মনে হচ্ছিল। কাউকে দেখলেই গাছ বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। ছোটোখাটো খালও পার হলাম কয়েকটা। কতক্ষণ সাঁতার কেটেছি। আজ অবাক লাগে সেসব সম্ভব হয়েছিলো কি করে? সকালে মাসুদপুর নামক এক গ্রামের সর্ব দক্ষিণের বাড়ীটির কাছে গেলাম। বাড়ীটা মূল গ্রাম থেকে সামান্য দূরে, তাই ভাবলাম হয়তো শত্রুরা এখানে আসবে না। ঘর থেকে একজন বৃদ্ধ লোক বের হয়ে এলেন। অত্যন্ত গরীব। বললেন, "বাবা, আপনি কে জানি না, কিন্তু আমি গরীব মানুষ, খুব ভয়ে আছি, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।" আমিও ভেবে দেখলাম, এই নিরীহ লোকটাকে বিপদে ফেলে আর কি হবে? আবার হাঁটতে থাকলাম। লাওন্দ গ্রামের কাছে এসে আর চলতে পারছিলাম না। এক গাছের নীচে বসে পড়লাম। ভীষণ ব্যথা করছিল তখন। হাঁটা, বসা, শোওয়া কোনটাতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এরমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো। নানা রকম মন্তব্য করছিলো তারা। ইতি-মধ্যে মুজিববাদীরাও জেনে ফেলেছে যে আমি মরিনি। চারদিকে হুঁশিয়ার

করে লোক পাঠিয়েছে যেনো আমাকে রাত পর্যন্ত চোখে চোখে রাখা হয়। রাত হলে আবার হত্যা করবে। ভিড়ের মধ্য থেকে আব্বাস নামক একজন সাহস করে এগিয়ে এলো আমার সাহায্যে। পানি এনে দিলো খেতে। অনুরোধ করলো, "চলুন ভাই আমার বাড়ীতে চলুন।" বললাম, না ভাই আপনার বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে এই গাছের নীচেই একটা হোগলা পেতে দেন। একটা হোগলা আনা হলো। গ্রাম থেকে লোকজন নানা রকম খাবার নিয়ে আসতে লাগলো। আমি কিছুই খেতে পারছিলাম না। আব্বাস একজন কম্পাউণ্ডারকে ডেকে আনলো। ইনজেকশন দেবার পর ব্যথা কমলো। ডাবের পানি খেলাম একটু। এরপর সমস্যা দেখা দিলো আমাকে রাখবে কোথায়? কয়েক হাজার লোক তখন জমা হয়েছে। অনেকে চিনলো আমাকে। সন্ধ্যার আগে লুকোতে না পারলে আবার আক্রান্ত হবো। এরমধ্যে ডাক্তার এলেন। সেখানেই ওষুধ দিয়ে বললেন, "আমরা আপনাকে বাঁচাতে চাই, লোকজন সব চলে যেতে বলুন, লুকিয়ে রাখব আপনাকে।' আমার অনুরোধে লোকজন চলে গেলো। ডাক্তার প্রথমে ডিসপেনসারিতে নিয়ে গেলেন। ডিসপেনসারির ভিতর দিয়ে গোপনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিসে পার করে দিলেন আমাকে। ডিসপেনসারিতে তালা দিয়ে চলে যাবার পর সবাই ভাবলো আমি বোধহয় সেখানেই আছি। রাতে গোলাগুলী শুরু হলো। মুজিববাদীরা ডিসপেনসারির তালা ভেঙ্গে দেখলো আমি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর চলে গেলো। ডাক্তারকে আগেই পুলিশে খবর দিতে বলেছিলাম। সকালে কটিয়াদি থানা থেকে ওসি, সিআই ও এসডিপিসহ বহু পুলিশ এলো। পুলিশ না এলে মারা পড়তাম। তারা খুব সহানুভূতি দেখিয়েছে। আমাকে খাটিয়ায় করে কিশোরগঞ্জ নেবার জন্য পুলিশ সেখান থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করলো। এরা পালাক্রমে খাটিয়া বয়ে আমাকে কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এই হাসপাতালে থাকার সময়ও আমার উপর মুজিববাদীরা আক্রমণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকায় সম্ভব হয়নি। কিছুটা সুস্থ হবার পর প্রথমে কিশোরগঞ্জ

জেলে এবং সেখানে নিরাপদ নয় বলে ময়মনসিংহ পাঠিয়ে দিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা। আমার বিরুদ্ধে কিছু মামলা আনা হয়েছিল শুধু জেলে পাঠিয়ে আমাকে রক্ষা করার জন্য। তাই আমাকে কোর্টে যেতে হয়নি, সেসব মামলা এমনিতেই খালাস হয়ে গেছে। খালাস হবার পর ডিটেনশনে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিবের মৃত্যু ও আওয়ামী লীগের পতনের মাস দু'য়েক পর আমি ছাড়া পেয়েছি।'

অন্যান্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাইফুল ইসলাম বলেন: 'ইকোরাটিয়ার রশিদকে তার বাপের সামনে গুলী করে হত্যা করে। তার বাবা আবদুল আলীর হাতের কুঠার দিয়ে বলেছে তার ছেলের মাথা কেটে দিতে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আবদুল আলী বাধ্য হয়েছে ছেলের মাথা কেটে দিতে। সেই মাথা নিয়ে ফুটবল খেলেছে মুজিববাদীরা। ইউসুফকে হত্যা করার পর তার লাশ গাছে টানিয়ে রেখেছে তিনদিন। ফারুক ধরা পড়েছিলো খাগড়ায়। সেখানকার মুজিববাদীরা তাকে বাজিতপুর মুজিববাদীদের হাতে তুলে দেয়। আওয়ামী লীগ অফিসে তাকে নির্মমভাবে পিটাতে পিটাতে হত্যা করা হয়েছে। ফারুক এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলো। এলাকার বহু লোক তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করেছিলো। মাহবুবকে হত্যা করা হয় থানা থেকে নিয়ে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নাকি থানায় চিঠি দিয়েছিলো মুজিববাদীদের হাতে মাহবুবকে তুলে দিতে। অবশ্য পরবর্তীকালে থানার দারোগারও ১৪ বছর জেল হয়েছে। মাহবুবের একটি একটি করে অঙ্গ কেটে লবণ-মরিচ মাখিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করেছে। তার কাটা হাত-পা ও মাথা তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়ে বলেছে মুজিববাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে এই অবস্থা হবে। হোমায়পুরের নূরুল ইসলাম বাজিতপুর এসেছিল বিয়ের বাজার করতে। তাকে ধরে বুকে মই দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে মুজিববাদীরা।'

'চুয়াত্তরের প্রথম থেকে পচাঁত্তরের আগস্ট পর্যন্ত ছয়ছিড়া, দিঘিরগাঁও, বালিয়ারগাঁও, দুলালপুর, গুরুই প্রভৃতি এলাকা ছিলো বিরান ভূমি। দল

বেঁধে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা গ্রামে আসতো। লোকজনকে দাঁড় করিয়ে অকথ্য নির্যাতন করতো। লাঠি-বুটের আঘাত ছাড়াও হাত-পা বেঁধে উল্টো করে নাকে গরম পানি ঢেলেছে বহু লোককে। মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি। আমাদের কর্মীদের শেল্টার দিতো বলে সন্দেহ করে পিরোজপুরের আমিনার স্বারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে, কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঝলসানো শরীর নিয়ে এখনো ধুঁকছে আমিনা। বালিগাঁয়ে আমাদের কর্মী আকবরকে ধরতে না পেরে তার মা'র উপর নারকীয়ভাবে অত্যাচার করেছে। আমাদের রাজনীতি করতো না এমন বহু লোককেও তারা হত্যা এবং অত্যাচার করেছে। সরারচরে 'টাইগার হোল' নামক একটি নির্যাতন ক্যাম্প করেছিলো তারা। আলো-বাতাসহীন সেই গর্তে দিনের পর দিন লোকজনকে আটক রেখে নির্যাতন করতো। অধ্যাপক ইয়াকুবের ভগ্নিপতি হাকিম মাস্টারকে পিটিয়ে আধমরা করে ছালায় ভরে পানিতে চুবিয়েছে।

মুজিববাদীরা নিজেরা ডাকাতি-চুরি করে বলতো 'নক্সালরা' করেছে। আমাদের কর্মীদের গোলা ও মাঠ থেকে হাজার হাজার মণ ধান নিয়ে গেছে। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে এক হাজার মণ ধান লুট করেছে তারা। ইয়াকুব ও তার আত্মীয়েরা কয়েক বছর কোন ফসলই তুলতে পারেননি।'

'বাজিতপুরের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পরবর্তীকালে অনেকগুলো মামলা করা হয়েছিলো। চারজন মাঝি হত্যার কারণে মুজিববাদী আবুলাল, কাঞ্চন ও সামমুদ্দিনের ফাঁসি হয়েছে। আবদুর রহমানসহ অনেকের দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই ফাঁসি রদ করার জন্য জিয়ার আমলে একটি হরতালও আহ্বান করেছিল যা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেক মুজিববাদী এখনো বাজিতপুরে যেতে পারে না। মুজিব আমলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের আত্মীয়।'

আমাদের কাঁদতেও দেয়নি

—নিহত আবসার উদ্দিনের ভাই সামসুদ্দিন ঃ

'হার্মাদরা আমার মা'র চোখের সামনে গুলী করেছে আমার ভাই আবসার উদ্দিনকে। যাবার সময় বলে গেছে, এর লাশ শৃগাল কুকুরে খাবে, কেউ কবর দিলে তাকে হত্যা করা হবে, কেউ কাঁদলে তাকেও হত্যা করা হবে। সকালে মেরে বিকেলে আবার এসে দেখে গেছে লাশ কেউ কবর দিয়েছে কি না, কেউ কান্নাকাটি করছে কি না।'

ইকোরার্টিয়ার সামসুদ্দিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন কথাগুলো। বললেনঃ আমরা চার ভাই, সবাই দূরে দূরে থাকতাম অবস্থা খারাপ দেখে। আবসার ভাই খুলনা মিলে চাকরি করতেন। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে বাড়ীতে এসেছিলেন। সকালবেলা দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। শাহজাহান, আজিজ, বাচ্চু এদের নেতৃত্বে একদল মুজিববাদী ঘেরাও করল আমাদের বাড়ী। আবসার ভাইকে ধরে বাড়ীর নামায় নিয়ে গিয়ে মাথায় গুলী করল। মারার পরও ক্ষান্ত হলো না। কবর দিতে দিলো না, কাঁদতে দিলো না। রাতের অন্ধকারে গাঁয়ের মানুষ শেষে বিলে পুঁতে রাখলো ভাইয়ের লাশ। সারা গ্রামের মানুষকেই পিটিয়েছে তারা। ক্ষেতমজুর সুরুজও মতিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়েছে। মরে গেছে মনে করে ফেলে রেখে গেছে।'

'আবসার উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডে ১১ জনের বিরুদ্ধে পরে মামলা হয়েছিল। এদের কয়েকজনের ফাঁসি হয়েছে অন্য আরেক মামলায়। এই মামলায় যাবজ্জীবন হয়েছে কয়েকজনের। তিনজন খালাস পেয়েছে।'

নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি

নিহত রশিদের বাপ আবদুল আলী।

'আমার সামনে ছেলেকে গুলী করে হত্যা করলো। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, মাথা কেটে দে, ফুটবল খেলব। আমি কি তা পারি? আমি যে বাপ! কিন্তু অত্যাচার কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়? সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি।'

পার্টির লোকেরা আমার বাড়ীতে একদিন ভাত খাইছিলো, এই ছিলো আমার

অপরাধ। রশিদ নাকি রাজনীতি করতো, আমি জানতাম না। একদিন মাতু ও শাহজাহান এসে ধরে নিয়ে গেলো। আওয়ামী লীগ অফিসে সারারাত মারলো। সকালে বললো, এক হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেবো। রশিদ স্বীকার করে এলো এক হাজার টাকা দেবার। আমার কাছে টাকা চাইলো। কিন্তু আমি দিন আনি, দিন খাই, হঠাৎ তিনদিনের মধ্যে এক হাজার টাকা কোত্থেকে দেবো? বললাম, তুই বরং পালিয়ে সিলেট চলে যা। রশিদ সিলেট চলে গেলো। কিন্তু ১০/১২ দিন পরে ফিরে এসে বললো, বাবা, মন মানে না তোমাদের ফেলে থাকতে। সিলেট থেকে আসার পরই অসুখে পড়লো। টাইফয়েড। অসুখ সারার পর একদিন তার মাকে বললো, মা আজ ভাত খাবো। তার মা শৈল মাছ দিয়ে তরকারি রানলো। এমন সময় মুজিববাদীরা ঘেরাও করলো বাড়ী। অসুস্থ মানুষ। কোনো রকম বাড়ী থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিলো। বাবা আমার জানতো না সেখানেও বসে আছে আজরাইল। দৌড়ে এসে ধরলো তাকে। রশিদ সিরাজের পা ধরে বললো, সিরাজ ভাই বিমারী মানুষ আমায় ছেড়ে দেন। ছাড়লো না। আমি দৌড়ে গেলাম। আমাকেও ধরলো। তারপর বাপ-বেটা দু'জনকে বেঁধে মার শুরু করলো। কত হাতে-পায়ে ধরলাম। এরপর মাতু গুলী করলো রশিদকে। ঢলে পড়লো রশিদ। আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। মরার পর একজন বললো, "চল ওর কল্লাটা নিয়ে যাই, ফুটবল খেলবো।" মাতু বললো, "হ্যা, তাই নিবো। তবে ওর কল্লা আমরা কাটবো না, তার বাবায় কেটে দেবে।" বলেই আমার হাতে কুঠার দিয়ে বললো কেটে দিতে। আমার মুখে রা নেই। বলে কি পাষণ্ডগুলো? চুপ করে আছি দেখে বেদম পেটাতে শুরু করলো। বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ আর সহ্য হয়। সিরাজ এসে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বললো, এক্ষুণি কাট, নইলে তোকে গুলী করবো। তখন দেড় ঘণ্টার মতো পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না কাটলে আমাকেও গুলী করবে। শেষে কুঠার দিয়ে কেটে দিলাম মাথা। নিয়ে গেলো তারা। আল্লায় কি সহ্য করবো?'

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অনেকের অন্য মামলায় ফাঁসি ও যাবজ্জীবন হয়েছে। বাকীরা

এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব আবদুল আলী এখনো দ্বারে দ্বারে ঘুরছে বিচারের প্রত্যাশায়। স্টে অর্ডার হয়ে আছে মামলা। এই বৃদ্ধ তার ছেলের হত্যা এবং তার উপর নির্যাতনের বিচার পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন কি?

জনাব সাইফুল ইসলামের মতে, বাজিতপুরে সাম্যবাদী দলের ১২৬ জন কর্মী, সমর্থক ও পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি যাদের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন তারা হচ্ছেন: নিলোখীর আতাউর (২২), বলাই'র বলরাম দাস (২০), জালিয়াবাদের মজিবুর (২২), ছয়ছেড়ার নাসের (১৮), বড়ইকান্দার মনু (৩০), সাদিরচরের হান্নান (২০), ইউসুফ (৩২), বড়ইকান্দার রশিদ (২২), গজারিয়ার হামিদ (২২), কয়েরাটিয়ার আবসার উদ্দিন (২৫), দিঘিরপাড়ের আরফানসহ চারজন মাঝি, ছয়ছেড়ার আবদুর রহিম (৪০, সাত্তার, গুরুইর নূরুল ইসলাম (২০), নেহাম (২৫), নোয়াপাড়ার মাহবুব (২৪), ফারুক (২২), হিকোরাটিয়ার রশিদ, হোমায়পুরের নুরু (২২), দিঘিরপাড়ের সেকান্দার প্রভৃতি।

"তৎকালীন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা জনাব আয়ুব রেজা চৌধুরী কিশোরগঞ্জে তার সংগঠনের দু'জন কর্মীকে মুজিববাদীরা হত্যা করেছে বলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কারে জানিয়েছেন। তিনি বলেন: মোহাম্মদ শাহজাহান (১৮) ছিলো প্রথম কলা বিভাগের ছাত্র। তার বাড়ী কটিয়াদী উপজেলার ফরগাঁও গ্রামে। ১৯74 সালের মে মাসে ইটনার জয়সিদ্দি গ্রামে শাহজাহান এক ঘরে বসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এ সময় ৪/৫ জন মুজিববাদী সেই অবস্থায়ই স্টেনগানের গুলী করলে শাহজাহান নিহত ও কয়েকজন আহত হন। আহতরা কোনো রকম পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। পুলিশ তার লাশ কিশোরগঞ্জে নিয়ে গেছে। ভয়ে কেউ তার লাশ গ্রামের বাড়ীতে আনতেও সাহস পায়নি।'

'মুজিববাদীদের দ্বিতীয় টার্গেট শ্রী রায়মোহন দাস (২৭) ছিলেন বি এস সি শিক্ষক। বাড়ী মিটামন উপজেলার কেওড়ারজোর গ্রামে। তিনি নৌকায় ভৈরব থেকে কেওড়ায় আসার সময় অষ্টগ্রামের মুজিববাদীরা কদমচালের

কাছে নৌকা ঘেরাও করে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তার লাশও পাওয়া যায়নি। পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট আন্দোলন ছাড়াও শাহজাহান ছাত্র ইউনিয়ন ও রায়মোহন কৃষক সমিতির সদস্য ছিলেন। রায়মোহন দুই সন্তানের পিতা ছিলেন।'

সন্ত্রাস : শরিয়তপুর

বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের ষাট বছর বয়স্কা স্ত্রী অরুণা সেনের উপর রক্ষী-বাহিনী যে অত্যাচার করেছে তা পাকিস্তান আমলে ইলামিত্রের উপর নির্যাতনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার নির্যাতনের কাহিনী আংশিক বিবৃতি আকারে ছাপা হয়েছিল একটি অনিয়মিত পত্রিকায়। আমি শরিয়তপুর অঞ্চলের হত্যা ও সন্ত্রাস সম্পর্কে জানার জন্য কথা বলেছি অরুণা সেন, তার স্বামী শান্তি সেন ও ছেলে চঞ্চল সেনের সঙ্গে। অরুণা সেনের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিটি পাশাপাশি তুলে ধরছি :

'১৯৭৩ সালের আগস্ট মাস হবে। উত্তর রামভদ্রপুর গ্রামে রক্ষীবাহিনী এলো। মুক্তিবাহিনীর ফজলু ও আমাদের দলের সমর্থক কৃষ্ণ ধরা পড়লো তাদের হাতে। প্রথমে খুব মারলো তাদের। কৃষ্ণ ছিলো স্কুল শিক্ষক। রক্ষী-বাহিনীর কাছে পানি খেতে চেয়েছিলো কৃষ্ণ, রক্ষীরা তাকে প্রস্রাব খেতে দিয়েছে। কাহিল ও বিধ্বস্ত কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না। একজন রক্ষীবাহিনী বললো, 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে জান? কৃষ্ণ বললো, হ্যাঁ জানি। 'গাও তাহলে।' কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে গাইলো, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' কিছু খেতে দিলো না। ধরে নিয়ে গেলো তাদের। আর ফিরে আসেনি তারা। পরে আমি যখন রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়লাম, তখন তাদের মুখেই শুনলাম, ধরে আনার সময়ই তাদের এমন মার দিয়েছে যে, পথেই মরে গেছে, রাস্তায় ফেলে দিয়েছে তাদের লাশ। কেউ কেউ অবশ্য মনে করে তাদের মাদারীপুর নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।'

এর কিছুদিন পর অষ্টমী পূজা এলো। খবর পেলাম রক্ষীবাহিনী আসছে। বাড়ীতে আমি একা। বস্তির ডেরার মতো একটা ঘরে থাকি। আমাদের আগের ঘর একাত্তর সালে মুসলিম লীগের দালালরা পুড়িয়ে দিয়েছিলো। শুধু পরনের কাপড় ছাড়া সবই লুট করেছিলো ওরা। যাহোক, রক্ষীবাহিনী এসে ঘেরাও করলো আমাকে। জিজ্ঞেস করলো, ছেলে কই? বললাম, আপনারা গ্রামে হামলা করেন বলে পালিয়ে গেছে। তারপর আমাকে নিয়ে গেলো থানার কাছে। স্বামী ও ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলো প্রথম। বললাম, জানি না। সেখান থেকে আমাকে নড়িয়া নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে গ্রামের লক্ষণ বলে একটি ছেলেকেও ধরেছিলো। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চললো। নড়িয়া নিয়ে একটা খালি ঘরে বসালো আমাকে। একই কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলো। এমন কথাও বললো, "আমরাও কিন্তু সমাজতন্ত্র পছন্দ করি।" তখন কিছু খাওয়া হয়নি আমার। ক্ষুধা লেগেছিলো। এরপর নিয়ে গেলো নড়িয়া থানায়। সন্ধ্যার সময় আবার ক্যাম্পে নিয়ে গেলো। একটা রুটি খেতে দিলো। আবার থানায় পাঠালো। সেকেণ্ড অফিসারের বউ রাতে খেতে দিলো, থাকতে দিলো। পরদিন চলে এলাম।'

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে আবার এলো রক্ষীবাহিনী। আমাকেও ধরলো। সে ঘটনা আমি বিবৃতিতে বলেছি।

অরুণা সেনের বিবৃতি

'গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করে। ঐ দিন ছিলো হিন্দুদের দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরেই আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে মারপিট করে। লক্ষণ নামের একটি কলেজের ছাত্র এবং আমাকে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন এবং পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরও জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ী ফিরে, দেখি মারধোরের ফলে সে গুরুতর

অসুস্থ। চার পাঁচদিন পর আবার তারা রাত্রিতে গ্রামের ওপর হামলা করে। অনেক বাড়ী তল্লাশি করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামের দুটি যুবককে মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ী ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গেলে বলে দিয়েছে তারা সেখানে নেই। তাদের মেরে ফেলেছে বলেই মনে হয়। এরপর থেকে রক্ষীবাহিনী মাঝে মাঝেই গ্রামে এসে যুবকদের খোঁজ করতো। কিন্তু তেমন কোনো ব্যাপক হামলা হয়নি।

'গত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) রাত্রি থাকতে এসে রক্ষীবাহিনীর একটি দল সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেললো। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেলো। সেখানে দেখলাম গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষমদেহী পুরুষ এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ তদারক করছে। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট করে। শুনলাম এদের সকলকে ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়েদেরও প্রচণ্ড মারপিট করেছে এবং অশ্লীল আচরণ করেছে। তাদের এক দফা মারপিট করে রক্ষীরা আমাকে বললো পানিতে নেমে দাঁড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলী করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। কিন্তু নদীর পানি দূরে সরে যাওয়ায় হাঁটু সমান কাদাতেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওরা তাক করে রাইফেল ধরলো গুলী করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কি যেন বলাবলি করে রাইফেল থামিয়ে নিলো। কাদার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কমাণ্ডার গ্রেফতার করা লোকদের হিন্দু-মুসলিম দুই ভাগ করে দুই কাতারে দাঁড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বললোঃ 'মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা যাবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারকার মতো মাফ করে দেওয়া হলো।' এই বলে কলিমদ্দি ও মোস্তফা নামে দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে আর সবাইকে এক এক বেতের বাড়ি দিয়ে বললোঃ 'ছুটে পালাও'। তারা ছুটে পালিয়ে গেলো। আমার পাক-বাহিনীর কথা মনে হলো। তারাও এ বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিলো।

পার্থক্য তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতো আর এই ধর্ম-নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা ভণ্ডামির আশ্রয় নিচ্ছে।'

'আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমদ্দি ও মোস্তফাসহ ২০ জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলো। তিনজন ছাড়া এরা সবাই জেলে। মাছ মেরে কোনোরকমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। আর তাদের মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলো। সে এক মর্মবিদারী করুণ দৃশ্য। সন্ধ্যার সময় কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকী সবাই গ্রামে ফিরে এলো। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ তাদের ফুলে গিয়েছে। বেত ও বন্দুকের দাগ শরীরে ফেটে ফেটে বসে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা। হাত-পায়ের গিরোতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম, সারাদিন তাদের দফায় দফায় চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে বারবার ছুড়ে ফেলে চুবিয়েছে। পিঠের নীচে ও বুকের ওপর বাদ দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তাদের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের কাউকে কাউকে আত্মীয়রা যেয়ে বয়ে এনেছে।'

'এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলাম, যারা দিন-রাত্রি পরিশ্রম করেও আজ এক বেলা পেটপুরে খেতে পায় না। অনাহার, দুঃখ, দারিদ্র্যের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত। তাদের 'মরার ওপর খাড়ার ঘা'র কবে অবসান হবে। যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন্ অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন।'

'অবশেষে চরম নির্যাতন আমার ওপরও নেমে এলো। ৬ই ফেব্রুয়ারী ('৭৪) রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুললো। আমাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলে দেখলাম রীণাও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলো। রাস্তায়

রীণার প্রতি তারা নানা অশ্লীল উক্তি করছিলো। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম; সেখানে কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষও রয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা গেলো, তাদের ওপর গুরুতর দৈহিক নির্যাতন হয়েছে। বিশেষ করে কলিমদ্দি ও মোস্তফাকেই বেশী অসুস্থ দেখলাম। কলিমদ্দি মোস্তফা দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোনো সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি চাষ করে এরা কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।'

'আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়, এমনি সব বর্বরতা: কিছুক্ষণ পর আমাদের রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেলো। সন্ধ্যায় আমাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত্রিতে রীণাকে তারা উপরে দোতলায় নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরই শুনলাম রীণার হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেলো। নিঃস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিলো শুধু বেতের ক্ষীণ সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। রীণাকে যখন তারা এনে কামরার মধ্যে ফেললো, রাত্রি তখন কত জানি না। রীণার অর্ধ-চেতন দেহ বেতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত রক্ত ঝরছে। রীণার জ্ঞান এলে পানি চাইলো। আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রীণা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারলো। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রীণার মুখে শুনলাম ওপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং ঐ দুই স্থানের ক্যাম্প কমাণ্ডাররা উপস্থিত ছিলো। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রীণা কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে, যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা ও গালি বর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পের কমাণ্ডার বেত নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি এমন পিটাতে থাকে যে পর পর তিনখানা বেত ভেঙে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায়? রীণার একই উত্তর।

ক্ষিপ্ত হয়ে রাণীকে তারা সিলিং-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমাণ্ডার দুইদিক থেকে একসঙ্গে চাবুক চালাতে থাকে। মারার সময় রীণা বলেছিলো, 'আমাকে এভাবে না মেরে একেবারে গুলী করে মেরে ফেলুন।' জবাবে তারা বলে সরকারের একটা গুলীর দাম আছে, তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবো। এখন পর্যন্ত মারার হয়েছে কি? অল্প পরেই রীণা অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তারা ঐ দেহের ওপরই চাবুক চালাতে থাকে। জ্ঞান এলে রীণা দেখে যে, সে মেঝের ওপর পড়ে আছে। পানি চাইলে তাকে পানিও দেয়া হয়নি। "৮ই ফেব্রুয়ারী ('৭৪) প্রথমে আমাকে ও পরে রীণাকে দোতলায় নেয়া হয়। সেখানে দেখলাম ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিয়া ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ চেয়ারে বসে আছে। আমাকে বললো, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে।" আমি বলি, 'তারা ডাকাত নয়, তারা সৎ, দেশপ্রেমিক, আমার স্বামী রাজনীতি করেন, একথা কে না জানে। তিনি এদেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়।' রীণাকেও তারা একই প্রশ্ন করে। রীণা জানে না বলায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমাণ্ডার কদম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমাণ্ডার বজলুর রহমান এরা সবাই আমাদের অশ্লীল গালাগাল দিতে থাকে। এবং আমাকে ও রীণাকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রীণার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর দু'জনকে দু'দিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হলে দেখি, আমরা উভয়েই মেঝেতে পড়ে আছি। রীণার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবুও এই রুগ্ন বৃদ্ধদেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। এদের হুকুমে দু'জন রক্ষী সিপাই আমাকে টেনে তুললো। অতিকষ্টে দাঁড়াতে পারলাম। রীণা পারলো না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নীচে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিলো ও টানতে টানতে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো। কমাণ্ডার পিছন থেকে নির্দেশ দেয়। 'ওকে ভালো করে হাঁটা নয়ত মরে যাবে।' সকালে কমাণ্ডার কয়েকজন রক্ষী সিপাইসহ রীণাকে

নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হলো। বললো, বাঁচবি তো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি। রীণার সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। একটি পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে দু'হাতের দু'বাহুতে ধরে দু'জন রক্ষী প্রায় টানতে টানতে দু'মাইল দূরে গ্রামের দিকে নিয়ে চললো। ঠাট্টা করে বলছিলো, হাঁটলে পা ব্যথা কমে যাবে। বাড়িতে নিলে রীণার মা তাকে দেখেই ফিট হয়ে যান। কমাণ্ডার রীণাকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রীণার মার জ্ঞান এলে রীণার চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমাণ্ডার বলে, পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। রীণাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রীণার মা কমাণ্ডারের কাছে অনুনয় করলে কমাণ্ডার বলে, 'খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।' রীণাকে তারা দু'মাইল রাস্তা পুনরায় টানতে টানতে নিয়ে এলো। ঐ দিন ছিলো ৯ই ফেব্রুয়ারী ('৭৪)। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এলো ঐ দিন। করিম নামে আর একটি কৃষক যুবককেও তারা রামভদ্রপুর থেকে এনেছে দেখলাম। কিন্তু তাকে এতো মেরেছে যে তার অবস্থা সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পণ্ডিত সার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দু'জন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামের একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাহীরা বলাবলি করছিলো। একজন জল্লাদ গর্ব করে বলছিলো, 'দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে'। শুনেছি মতি নামে আর একটি যুবককে তারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'দিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত-পা বেঁধে দোতলার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে।

"নয় তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রীণা ও আমাকে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামালো। প্রথম আমাদেরকে ওরাই সাঁতরাতে বাধ্য করলো। আমরা শ্রান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন তারা আমাদের পানিতে ডুবিয়ে আমাদের দেহের ওপর দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এভাবে তিন দফা

আমাদের চুবানো ও পেটানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর একটি অল্পবয়সী যুবককে চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিলো। তাকে ঘাটলার ওপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মোছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়। 'মা আপনি কে' বলে করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি, ছেলেটিকে নাকি মেরে ফেলেছে।"

"সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করলো। দারুণ শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচণ্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের ওপর পড়ে থাকলাম। পরদিন রাতে রীণাকে আবার নিয়ে গেলো দোতলায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারলো। ১১ তারিখে আবার রীণার ওপর চললো এই অত্যাচার রীণা জ্ঞান হারালো। রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম, রীণা মরে গিয়েছে। রীণার কাছে শুনলাম, তার যখন জ্ঞান হলো, তখন সে দেখে তার পাশে ডাক্তার বসা। রীণা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে, আমি কোথায়?' ডাক্তার জবাব দেয়, আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না। কিছুক্ষণ পরই ডাক্তার চলে গেলে রীণাকে তারা ধরাধরি করে নীচে আমাদের কাছে নিয়ে এলো।"

"একজন সিপাই রীণা ও হনুফাকে বলে তোরা তো মরেই যাবি, তার আগে আমরা প্রতিরাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করবো। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই। বলেছিলো অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দু'টি রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে দেয়। রীণা ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চীৎকার করে। চীৎকার শুনে ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমাণ্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, খবরদার একথা প্রকাশ করো না। তাহলে মেরে ফেলবো।"

"রক্ষী সিপাহীদের কারো কারো মধ্যে মাঝে মাঝে মানবতা-বোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তারই একটি সিপাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি

কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছো ? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো। বললো, 'বাংলাদেশে লেখাপড়া দিয়ে কি করবো ? আমরা জল্লাদ, জল্লাদদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি'—এই বলে সে দে-ছুট। মনে হলো যেনো চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাচ্ছে।

"রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে আর হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রীণা ও অন্যান্য পুরুষ বন্দীকে মেরে ফেলা হবে।

"১২ই ফেব্রুয়ারী আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওয়ানা দিলো। আমরা রীণাকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রীণাও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিলো, কমাণ্ডারের কাছে অনুনয়-বিনয় করছিলো। কমাণ্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখলো। ১২ তারিখেও ওরা রাত্রিতে আবার রীণাকে ঝুলিয়ে হাণ্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রীণাকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে ; জোর করে চেপে ধরে নাক-মুখ চেপে রাখে। এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা ছেড়ে দেয়।"

"১৯শে ফেব্রুয়ারী রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়ে রওয়ানা দিলো প্রায় চার মাইল দূরে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেলো। রক্ষীরা বলাবলি করছিলো, তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছু দূরে এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলীর আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম ওদের বুঝি মেরে ফেললো। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। তারপর আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিলো যে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাঁটতে। বোধহয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে, বোধহয় বেঁচে যাবো। এই চিন্তাই আমাদের হাঁটতে শক্তি যোগাচ্ছিলো। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীড বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। সমস্তক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মূর্দার মতো ঢেকে রাখা হলো। বেদনা জর্জরিত

ক্ষতবিক্ষত শরীর। তার ওপর কম্বল চাপা থেকে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেনো জ্যান্ত কবর। আমাদেরকে মাদারীপুর ক্যাম্পে আনা হলো। সেখানে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলো। সমস্ত দিন আমাদে ওখানেই রাখলো। খেতে দিলো না। শেষ রাতে জীপে করে আবার কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হলো। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেলো। সে আমাদের খুব ধমক লাগালো। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে গেলো তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠালো সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এলো তেজগাঁ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। সেখানে পাঁচদিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।''

"জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদের মতো রাখা হতো। দিনরাত সেলে বন্দী। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরও বন্দিনী আছে। তারমধ্যে ১৭ই মার্চ ('৭৪) গ্রেফতার জাসদ নেত্রী মমতাজ বেগম আছেন। অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভিন। আরও একজন, নাম রুমা, আছেন। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়েছে এবং সাধারণ কয়েদীদের মতো খাটানো হচ্ছে। এর ওপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা-কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড়-চোপড় ধোয়ানো সব কিছুই মেয়ে কয়েদীদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিনীদেরও রেহাই দিচ্ছে না।''

(সংস্কৃতি: ১ম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, মে-জুন-'৭৪ : পৃষ্ঠা-৭৯-৮৮)

যে কথা বিবৃতিতে বলা হয়নি সে সম্পর্কে অরুণা সেন বললেন:

'যে জেলেদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছিলো, সে মারের প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে রামভদ্রপুরের অবলা নামের একজন জেলে মারা গেছে। ভারতে চলে গেছে অনেকে। ওরা আমার ঘাড়ে পা দিয়ে কিভাবে যে ঝাঁকুনি দিয়েছে জানি না, পরে বহুদিন আমি ঘাড় সোজা করতে পারিনি।

একদিন পানিতে চুবিয়ে চুলে ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো গুঁড়ো পাথরের কাছে। গুঁড়ো পাথরের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে চুল ধরে এদিকে ওদিকে জোরে নাড়লো। কতক্ষণ পর্যন্ত খুব ব্যথা লাগতো। তারপর ব্যথাবোধও রহিত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর ছুড়ে দিলো পানিতে। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম কাদার মধ্যে পড়ে আছি। আস্তে আস্তে উঠে এলাম উপরে। সন্ধ্যায় ভীষণ জ্বর এলো। ভেজা কাপড়ে ছিলাম তখনো। সহ্য করতে না পেরে অনেক দুঃখে তখন রক্ষীবাহিনীর লোকদের বলেছিলাম, "আমার অভিশাপে তোরা শেষ হয়ে যাবি।"

'আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়তাম তখনো নাকি বলতে থাকতাম, "জানি না, জানি না।" রক্ষীদের সবাই যে খারাপ ছিলো সেটা আমি বলবো না। অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছে গোপনে, চোখের পানি মুছতো কেউ কেউ। একজন বললো, সে মুক্তিবাহিনীতে ছিলো। এখন চাকরি ছেড়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেও বাঁচবে না। কিন্তু এসব যে সহ্যও করতে পারছে না।

'আমার শরীরের কোনো অংশই সাদা ছিলো না। নীল হয়ে গিয়েছিলো ব্যথায় ব্যথায়। আমাকে ধরার পর বাইরে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছিলো তা জানতাম না। রীটের কথাও জানতাম না। ৫/৬ দিন পর দেখলাম আমার প্রতি ব্যবহার একটু সদয় হয়েছে। এক অফিসার বললো, ' চিকিৎসা করে বুড়িকে সারিয়ে তোলো। মরে গেলে মুস্কিল হবে।" তখোন ১২ দিন পার হয়ে গেছে।'

কলিমুদ্দি, মোস্তফা, হরিপদ ও গোবিন্দকে মারার আগেই তাদের কবর খোড়া হচ্ছে দেখলাম। ক্যাম্প থেকে আমরা সামান্য দূরে আসার পরই তাদের হত্যা করা হয় গুলী করে। নড়িয়া থেকে ডামুড্যা এবং সেখান থেকে মাদারীপুর নিয়ে এলো আমাদের। মাদারীপুরে ক্যাম্পে এসে দেখলাম শেখ মনি বসে আছে। রীট হবার পর শেখ মুজিব নিজেও নজর রাখছিলো ঘটনার উপর। তিনিই শেখ মনিকে মাদারীপুর পাঠিয়েছিলেন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মনি আমাকে বৌদি বলে সম্বোধন করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললো। তাকে বললাম কিছু খেতে দিতে। সামান্য কিছু খাবার

ব্যবস্থা করলো। রীণার উপর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে জানতে চাইলে আমি বললাম, রীণাও বললো। সে তখোন বিচারের আশ্বাস দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন আমাদের ঢাকা আসা হলো। প্রথমে শেরেবাংলা নগর রক্ষী-বাহিনী হেড-কোয়ার্টারে এবং পরে আই বি-র তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন থাকার পর জেলে পাঠিয়ে দিলো। দেড় মাস পর বিনাশর্তে মুক্তি পেলাম। মুক্তি পেয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলাম। না গেলে মরতে হতো। কারণ, ধরার পরপরই আমাদের হত্যা করা হয়নি বলে আওয়ামী লীগের উচ্চ মহলের লোকেরা নাকি রক্ষীবাহিনীর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলো। মুক্তির কয়েকদিন পর আবার হত্যা করতে গিয়েছিলো, কিন্তু পায়নি। আমাদের না পেয়ে রীণার বাবা শশধরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার করে। তার বয়স তখন ষাটের উপরে। এই বৃদ্ধ বুটের লাথিও খেতে খেতে পায়খানা করে দিয়েছিলো। রীণাকেও আর পায়নি। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিলো।

ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে থাকার সময় আমার চোখের সামনে হত্যা করেছে করিম উদ্দিন নামক একজনকে। সে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। ক্ষেতে কাজ করার সময় ধরে এনেছিলো তাকে। প্রচণ্ড মারের চোটে তার যখন অন্তিম দশা তখোন তাকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তার বাড়ী ছিলো রামভদ্রপুর চরে।

ডিঙ্গামানিক গ্রামের প্রাণকুমার কর্মকারকে খুব সঙ্গীন অবস্থায় দেখে-ছিলাম ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে। পরে ডামুড্যা নিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। লাশ পাওয়া যায়নি। কিশোরী ডাক্তারের ভাগ্নে পানুও গুলী খেয়েছিলো। সে অবশ্য বেঁচে গেছে পণ্ডিসার স্কুলের একজন বি এস সি শিক্ষককে সারারাত প্রহার করেছে ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পে। তার চিৎকারে কেউই ঘুমুতে পারেনি। মইশালের কাদেরকে মারতে মারতে হত্যা করেছে। ভেদরগঞ্জের আই-য়ুব আলী চেয়ারম্যানের জামাইকে 'নকশাল'দের শেল্টার দেয় বলে অভি-যোগ এনে হত্যা করে। রক্ষীরা তাকে মারতে চায়নি, আওয়ামী লীগ

নেতা হোসেন খাঁ রক্ষীবাহিনী লিডারের কাছ থেকে রিভলভার নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। হোসেন খাঁকেও পরে অবশ্য জীবন দিতে হয়েছে। আমার এক পালিতা মেয়ের বাবার নাম ছিলো যজ্ঞেশ্বর দেওয়ানজী। নকশালদের শেল্টার দেয়, এই অভিযোগে তাকে ধরে নিয়ে যায়। বৃদ্ধও অসুস্থ ছিলো সে। আধমরা করে তাকে নদীতে ফেলে দেয়। তার লাশ আর পাওয়া যায়নি। মরার আগে সে এক কাপ পানি চাওয়ার জন্য খুব অনুনয়-বিনয় করায় প্রস্রাব খেতে দেয়া হয়েছিলো তাকে। তার স্কুল ছাত্র ছেলেকেও ধরেছিলো। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষেরদিকে তারা মেরে আর কবর দিতো না, নদীতে ফেলে দিতো। গোবিন্দকে কবর থেকে তুলে নদীতে ফেলে দিয়েছিলো।

শান্তি সেন আমার কাছে বললেন, আরো কয়েকটি নারকীয় নির্মমতার কথা। সেই সঙ্গে বর্ণনা করলেন হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিকতা।

আমার জনপ্রিয়তাই সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলো :

—শান্তি সেন

'রক্ষীবাহিনী রীণাকে ধরার পর তার বোন সোনালীকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। সোনালী টের পেয়ে পালানোর জন্য রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করে। বেশ কিছু দূর চলে যাবার পর রক্ষীবাহিনী তাকে দেখতে পেয়ে পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে। সোনালী রামভদ্রপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ডিঙ্গামানিক গ্রামের কানাইলালের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি সেলোয়ার কামিজ পাল্টে শাড়ি পরে থালা-বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে মাজতে শুরু করে। কানাইলালের স্ত্রী এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ পর রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন এসে সোনালীকে দেখতে না পেয়ে কানাইলালের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে। সে তখোন দেখেনি বলে জানায়। এসময় ঘাটে বাসন মাজা অবস্থায় বসা মেয়েটিকে দেখিয়ে রক্ষীরা পরিচয় জিজ্ঞেস করলে মহিলা তার খালাতো বোন বলে পরিচয়

দেয়। সোনালী ঘোমটা দিয়ে বসেছিলো বলে চিনতে পারেনি। এরপর রক্ষীবাহিনী চলে যায়। সম্ভবত গ্রামের অন্য কেউ রাতে প্রকৃত ঘটনাটি রক্ষীবাহিনীদের জানিয়ে দিলো। পরদিন কানাইলালের বাড়ীতে তারা আবার আসে এবং মেয়েটির খোঁজ করে। কানাইলালের স্ত্রী তখোন বলে যে, সে তাদের নিজের বাড়ীতে চলে গেছে। রক্ষীবাহিনী তখন কানাইলাল ও তার স্ত্রীকে বাড়ীর উঠানে নিয়ে অকথ্য ও নির্মমভাবে মারধর করে। সোনালী তো আগের রাতেই পালিয়ে কেদারপুর চলে যায়। ডিঙ্গামানিক থেকে চার মাইল উত্তরে।

পরদিন কেদারপুরে ঘটে আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। সোনালী যে গ্রামের বিপ্লব নামক এক ছেলের সহায়তায় অনেক পথ হেঁটে ঢাকাগামী লঞ্চে চড়ে পালিয়ে গেলো। রক্ষীবাহিনী এসে বিপ্লবকে প্রথম খুব মারধর করলো। কিভাবে টের পেয়েছিলো জানি না যে বিপ্লবই সোনালীকে সাহায্য করেছে। যাহোক, খুব মেরে বিপ্লবের মা ও বাবাকে ডাকিয়ে আনলো। তারপর বিপ্লবকে বললো "কলেমা পড়।" বাধ্য হয়ে বিপ্লব হিন্দু হয়েও কলেমা পড়লো। এরপর বললো. "সেজদা দাও পশ্চিম মুখি হয়ে।" ভয়ে বিপ্লব তাই করলো। যখন সেজদা দিলো, পেছন থেকে বেয়োনেট চার্জ করে বাবা-মা ও অনেক লোকের সামনে হত্যা করলো তাকে। বেয়োনেট চার্জ করার সময় রক্ষীদের একজন বললো. "মুসলমান হয়েছো, এবার বেহেস্তে চলে যাও।"

'স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার পর আমাদের অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন আওয়ামী লীগের স্টুয়ার্ড মুজিব ও সিরাজ সরদার। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছিলো পাক বাহিনী নিধনের ব্যাপারে। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিলো। আমি তাদের খোলাখুলিই বলেছি যে, ভারতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত ভার ভারতের উপর ছেড়ে দিলে সেই স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলাও কায়েম হবে না. এর

জন্য আবার লড়াই করতে হবে। স্টুয়ার্ড মুজিব ও সিরাজ সরদার আমার কথায় প্রভাবিত হলেও দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে আওয়ামী লীগের নীতিই অনুসরণ করতে থাকেন। তারা অবশ্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে তাদের ক্যাম্পে যেতাম আমি এবং রাজনৈতিক আলোচনা করতাম। এক সময় স্টুয়াড মুজিব ভারতে চলে গেলেন। সিরাজ সরদার ভারতে যেতে অস্বীকার করলেন। যাহোক, বহু বামপন্থী ছেলে তাদের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে এলো তাদের সঙ্গে আমাদের গ্রুপের ছেলেদের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে ৮০ জন ছেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যাবার সময় ফরিদপুর ও চাঁদপুরের মিলনস্থলের কাছে এক জায়গায় মুসলিম লীগারদের হাতে আটকা পড়েছিলো। আমরা খবর পেয়ে আমাদের বাহিনী দিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। কারণ আমরা মনে করতাম, পথ ভিন্ন হলেও মুক্তিযোদ্ধারা দেশপ্রেমিক। এলাকায় আমাদের প্রাধান্যের খবর শুনে কলকাতায়ও আওয়ামী লীগের একাংশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। এর আগে আমাকে নির্মূল করার জন্য কোলকাতা থেকে একটি চিঠি এসেছিলো। তাজউদ্দিন স্বাক্ষরিত ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রেরিত সেই চিঠিতে লেখা ছিলো, "এ্যারেস্ট শান্তি, এণ্ড কিল হিম।" স্বাধীনতার পর তাজউদ্দিন অবশ্য বলেছিলেন যে, সে চিঠি তিনি পাঠাননি। এটি ভুয়া ছিলো।'

'যাহোক, আমাদের অঞ্চলে আমাদের দল এবং মুক্তিবাহিনীর ভেতরে বামপন্থীদের প্রাধান্য নির্মূল করার জন্য তখন পদক্ষেপ নেয় সরকার। কর্ণেল (অব) শওকত আলীর প্রভাবিত দল এ কাজের ভার নেয়। অঞ্চ-লের ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার তখোন আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলে।

বর্ষাকালে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলে শওকত আলীর বাহিনী তাদের নদীতে হত্যা করে। হিরু ও কাঞ্চনসহ

২১ জনের সেই ব্যাসটি ছিলো বামপন্থী চিন্তার অনুসারী। এসময় আঘাত এলো সিরাজ সরদারের ওপর। তিনি পালিয়ে গিয়ে সিরাজ সিকদারের বাহিনীতে আশ্রয় নিলেন। আমার সঙ্গে একদিন দেখা করলেন সিরাজ সরদার। তাকে বললাম, আপনি পপুলার লোক, নিজের এলাকায় চলে যান। জনগণই আপনাকে রক্ষা করবে। এভাবে বাঁচতে পারবেন না। তিনি ভরসা পেলেন না। সিরাজ সিকদার তাকে চারজন গার্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একদিন শওকত আলীর বাহিনী বিনোদপুর গ্রামে শরিয়তপুরের এক বৈঠকের নাম করে তাকে নিয়ে এলো। এরপর ঘেরাও করে প্রথমে তারা সিরাজ সিকদারের দেয়া চারজন গার্ডকে হত্যা করলো। আর সিরাজ সরদারকে নিয়ে গেলো নদীতে। নৌকার মাঝির বর্ণনা মতে, প্রথমে তারা সিরাজ সরদারের হাতের কবজি কাটলো, তার পর পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে এবং শরীরের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দিলো। এই নৃশংসতার নেতৃত্ব দিয়েছে ইদ্রিস নামক আওয়ামী লীগের গুণ্ডা, যার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ ছিলো সিরাজ সরদারের। পরে ইদ্রিস একইভাবে নিহত হয়েছে।'

অবস্থা বুঝতে পেরে আমি একদিন সিরাজ সিকদারের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'বামপন্থীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, আসুন ফ্রন্ট করি। কিন্তু সিরাজ সিকদার তাতে রাজী হয়নি, বরং আমাদের এলাকা থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে বরিশাল নিয়ে গেছেন।'

ফাঁদে ফেলে আমাকেও একবার গ্রেফতার করেছিলো হত্যা করার জন্য। তখোন অক্টোবর মাস। আগে থেকে তারা আমাকে খুঁজছিলো। আমার নিজস্ব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মান্নান ছিলো আমার ছেলে চঞ্চল সেনের বন্ধু। একদিন আমি তাকে চিঠি লিখে জানালাম যে, আমরা এই মুহূর্তে কেউ কারো শত্রু নই এবং পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উভয়ের শত্রু। আমাকে শত্রু মনে করা ঠিক হচ্ছে না। এ

বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তারিখ ও স্থানের কথা জানিয়ে দিলাম। তারা আমার দেয়া তারিখের একদিন পর আলোচনায় বসতে রাজী হয়ে চিঠি দিলো। আসলে তারা আমার অবস্থান জেনে নিয়েছিলো কৌশলে। নির্ধারিত দিন বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কয়েকজন কর্মীসহ আমাকে ঘেরাও করলো। আমার কর্মীরা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে আমি বাধা দিলাম। এ ধরনের রক্তক্ষয়ের পক্ষপাতী ছিলাম না আমি। সবাইকে নিয়ে সারেণ্ডার করলাম। আমাদের নিয়ে কি করা হবে এ নিয়ে মতভেদ দেখা গেলো। বাংলাদেশ সরকারের পরিষ্কার নির্দেশ আমাকে হত্যা করার। অঞ্চলের প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মিলে পরামর্শ করলেন। বেশীর ভাগ মতামত দিলেন ছেড়ে দিতে। এদিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। আমাকে হত্যার নির্দেশ তারা পালন করবেনা বলেও কেউ কেউ প্রকাশ্যে জানিয়ে ছিলেন। কমাণ্ডাররা বিশেষ করে তাদের বাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেবার ভয়েই আমাদের ছেড়ে দিলেন। সাথে সাথে ক্ষমাও চাইলেন। বস্তুতঃ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তাই সেদিন আমাকে রক্ষা করলো।”

আমার ছেলে চঞ্চল সেন মুজিববাদীদের বিরাগের কারণ হয়েছিল অন্য আরো একটি কারণে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে খুলনায় যখন বিহারী নিধন চলছিলো তখন দুই লঞ্চ ভর্তি অবাঙ্গালী নারী ও শিশু পালিয়ে ঢাকা আসছিলো টেকেরহাটের কাছে মুক্তি বাহিনীর হাতে একটি লঞ্চ আক্রান্ত হলে অন্যটি পালিয়ে ফরিদপুরের এক চরে চলে আসে। সারেং বিহারীদের চরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। এরা নদীর পাড় ধরে আমাদের এলাকায় অতিক্রমের সময় লুটপাট বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। চঞ্চল তখন সেখান থেকে ৩০ জন নারী-শিশুকে উদ্ধার করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। শওকত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন আমাদের বাড়ীতে এসে দাবি করলো যে, আশ্রয়দাতা সেনই এই অবাঙ্গালীদের হত্যা করতে হবে। চঞ্চল

তখন তা করতে অস্বীকার করলে মুক্তিযোদ্ধারা স্টেনগান নিয়ে ঘরে ঢুকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু অসহায় নারী-শিশুর করুণ অবস্থা দেখে তাদের মায়া হয় এবং হত্যা না করেই চলে যায়। কিন্তু চঞ্চলকে অভিযুক্ত করা হয় অবাঙ্গালী আশ্রয় দানের জন্য। এই ঘটনা কোলকাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে।

'১৯৭২ সালের শেষের দিকে রক্ষীবাহিনী আমাদের এলাকায় আসা শুরু করলো। প্রথমে তারা কার্যক্রমের ক্যাম্প করলো গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ, ঘড়িসার, নড়িয়া, পালং প্রভৃতি জায়গায়। প্রথম আক্রমণের শিকার হলো নড়িয়া থানার মতিয়ুর রহমান। তার বাড়ী থানার কাছেই ছিলো। মতিয়ুর রহমানকে ধরা হয়েছিলো ঢাকায়, পালিয়ে ছিলো। বাড়ীতে তাকে না পেয়ে রক্ষীবাহিনী তার বাবা মা ও ভাবীকে অনেক মারধর করেছে এবং তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। মতিয়ুরের ভাবীর উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিলো বলেও আমরা শুনেছি। এরপর শুরু হলো সারা এলাকায় আক্রমণ। আমাদের গ্রামের নাম রামভদ্রপুর।

আমাকে ধরেছিলো যুবলীগের লোকেরা। ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ, খুব সকালে আমি সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মী সৈয়দ জাফরের মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে ধানমণ্ডি যাচ্ছিলাম। গ্রাফিক আর্টস কলেজের কাছে আসার পর যুবলীগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট লুৎফর রহমান আমার রিক্সা আটকালো। সে আমার এলাকার ছেলে, চিনতো আমাকে। তার বড় ভাই ও আমি এক সঙ্গে পড়তাম। তার সঙ্গে চন্দন নামের আরো একজন ছিল। আমাকে দেখে তারা যখন রিক্সা থামালো তখনই বুঝলাম ধরতে আসছে। ওরা প্রথমেই আমার এ্যাটাচী কেসটা ছিনিয়ে নিলো। আমি চেঁচামেচি শুরু করলাম যাতে লোক জড়ো হয়, কারণ ধরে নিয়ে গেলে আমার পরিণাম কি হবে তা জানতাম। আমার চিৎকারে লোকজন আসতে লাগলো। লুৎফর তখন লোকজনকে বললো, "এ লোক নকশাল, একে আমাদের অফিসে নিয়ে যাচ্ছি।" আমিও বেগতিক দেখে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি যদি অপরাধীই হই তাহলে যুবলীগের অফিসে কেন যাব,

থানায় যেতে দিন। কিন্তু লুৎফর বলতে থাকলো যে অফিসেই যেতে হবে। সে যখন অফিসে নেবার জন্য জোর খাটাতে গেলো তখন চারদিকের লোকজনও বাধা দিয়ে বললো, অফিসে নিতে পারবেন না, থানায় নিয়ে যেতে দিন। তখন আমার মায়ের ঘটনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বলে অনেকেই যুবলীগারদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলো। তারা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো। আমি তখন উপস্থিত জনতাকে আবার বললাম, আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে পারলে ওরা হত্যা করবে। আপনারা অনুগ্রহ করে থানায় নিয়ে চলেন। আমি কোন অপরাধী হলে কোর্ট বিচার করবে। এভাবে বাদানুবাদ করতে করতে বেলা ৯টা বেজে গেলো। এর মধ্যে ৫০/৬০ জন যুবলীগার এসে জমা হয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে আবার যখন আমাকে নেবার জন্য জোর খাটাতে গেলো তখন লোকজনও তাদের ওপর মারমুখী হয়ে হয়ে উঠলো। প্রায় হাজারখানেক লোক জমা হয়ে গেছে তখন। তাদের সামনেই যখন আমাকে যুবলীগাররা পেটাতে শুরু করলো তখন মারামারি বেধে গেলো। আমার হয়ে তাদের সঙ্গে কিছু লোক মারামারি করতে লাগলো, তাদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ছাত্র। এসময় গ্রাফিকস কলেজের প্রিন্সিপাল এলেন। আমি তাকে বললাম, স্যার আপনি আমাকে পুলিশে দিয়ে দেন, এদের হাতে দেবেন না। তিনি বেশ কিছু ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে কলেজের ভিতরে একটি কক্ষে রাখলেন। তিনি থানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেবার সময়ই ৫০/৬০ জন যুবলীগার কক্ষের তালা ভেঙ্গে আবার আমাকে গেটের দিকে নিয়ে এলো। তারা কলেজের মাইক্রোবাসে উঠালো আমাকে। কিন্তু ড্রাইভার চাবি নিয়ে পালিয়ে গেলো। জড়ো হওয়া লোকজন ও ছাত্রদের সঙ্গে আবার মারামারি বেঁধে গেলো তাদের। এসময় রক্ষীবাহিনীর ৬টি ট্রাক ও ২টি জীপ এলো। দুপুর ১২টা তখন। চারদিক ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে গেলো তারা শেরেবাংলা নগরে। একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলেন অনেক কিছু। আমি কিছুই জানি না বলে জানালাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেনো? উত্তর দিলাম যে, ভয়ে পালিয়ে

বেড়াচ্ছি। নড়িয়ায় শাহজাহানকে তখন হত্যা করা হয়েছে। যাকে পাচ্ছে ধরছে, অত্যাচার করছে। এসব কথা কৌশলে বললাম। এই অফিসারটি আমার সঙ্গে মোটামুটি ভালো ব্যবহারই করলেন। সেখান থেকে আমাকে পাঠানো হলো পিলখানার রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে। শুরু হলো আমার উপর পাশবিক নির্যাতন। সেখানকার লীডার যিনি বরিশালের এক স্কুল মাষ্টারের ছেলে অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করলেন।

'বিকেল হয়ে গেছে তখন। সারাদিন কিছু খাইনি। প্রথমে শক্ত করে হাত-পা বাঁধল। তারপর শুরু করল মার। নির্মম, নিষ্ঠুর সে মার। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল—বাবা কোথায়, অস্ত্র কোথায়। আমি শুধু এক কথাই বললাম, জানিনা। এক দফা মেরে চোখ বেঁধে নিয়ে চলল আমাকে। ধাক্কা দিয়ে একটা দেয়ালের উপর তুলল। ভাবলাম, গুলী করে মারার জন্য হয়তো তুলেছে। চোখের বাঁধন খুলে ফেললাম। শেষবারের মতো দেখতে চাইলাম পৃথিবীটাকে। কিন্তু গুলী করলোনা। লাথি দিয়ে ফেলে দিল দেয়ালের অপর পাড়ে, যেখানে অনবরত প্রহার করা হয় বন্দীদের। আবার শুরু হলো মার। শুধু জাঙ্গিয়া রেখে কাপড়-চোপড় সব খুলে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মারধর করলো। রাত ৯টা পর্যন্ত এভাবে পড়ে রইলাম। ৯টার পর পালাক্রমে কয়েকজন মারতে শুরু করল, লাথি, কিল, ঘুষি লাঠির আঘাত, সবই চলল সমানে। রাত একটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সকাল ৯টা পর্যন্ত পড়ে রইলাম বাথরুমে। প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলেছিলাম, কিন্তু দেয়নি তারা। ৯টার পর আবার রক্ষী লীডার এসে সেপাইদের জিজ্ঞেস করল আমাকে আচ্ছামতো পেটানো হয়েছে কিনা। আমার ফোলা শরীর ও অপ্রকৃতস্থ অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলো সে। এক কাপ চা ও একটা পুরি দিতে নির্দেশ দিল। গরম চা গলায় ঢালার পর বুঝলাম এতে কিছু একটা মেশানো হয়েছে। সমস্ত মুখ গলা ও বুক যেন পুড়ে যাচ্ছিল। ঘা হয়ে গেল মুখে। দ্বিতীয় দিনে পাজামাটা পরতে দিল। শরীর তখন ফুলতে

লাগল। সেদিন এরপরও কয়েক দফা প্রহার করল একই কায়দায়। তৃতীয় দিন সকাল বেলা দেখলাম আঙ্গুলগুলো এমন ফুলেছে যে, ফাঁক করলেও লেগে থাকে। রশি ঢুকে যাচ্ছে মাংসের ভেতর। রক্ষীবাহিনীর একজন সদস্য আমার মা অরুণা সেনের বিবৃতি পড়ে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল। তাকে বললাম, ভাই বাঁধনটা যদি একটু ঢিলে না করেন তাহলে হয়তো চিরকালের জন্য হাত দু'টো নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সে সামান্য ঢিলে করে দিয়ে বলল, "লীডার আসার আগে আবার টাইট করে দেব। আপনি নিশ্চিত থাকেন, লীডার ছাড়া আপনাকে আর কেউ মারবেনা।"

'এরপর লীডার ছাড়া অন্য কেউ আর মারেনি। চতুর্থ দিন সকালে লীডার এলো। দেখলাম একটু মোলায়েম ব্যবহার করছে। পঞ্চম দিনে বাঁধন খুলে ও পাঞ্জাবি পরিয়ে আমাকে অফিসে নিয়ে গেলো। আফটার শেভ লোশন দিয়ে রক্তাক্ত জায়গাগুলো মুছে দিলো। লীডার বললো, 'কেন এত কষ্ট করছেন, যা জানতে চাই বলে দিন। যা চাইবেন তাই দেবো।' উত্তরে বললাম, 'এসব ফালতু কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। আমি কিছু জানি না।'

'সকাল এগারটায় আমাকে পাঠিয়ে দিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চে। ডি এস বি নুর মোহাম্মদ আমার অবস্থা দেখে রক্ষীবাহিনীর লীডারকে তিরষ্কার করে বললেন, "আপনারা এভাবে মারলে কিভাবে চলবে? লোকটা যদি মরে যেতো?" আমি তখন পাশের রুমে, তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। লীডার ডি এস বি-কে বার বার অনুরোধ করছিলো, 'স্যার ও-র কাছে আমার নামটা বলবেন না।' ডি এস বি অবশ্য কায়দা করে তার সামনেই আমাকে তার নাম বলে দিলেন। আমি অবশ্য আগেই জানতাম। এস বি-তে গল্প-গুজবের স্টাইলে কিছু প্রশ্ন করে আমাকে পাঠিয়ে দিল মোহাম্মদপুর থানায়। সেখান থেকে কোর্টে পাঠাল। ব্যাক ডেটে ওকালতনামায় স্বাক্ষর নিল। প্রথমে ব্যাক ডেটে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলাম। পরে এডভোকেটদের কেউ

কেউও বললেন, অস্বীকার করে লাভ নেই, যা তারা চায় তা করবেই। স্বাক্ষর না করলেও কিছু হবে না।

সে দিন ছিলো ২৮ মার্চ। ওকালতনামায় লেখা ছিল সেদিনই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কোর্টে হাজির করেছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলাম সই করতে। তারপর পাঠালো জেলে। মুক্তি পেলাম ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষের দিকে।'

'আমার সঙ্গে যে ৪০ জনের মতো ছেলে রাজনীতি করতো তারা সবাই ছিল ব্রিলিয়ান্ট, ফার্স্ট ক্লাশ পাবার মতো ছেলে। শুধু বেঁচে আছি আমি ও আরেকজন। বাকী সবাই রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী ও মুজিবের অন্যান্য বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে গৌতম দত্তকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকায় এবং হত্যা করা হয় কাটুবুলিতে, তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে সময় হবে পচাত্তরের জুন জুলাই। আমি তখন জেলে। রশিদকে হত্যা করা রামভদ্রপুরে নিয়ে গিয়ে। সেও ঢাকায় ধরা পড়েছিলো। ডামুড্যার আতিক হাওলাদার, ধনুই গ্রামের মোতালেব এদেরকেও তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সামনে হত্যা করেছে। পঁচাত্তরের প্রথম দিকে মোহর আলীকে ধরেছিলো পুলিশে। শিবচর থেকে মুজিব বাহিনীর লোকেরা পুলিশের কাছ থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ডামুড্যার তৎকালীন মুজিব বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে তাকে তার শরীরের চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার লাশ ডামুড্যা বাজারে টানিয়ে রাখা হয় কয়েকদিন। অনেক পরে অবশ্য সেই মুজিব বাহিনী প্রধানও নিহত হয়েছিল কোন এক গোপন পার্টির হাতে। এরপর মাদারীপুর শহর থেকে রোকনকে ধরে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।'

দেখা গেছে যারা ঢাকায় ধরা পড়েছে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে নিজ গ্রামে এনে, বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের সামনে। এর উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করা, যাতে মুজিব সরকারের বিরোধিতার সাহস কেউ না পায়।'

সন্ত্রাস : কালিগঞ্জ

আওয়ামী লীগ আমলের রাজনৈতিক সন্ত্রাস সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ ও মারাত্মক ছিলো যশোরের কালিগঞ্জে। আওয়ামী লীগের পতনের পর এখানে একটি গণকবর আবিষ্কৃত হয় যেখানে প্রচুর কংকাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিলো। এখানে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে বিশেষ করে ই, পি, সি, পি, এম, এল, নামক গোপন সংগঠনের নেতা, কর্মী, সমর্থক ও সহানুভূতি-শীল ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের হিসেবেও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে মুজিববাদীদের হাতে।

কালিগঞ্জের নিহত প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ওয়াজেদ আলীর ছোট ভাই মনিরুল হকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, যিনি ১৯৭৩ সালে রক্ষী-বাহিনীর কাছে আত্মসম্পর্ণ করেছিলেন। এছাড়াও আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বক্তবের সারমর্ম তাদের ভাষায়ই তুলে ধরছি।

আমরা আওয়ামী লীগের চেয়ে শক্তিশালী ছিলাম বলেই নির্মূল করতে চেয়েছে :

—মনিরুল ইসলাম.

'কালিগঞ্জে রক্ষীবাহিনী এসেছে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে। বাম-পন্থী নিধনে রক্ষীবাহিনীর সহযোগী হয়ে কাজ করেছে স্থানীয় মুজিব-বাদীরা। এদের প্রধান কয়েকজনের নাম হচ্ছে রওশন, সামসুল, এমরান ও হামিদ। এক সময় এরা ছাত্র ইউনিয়ন করতো। ছাত্রজীবনে বামপন্থী আন্দো-লনের সঙ্গে জড়িত থাকায় আমাদের অনেক খবরই তারা জানতো। পাকি-স্তান আমলে এদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে নদীসিকস্তির জমি দখল আন্দো-লনেও জড়িত ছিলো। পরে তারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য মুজিববাদী হয়ে পড়ে। তারা একটি নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীও গড়ে তোলে। নল-ডাঙ্গার গোপাল ছিলো রক্ষীবাহিনীর ইনফরমার। গোপাল রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয় কানাই, হাসিম ও হাকিমকে। রক্ষীবাহিনী এদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। যশোহর রোডের সাতমাইল নামক স্থানে তাদের লাশ পাওয়া যায়। হাকিমকে এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করে-ছিলো, জীবন বাঁচাবার জন্য সে বলেছিলো যে তার কাছে অস্ত্র আছে।

আসলে তার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না। যখন সে অস্ত্র দিতে পারলো না, তার মা-বাবার সামনে তাকে গুলী করে হত্যা করলো। তার বাবার নাম ইয়াকুব মন্ডল, বাড়ী কাজিরপুর। তাকে হত্যা করা হয় ১৯৭৩ সালের শেষ ভাগে।'

'১৯৭৩ সালের ১১ ই অক্টোবর রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ওয়াজেদ আলী ও কামরুজ্জামান। হেমন্ত সরকারও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি পালাতে পেরেছিলেন। ধরা পড়ার পর তাদের খোঁজ বা লাশ কিছুই পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ ঢাকায় নিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে।'

'কালিগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে কালাবাজারের কাছে রক্ষীবাহিনীর যে ক্যাম্প ছিলো সেখানে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু ছেলেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছে। বামপন্থীদের হত্যা করার জন্য রক্ষীবাহিনী এখানে চাতুরীর আশ্রয় নিতো। তারা লোক মারফত বামপন্থী ছেলেদের বল খেলার জন্য আহ্বান জানাতো। খেলা শেষে চায়ের নিমন্ত্রণ করতো। এরপর চোখ বেঁধে নিয়ে যেতো বধ্যভূমিতে; হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখতো। আব্দুর রহমান ও ওয়াজেদকে (আরেক জন) এভাবে হত্যা করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর আহ্বানে যারা সারেন্ডার করেছে তাদেরও রেহাই দিলো না। কামাবাইলের গহর মালেক আত্মসমর্পণ করার পরও তাকে রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছে। একইভাবে হত্যা করে ঝিনাইদা'র বেইনেবুর ওয়ালিউর রহমান (মতিয়ার)-কে। কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর এলাকার বংকিয়া গ্রামের মহিউদ্দিন, তার বোন রাশিদা ও দীপুকে পিটাতে পিটাতে হত্যা করেছে। রাশিদা ছিলেন পাঁচ মাসের গর্ভবতী। তার স্বামী আমজাদকেও পরে হত্যা করেছে। চুয়াত্তরের প্রথমদিকে আমজাদকে হত্যা করে রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগ কর্মীরা। এছাড়া এ মুহূর্তে নিহত আর যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হচ্ছে, গহর আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আলী (জসিম), নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।'

অত্যাচারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মনিরুল হক বলেন, 'বাড়ী ঘেরাও করে লোকজনকে ধরে বেদম পেটানো হতো। হাতে কাটা ফোটানো, পায়ে পেরেক ঢোকানো ছিলো অত্যাচারের একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। প্রফেসর আফসার উদ্দিন, শহীদুল ইসলাম-এদের অকথ্য অত্যাচার করে রাস্তার পাশে উপরের

দিকে পা বেঁধে নাকে গরম পানি ঢেলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনকে যারা আশ্রয় দিয়েছে বলে সন্দেহ করা হতো তাদের উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো।'

'কালিগঞ্জে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাসানী ন্যাপের সংগঠন আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ছিলো। তাই এসব সংগঠন ও সংগঠকদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তৎপরতা চলেনি। আমরাই পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। নলডাঙ্গার খালেক ও তার পরিবার পূর্ব থেকেই অত্যাচারী ছিলো। খালেক মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দেশে ফিরে অনেকের উপর অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। আমরা তাদের সাবধান করে দেয়ায় প্রকাশ্যে তারা আমাদের কয়েকজন কর্মীকে হত্যা করে। সে পরে আমাদের কর্মীদের হাতে নিহত হয়।'

রক্ষীবাহিনী ছিল মূর্তিমান সন্ত্রাস ঃ

—আবদুস সালাম

তৎকালীন কমিনিস্ট পার্টি কর্মী এবং বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টি (মেননরনো) নেতা আবদুস সালাম বলেন ঃ রক্ষীবাহিনী ছিলো তখন মূর্তিমান সন্ত্রাস। কালিগঞ্জ, বাগারপাড়া, হরিনাকুন্ড, ঝিনেদা প্রভৃতি এলাকায় তারা হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ কোনোকিছুই বাদ রাখেনি। আমার বলরামপুরের বাড়ী বার বার পুড়িয়ে দেয়ায় নতুন করে আর কোনো ঘরই তুলিনি। পঁচাত্তরের পর নতুন করে বাড়ী করেছি। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা তখন দারুণ বিভীষিকাময় অস্তিত্ব। আমাদের অনেক কর্মী ঘুমের মধ্যেও আতংকে লাফিয়ে উঠতো রক্ষীবাহিনীর নামে। আওয়ামী লীগের পতনের সংবাদ শোনার পর এই এলাকার ভিক্ষুকরা পর্যন্ত, যারা রাজনীতির কিছুই বোঝে না, তাদের ছেঁড়া কাপড় হাতে তুলে আল্লাহ্‌র কাছে শোকরগুজারি করেছে। তেলকুপির এক দিনমজুর শেখ মুজিবের পতনের সংবাদ শোনার সাথে সাথে শয্যা থেকে উল্লাসে উঠে এমন ভাবে লাফাতে শুরু করেছিলো যে, তার পরনের কাপড় খুলে পড়ার পরও হুঁশ হয়নি। উলংগ হয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিলো সে।

রক্ষীবাহিনীর মাইর যে না খাইছে সে মায়ের পেটে :

—সৌখেন মুখার্জী

'রক্ষীবাহিনী আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি'সহ আমার অন্য দুই ভাই ও আমাকে ধরে নিয়ে গেলো কালিগঞ্জ ক্যাম্পে। আমরা নাকি নক্সালদের খাইতে পরতে দেই, এই তাদের অভিযোগ। ক্যাম্পে দেখলাম আরো ২৫ জনের মতো লোক। তাদের দিকে চাওয়া যায় না। মার খেয়ে ঢুলছে তারা। আমাদের প্রথমে নিয়েই হাত-পা বেঁধে বেদম পেটাতে শুরু করলো। অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত চলল পেটানো। দিনটি ছিলো শনিবার। ধরার ২৪ ঘন্টা পর একটা করে রুটি দিলো। পানি চাইলে বললো, মুতে (প্রশ্রাব করে) খা।' আর সেকি গালি। বাপের জনমেও এমন বিশ্রী গালি শুনিনি। কথায় কথায় 'কুত্তার বাচ্চা' 'খানকির পুত'-এসব। পায়খানা করতে হতো সেখানেই। যখন খুশী এসে বেদম পেটায়। রোববার দিন সকালে বললো "এই কুত্তার বাচ্চারা, ঠিক-ঠিক মতো বসে থাকবি। আজকে তোদের বাপ আসবে দেখতে।" কতক্ষণ পর দেখলাম একজন ডেপুটি লীডার আসছে। সে ধনু ও বারি-কে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত পিটনো তারপর সবাইকে একটা করে পিটুনি দিয়ে চলে গেল।'

পরদিন বললো, সবাই শুয়ে পড়। আজ তোদের বড় বাপ আসবে। সন্ধ্যার দিকে সে বড় বাপ এলো। ঢাকা থেকে এসেছেন তিনি। কোনো ডিরেক্টর-ফিরেক্টর হবে। সে অবশ্য ভাল ব্যবহারই করলো, এমনকি 'আপনি' করে সম্বোধন করলো। এ কয়দিন 'শুয়োরের বাচ্চা, 'কুত্তার বাচ্চা' শুনতে শুনতে অতীষ্ট হয়ে গেছিলাম। বড় বাপ জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের ছেড়ে দিলে নক্সাল ধরার কাজে সহযোগিতা করবে?" জানের ভয়ে বললাম হ্যাঁ, করবো। কিসের নক্সাল কিসের কি? কোনো মতে রাজী হয়ে জান নিয়ে বের হয়ে এলাম। এখনো সে মারের প্রতিক্রিয়া টের পাই শরীরে। আসলে যে রক্ষীবাহিনীর মার না খেয়েছে, সে মায়ের পেটেই আছে।'

আমার পবিত্র দাড়ি নিয়েও বিদ্রূপ করেছে :

—আলহাজ্ব দলিল উদ্দিন

রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত ওয়াজেদ আলীর পিতা আলহাজ্ব দলিল উদ্দিন বললেন, 'অন্যদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সে তুলনায় আমার

উপর কিছুই হয়নি। গালাগালি করেছে, বিদ্রূপ করেছে, আমার পবিত্র দাড়ি নিয়েও ব্যঙ্গ করেছে। আমাদের এই পাইকপাড়ার উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে। আমার ছেলেদের বার বার ধরে নিয়ে গেছে, তারা খেতে দেয়নি, আমরা খাবার নিয়ে গেলে বলতো, দরকার নেই, তারাই দেবে। কিন্তু খেতে দেয়নি। বলেন, এই দুঃখ কি সহ্য করা যায় ?

জয়নগরের মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গেলো আমার ছেলেকে। আর ফিরে এলোনা।

মুজিববাদীদের চুয়ান্নটি অস্ত্র ছিলো ঃ

—শাখাওয়াত হোসেন

কালিগঞ্জের পাইকপাড়ার শাখাওয়াত হোসেন বললেন ঃ 'গ্রামে কার্ফু দিয়ে লোকজনদের ধরে পেটাতো রক্ষীবাহিনী। আবদুল আজিজের স্ত্রীকে এতো বেশী মারতে শুরু করে যে, সহ্য করতে না পেরে সে পরনের কাপড় ফেলে উলংগ হয়ে দৌড়াতে শুরু করে। আমার চাচাতো ভাই মান্নান মুসল্লী মানুষ। হাতে কোরান শরীফ নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। রক্ষীরা তাকে এমন জোরে দাবড়ায় যে, কোরান শরীফ ফেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কয়েক মাইল দৌড়ে এক গ্রামে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। রক্ষীরা গ্রামে এসে ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নারকীয় উল্লাস প্রকাশ করতো, যাত্রার ভিলেনদের মতো উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে ঘরের কাঁচের জিনিস ভাঙতো। যাবার সময় গরু বাছুরও নিয়ে যাতো পাক সৈন্যদের মতো। বাহাত্তর সালে আমি স্কুলে পড়ি। স্কুলের পাশেই ছিলো রক্ষী ক্যাম্প, দেখতাম সেখানে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে থাকতো অনেক লোক। কালীগঞ্জ কলেজে মুজিববাদীরা নির্বাচনে জিততে না পেরে প্রতিপক্ষকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে পিটিয়েছে। ৭৩ সালে ছাত্রনেতা ইদ্রিসকে গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে। মুজিববাদীরা ছাত্রদের ডেকে নিয়ে বলত, মুজিববাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে তোমাদেরও ইদ্রিস-শাহজাহানের অবস্থা হবে। গড়াই নদীর ব্রিজের তলায় (এখানে হত্যার পর ফেলে রাখা হতো) যেতে হবে।' তাদের ৫৪টি অস্ত্র ছিল যা প্রকাশ্য বয়ে বেড়াতো।'

কালিগঞ্জে যে আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাস হয়েছে

তিনি এখন জাতীয় পার্টির নেতা। মুজিববাদী সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে গোপন রাজনৈতিক দলের হাতে মারা পড়েছে। কেউ কেউ এখনো পালিয়ে আছে। জানা গেছে, কালিগঞ্জ কলেজে সন্ত্রাস চালাবার কারণে সেই বিভীষিকার জের এখনো বইতে হচ্ছে মুজিববাদী ছাত্রলীগকে। তারা এখনো সে কলেজে তাদের সংগঠন দাঁড় করাতে পারেনি।

আমার বোনের লাশ ভয়ে কেউ দাফন করেনি ঃ
--ফিরোজ আহমেদ

ভেড়ামারার কামালপুরের ফজিলাতুন্নেসাকে হত্যা করেছিলো মুজিববাদীরা। তার হত্যাকান্ড সম্পর্কে তাঁর ভাই ফিরোজ আহমেদ আমাকে বলেন, 'একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বোন আওয়ামী লীগের যেসব ছেলেদের শেল্টার দিয়েছেন, খাইয়েছেন ১৯৭৩ সালের ১১ জুন আমার বোনকে তারাই হত্যা করেলো। তিনি পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন এবং কিছু বামপন্থী নেতা আমাদের আত্মীয় এই 'অপরাধেই' তাঁকে হত্যা করা হয়।'

'১৯৭১ সালের মে মাসে আমার বোনের কামালপুরের বাড়ীতে একটি ঐতিহাসিক গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে সভায় ভারত থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন দেবেন সিকদার। বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন টিপু বিশ্বাস, আবদুল মতিন, আমজাদ হোসেন, আলাউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সে স্বাধীনতা যুদ্ধে পিকিংপন্থীদের করণীয় সম্পর্কে তারা আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন।'

'১৯৭৩ সালের ১১ জুন রাতের বেলায় এসে প্রথমে বাড়ীর সব ঘরে শিকল টানিয়ে দেয়। এরপর ফজিলাতুন্নেছাকে বের করে উঠোনে ফেলে অকথ্যভাবে মারধোর করে। প্রথমে মারধোর করে তারা চলে যায়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় উঠোনে পড়ে ছিলেন। একটু পর যুবলীগাররা আবার ফিরে এসে তার মাথায় গুলী করে। এতে তার খুলি উড়ে যায়। তার লাশ ভয়ে কেউ দাফন করেনি। এই ঘটনার পরই বিশেষ করে কুষ্টিয়ায় মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু হয়।'

বৃহৎ বগুড়ার আক্কেলপুর উপজেলা সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন দিক থেকে। একাত্তর ও একাত্তর পরবর্তী সন্ত্রাস সেখানে একাকার হয়ে গেছে শ্রেণী স্বার্থের সুতোর টানে। আক্কেলপুরে মুজিববাদীদের হাতে নিহত রাবেয়া আক্তার বেলির ছোট ভাই আনোয়ারুল হক বাবলু সন্ত্রাসের সেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করলেন আমার আছে।

মুজিববাদীরা আমার বোনকে জীবিত রাখা নিরাপদ মনে করেনি :

—আনোয়ারুল হক বাবলু

আমাদের অঞ্চলে স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়ে রাজনৈতিক পোলারাইজেশন ছিলো অন্যরকম। এখানে পাকিস্তান আমলে যারা মুসলিম লীগ করতেন তাদেরই ছেলে, ভাতিজা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগ করতেন। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিলো ভাসানী ন্যাপ ও কৃষিক সমিতির, যাদের অনেকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ষাটের দশকের শেষ ভাগে এ অঞ্চলে ছমির মন্ডল, আবদুল মেম্বার, আবুল মাঝি প্রমুখ কৃষক সমিতি নেতা এলাকায় ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলেন। বিশেষ করে ছমির মন্ডল ছিলেন অত্যন্ত ত্যাগী পুরুষ এবং এলাকার গরীব ও মাঝারি কৃষকের কাছে জনপ্রিয় ব্যক্তি। কৃষকদের পক্ষে বহু সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাই এলাকার শোষক, জোৎদার শ্রেণী, যাদের অবস্থান ছিলো মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলে, তারা সমবেতভাবে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে কৃষক সমিতি ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের। শ্রেণী দ্বন্দ্বটাই এখানে প্রধান ছিলো। তাই দেখা গেছে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভাসানী ন্যাপ ও কৃষক সমিতির লোকজন একাধারে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। মুসলিম লীগ জামায়াত হয়ে ওরাই একাত্তরে প্রগতিশীলদের হত্যা করেছে এবং স্বাধীনতার পর এরা বা এদের নিকটাত্মীয়েরাই মুজিববাদী হয়ে 'নক্সাল দমন'-এর নামে প্রগতিশীলদের উপর হত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য সন্ত্রাস চালিয়েছে। দু'পক্ষই বাড়ীঘর জ্বালিয়েছে আমাদের।'

'স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হবার পর ছমির মন্ডল এখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন। পাঞ্জাবীদের অব্যাহত চাপে এক সময় ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একাত্তরের ৭ এপ্রিল ছমির মন্ডল দশজন কর্মী নিয়ে ভারতে রওয়ানা হলো শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। ভাপসার মিরপুরে নামক স্থানে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামের লোকেরা তাদের আটক করে এবং কৌশলে পাঞ্জাবীদের খবর দিয়ে তাদের ধরিয়ে দেয়। পরে পাঞ্জাবী কর্ণেল ছমির মন্ডল, আবুল মাঝি ও আবদুল মেম্বরকে রেখে বাকী সাতজনকে ছেড়ে দেয়। পাঞ্জাবীরা ছমির মন্ডল ও তার দু'সঙ্গীকে হত্যা করে। ছমির মন্ডল এই এলাকায় এখনো কিংবদন্তী হয়ে আছেন।'

'পাঞ্জাবীরা যাদের ছেড়ে দিয়েছিলো তারা হচ্ছেন, রাবেয়া আক্তার বেলি, আজম, কুদ্দুস, ছাত্তার, ফজলু, মোফাজ্জল ও এনায়েত। তারা এলাকায় ফিরে আসার পর স্থানীয় মুসলিম লীগ ও জামায়াতের লোকেরা (যাদের আত্মীয়-স্বজনই আওয়ামী লীগ করছে) আবার তাদের পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানীরা রাবেয়াকে এক বাড়ীতে অন্তরীণ রেখে বাকী ছয়জনকে হত্যা করে। আমার আত্মীয়-স্বজন অনেক ধরাধরি করে করে রাবেয়াকে মুক্ত করেন এবং মে/জুন মাসের দিকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের তিনজনই ছিলেন ছমির মন্ডলের দলের, যদিও স্বাধীনতার পর তারা আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। স্বাধীনতার পর বাহাত্তর সালের জানুয়ারী মাসের ২৪ রাবেয়া ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢোকেন। আক্কেলপুর আসার আগে অবস্থা যাচাইয়ের জন্য তারপরের স্টেশন জাফরপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ভারত থেকে আমি তাকে নিয়ে এসেছিলাম। আমি আক্কেলপুর মেসে গেলাম মকবুল নামক একজনের কাছে। সে আপাকে জাফরপুর পৌছে দেবে এমন কথা হয়। জাফরপুর আমার ফুপুর বাড়ী। মকবুল ফিরে এসে জানালো যে, সে আপাকে যথাস্থানে রেখে এসেছে।

কিন্তু পরদিন জানতে পারলাম আপা পেঁৗছেননি। মা'কে না জানিয়ে আমি খোঁজাখুজি শুরু করলাম। জাফরপুর গেলাম। চিয়ারী গ্রাম থেকে ফেরার মুখে পথচারী লোকজনদের বলতে শুনলাম আক্কেলপুরের রাবেয়াকে

মেরে পলাশবাড়ীর কাছে ফেলে রেখেছে। ফুপুকে সাথে নিয়ে গেলাম। মুখ, চোখ, নাক বিকৃত করে রেখে গেছে খুনীরা। তবুও চিনলাম। রাত ন'টার দিকে সেখানেই ভয়ে ভয়ে তাকে কবর দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। মা আর তার মেয়েকে দেখার সুযোগও পেলেন না। পরে মকবুল আমার এক আত্মীয়ের কাছে বলেছে যে, ট্রেনে রাবেয়াকে নেবার সময় রাস্তায় একদল সশস্ত্র মুজিববাদী তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের এলাকায় তখন মুসলিম লীগ, জামায়াত ও আওয়ামী লীগ মিলে মিশে তারাই ক্ষমতায়।'

'পরে জেনেছি, রাবেয়া আপাকে আনার জন্য আমি যখন ভারতে যাই তখন থেকেই আমাকে অনুসরণ করা হয়েছিলো। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন। এতো কিছু বুঝিনি। আসলে আপাকে হত্যা করা হয়েছে, এখানে যাতে মেহনতী মানুষের প্রগতিশীল কোনো সংগঠন আর গড়ে না উঠে। ছমির মন্ডল ও তার কর্মীরা নিহত হবার পর রাবেয়া আপাই ছিলেন তখন নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতম কর্মী। তার সে মেধাও ছিলো। পাকিস্তান আমলে তিনি কয়েকটি লেটারসহ ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলেন। তখন তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মাহবুব-উল্লাহ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পার্টির বগুড়ার সাংগঠনিক সম্পাদিকা। এ অঞ্চলে ছমির মন্ডলের নেতৃত্বে শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো তাতে আওয়ামী লীগ-মুসলিম লীগ-সহ সব প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া সংগঠনের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। সেই ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করার জন্যই রাবেয়া আক্তার বেবিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।'

'স্বাধীনতার পর এ অঞ্চলে মুজিববাদীরা চুরি-ডাকাতি করেছে, অত্যাচার করেছে অনেক। আবদুর রউফ ছিলেন একজন শিক্ষক, তার বাড়ীতে ডাকাতি করার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে।'

আনোয়ারুল হক বাবলু তার বোনের হত্যাকারীদের নাম নির্দিষ্ট করে বলতে এখনো ভয় পান।

আক্কেলপুরের ফজলুর রহমান তখন জাসদ করতেন। তার মতে, মুজিব আমলে মুজিববাদীদের হাতে আক্কেলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় শতাধিক জাসদ

কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ 'মুজিববাদীদের সহায়তায় রক্ষী-বাহিনী আমাকে প্রথম গ্রেফতার করে চুয়াত্তর সালের প্রথম দিকে। এর আগে আমাকে ধরতে না পেরে আমার দু'ভাইকে ধরে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার করেছে, আমার শ্যালককে মারধোর করেছে। পরে ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনা হয়। নাকে গরম পানি ঢালা ও বুট দিয়ে লাথি মারা থেকে শুরু করে কোনো অত্যাচারই তারা বাদ রাখেনি। অনেকে বাড়ীঘরই পুড়িয়ে দিয়েছে। 'শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ছাড়া পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।'

সন্ত্রাস ঃ দশমিনা

পটুয়াখালীর দশমিনা অঞ্চলে মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে জানার জন্য আমি কথা বলছি বামপন্হী নেতা ও বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি আবদুস সাত্তার খানের সঙ্গে। মুজিব-বাদীরা তাকে হত্যার জন্য বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করেছিলো।

আমাকে হত্যা করাই ওদের লক্ষ্য ছিল ঃ
—আবদুস সাত্তার খান

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাদের সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, যাদের শেল্টার দিয়েছি তারাই পরে আমাদের নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। একাত্তরের ১০ই জুন আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও আমাদের সংগঠনের সবাই মিলে সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। আমি তখন প্রকাশ্যে ভাসানী ন্যাপের কৃষক ফ্রন্টে কাজ করি। পটুয়াখালী অঞ্চলকে চারটি জোনে ভাগ করে আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি নেতৃত্ব দিয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের। যুদ্ধের সময়ই আমার ভুল হয়েছিলো একটা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সঠিক মুক্তি আসবেনা এটা আমি প্রকাশ্যেই বলতাম। আমাদের অঞ্চল থেকে তেমন কেউ ভারতে যায়নি, কিন্তু যারা ঢাকা বা অন্যান্য স্থানে ছিলো তারা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করেছে। আওয়ামী লীগাররা অবশ্য মোজাফফর ন্যাপ ও আমাদের এক চোখেই দেখতো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দেখলাম তারা আমাদের সন্দেহ করছে এবং অস্ত্রগুলোও হস্তগতের চেষ্টা করছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে

যুদ্ধ শেষ হলো। গ্রামে গ্রামে আমাদের লোকজন ছিলো। প্রথমাবস্থায় আওয়ামী লীগারদের যে সব শেল্টারে রেখেছি। পরে তারা বেছে বেছে সে সব বাড়ীগুলোতেই হানা দিয়েছে আমাদের নির্মূল করার জন্য।'

'আমাকে তারা গ্রেফতার করে ১৯৭২ সালের অক্টোবর। ধরা হয় গলাচিপা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারীর ইঙ্গিতে। ধরার পর থানায় নিয়ে গেলো চেয়ারে বসা ছিলাম, এমন সময় পেছন দিক থেকে একজন আমার চোখ চেপে ধরলো। আরেকজন জোর করে বিষাক্ত ইনজেকশন দিলো। আমি বেঁহুশ হয়ে পড়লাম বেঁহুশ অবস্থাই জেলে পাঠালো আমাকে। জ্ঞান হবার পর দেখলাম আমি কথা বলতে পারছিনা, ডানপাশ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখালেখি হলো এ নিয়ে। পটুয়াখালীর জেল ডাক্তার খুব পরিশ্রম করে চিকিৎসা করায় প্রাণটা বেঁচে গেছে। আসলে আমাকে হত্যা করার জন্যই সে ইনজেকশন দিয়েছিলো।

অবশ অবস্থায়ও প্রাণে বেঁচে গেছি পত্রিকায় লেখালেখি হওয়ার কারণে। জেলে ১৫ দিনের মতো থাকার পর আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে ভর্তি করা হয় মিটফোর্ডে। অবস্থা তখনও অপরিবর্তিত। দৈনিক সংবাদের সাংবাদিকরা সেই অবস্থায়ই একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সেটি প্রচার করেন। তারা যা জিজ্ঞেস করেছেন আমি বা হাত দিয়ে কোনো রকমে তার জবাব লিখে দিয়েছি। মিটফোর্ডের চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছিলে না বলে আমাকে পি, জি-তে পাঠানো হলো। পিজিতে আমার মেরুদণ্ড থেকে পানি বের করা হলো। ৪/৫ মাস চিকিৎসার পর আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করলাম। সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম ১৪ মাস পর। তখনকার মতো ছাড়া পেলাম। চুয়াত্তর সালে আমাকে আবার গ্রেফতার করা হয়, ছাড়া পাই মোশতাকের আমলে। মুজিববাদীরা আমার ঘরের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে গেছে। আমাদের অসংখ্য কর্মীকে অত্যাচার করেছে। পরে জেনেছি থানার ওসি বলেছেন যে, তিনি তখন থানায় ছিলেন না বলেই মুজিববাদীরা আমাকে থানায় এনে বিষাক্ত ইনজেকশন দিতে পেরেছে। তিনি থাকলে তা হতে দিতেন না।

'১৯৭৪ সালে মুজিববাদীরা রাজাপুরের মস্কোপন্থীর ন্যাপ কর্মী আবুল হোসেনকে হত্যা করেছে। আবুল হোসেন ছিলেন সৎ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী।'

'স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের আমল ছিল একটি দুঃসময়ী যারা

এম পি আনোয়ারা বেগমের ভাইসহ ১৪ জন জাসদ কর্মীকে। সামসু ছিলেন জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, এ কারণেই আওয়ামী লীগারদের হাতে তার প্রাণ যায়। জাসদের বাদলকে হত্যা করা হয় '৭৪ সালে। মুজিববাদীদের ইঙ্গিতে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে মান্দারখোলার আনোয়ারাকে। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের উপরই নেমে এসেছে চরম নির্যাতন ও হয়রানী।'

সন্ত্রাস ঃ গাইবান্ধা

গাইবান্ধায়ও রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীদের প্রধান টার্গেট ছিলো জাসদ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা কর্মীরা। গাইবান্ধায় এই সন্ত্রাসের কারণে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন দেলোয়ার হোসেন প্রধান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তার বক্তব্য সংগ্রহ করেছি।

একটি রাষ্ট্রই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আমাদের উপর ঃ

—দেলোয়ার হোসেন প্রধান

'গাইবান্ধায় রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীদের চরম নির্যাতন নেমে আসে শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন প্রবর্তনের পূর্ব মুহূর্তে। এর আগে অবশ্য '৭৩-এর প্রথম দিকে গাইবান্ধার জাসদ সভাপতি সুজাকে (বীরবিক্রম) মুজিববাদীরা হত্যা করেছিলো। তার অপরাধ ছিলো জাসদ করা। কালীবাড়ী নামক স্থানে দিনের বেলায় তাকে গুলী করে হত্যা করে। সুজা সাহেবের সঙ্গী ফিরোজ ঘটনাচক্রে বেঁচে গেছেন। তার খুনীরা পরে পালিয়ে ভারতে চলে যায় এবং জিয়ার আমলে ফিরে আসে।'

'সুজা সাহেবকে হত্যার পর জাসদ ও জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ এই এলাকায় আরো জোরদার হয়। ১৯৭৩ সালের কলেজ নির্বাচনে আমাদের প্যানেল পুরোটাই পাশ করে। আমি পাঠাগার সম্পাদক নির্বাচিত হই। মুজিববাহিনীর অধিকাংশ ছেলে আমাদের পক্ষে ছিলো। মূলতঃ বিরোধ বাঁধলো মুজিববাহিনী ও মুজিববাদীদের মধ্যে। আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন রওশন আরা বকুল। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, "আমার এলাকায় জাসদ বলে কোনো শব্দ থাকবে না।" আমারা গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনীতি করার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। চুয়াত্তরের ডিসেম্বর মাসে

মুজিববাদের বিরোধিতা করেছে তাদেরই তারা হত্যা করেছে। পটুয়াখালীতে ৫০ জনের মতো প্রগতিশীল কর্মীকে ডাকাত বা নক্সাল আখ্যা দিয়ে তারা হত্যা করেছে।'

সন্ত্রাস : চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার মতিয়ুর রহমান বাবু ছিলেন একজন জনপ্রিয় ও ত্যাগী বামপন্থী কর্মী। পরিবহন ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তাকে হত্যার পর রক্ষীবাহিনী তার পনেরো বছরের আরেক ছোট ভাইকেও হত্যা করেছিলো। সে অঞ্চলের ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য আমি মতিউর রহমান বাবুর বড় ভাই খলিলুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছি।

আমার ভাইকে হত্যার পর সাতদিন চুয়াডাঙ্গায় কার্ফু ছিলো :

—খলিলুর রহমান

আমার ছোট ভাই মতিউর রহমান বাবুকে রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায় ১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর। পরে আর তার খোঁজ পাইনি, লাশও পাইনি।' মতিউর রহমান বাবু ছিলেন উত্তর বাংলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী। আরও বহু গণসংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রথম জীবনে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন তিনি। ষাটের দশকের মধ্যভাগে টঙ্গীতে থাকার সময় কাজী জাফরের সংস্পর্শে এসে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। ভাসানীরও প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। একাত্তরে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এলাকায় আওয়ামী লীগারদের অত্যাচার, চোরাচালান ও লুটপাটের প্রতিবাদে মতিউর রহমান বাবু '৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন। সেই থেকে দোতালাবাহিনী (মুজিববাদীদের তাই বলা হতো) তার উপর আরও ক্ষেপে গেলো। অনেক চোরাচালানীরও অসুবিধা হচ্ছিলো তার জন্য। এলাকায় তার জনপ্রিয়তাও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

'১৯৭৩ সালের ১৬ই অক্টোবর বাবু চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়া বাস স্টাণ্ডে বসেছিলেন। এমন সময় একদল রক্ষীবাহিনী তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে

যায়। গাড়ীতে তোলার সময় তার মাথায় প্রচন্ড জোরে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে এবং গাড়ীর মেঝে ফেলে দিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়। তাকে ধরার পর সাতদিন চুয়াডাঙ্গায় কার্ফ্যু দিয়ে রাখে। একই সময় রক্ষীবাহিনী সে এলাকা থেকে ৭৪ জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো যার মধ্যে জনাসাতেক ফিরে আসে। বাকীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। জগতীর কাছে একটি কানেলে রক্ষীবাহিনী লোকজনকে মেরে ফেলে রাখতো। আমার আরেক ছোট ভাই মতির লাশ মনে করে একটি বিকৃত লাশ কবর দিয়েছে।"

রক্ষীবাহিনী সমস্ত বিরুদ্ধমতের ছেলেদের ধরেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও মুজিববাদীদের পরামর্শ অনুযায়ী।'

'মুজিববাদীরা আলমডাঙ্গা থেকে চারজন মুজিববাদ বিরোধী ছেলেকে ধরে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডের তিনদন্তের ব্রিজের নিচে (আমজুনের কাছে) জবাই করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একজনের গলা পুরোটা কাটেনি। মুজিববাদীরা চলে যাবার পর সে গলা ধরে ধরে হেটে কালাতির বাজারে আসে এবং একজন ডাক্তারের কাছে যায়। চুয়াডাঙ্গায় বসে খবর শুনতে পেয়ে সেই মুজিববাদীরা মোটর সাইকেলে করে সেখানে যায় এবং বেঁচে যাওয়া লোকটিকে মোটর সাইকেলের পেছনে বেঁধে হেচড়িয়ে আবার সেই ব্রিজের কাছে নিয়ে যায়। রাস্তায়ই অবশ্য সে লোক মৃত্যুবরণ করে।'

সন্ত্রাস : ঘোড়াশাল-কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জে বেশী নির্যাতন হয়েছে জাসদ কর্মীদের উপর। সে অঞ্চলের সন্ত্রাস সম্পর্কে আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছি যার নাম প্রকাশে অসুবিধা রয়েছে। তিনি বললেন: স্বাধীনতার পর কালিগঞ্জের নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগাররা দুর্নীতি ও অত্যাচার শুরু করার পর মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ সময় জাসদের জন্ম হলে তরুণদের ৭৫ শতাংশই জাসদে ও রব সমর্থিত ছাত্রলীগে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসে মুজিববাদীদের নির্যাতন। জাসদের আক্রাম ও জয়নালকে মুজিববাদীরা টুঙ্গীতে এনে হত্যা করার পর অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি এ ঘটনার পর ময়েজ উদ্দিন সাহেব মুজিব আমলে আর কালিগঞ্জ টাউনে যেতে পারেননি। বাহাত্তরের শেষের দিকে হত্যা করা হয় প্রাক্তন মহিলা

জাসদের প্রফেসর মান্নান ও সাংবাদিক গোবিন্দলাল দাসকে গ্রেফতারের পর আমরা সব পালিয়ে যাই। রক্ষীবাহিনী ও মনোহরপুরের হামিদকে ধরে হত্যা করলো, এরপর হত্যা করলো জাব্বার ও দুলালকে। সময়টা হবে '৭৫-এর জানুয়ারী। বাধ্য হয়ে আমরাও প্রতিরোধ গড়ে তুললাম গণ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে। সুন্দরগঞ্জের জাহাঙ্গীরও রক্ষীবাহিনীর হাতে প্রাণ দেয়।'

'আমি জাসদ করি বলে আমার আব্বা রইসুদ্দিন প্রধান ও বড় ভাই আহসান উদ্দিনকে এমন নির্মমভাবে অত্যাচার করে যে, যে অত্যাচারের জের হিসেবেই তারা মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাই অত্যাচারের তিনমাস ও আব্বা তার পরে মারা যান। তাদের গাছে লটকিয়ে পিটিয়েছে। আমাদের মনোহরপুরের বাড়ী পুড়িয়েছে তিনবার। আগুন দেবার আগে দমকলবাহিনী আনা হতো এবং আমাদের ঘরের আগুন যাতে অন্য বাড়ীতে সম্প্রসারিত না হতে পারে দমকল বাহিনী দাঁড়িয়ে থেকে সেটা নিশ্চিত করতো। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষোভ ছিলো এমনি তীব্র। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো যেন।'

আমাদের এ্যাকশনে ৩/৪ জন মুজিববাদী মারা পড়েছে যারা চোর বা ডাকাত ছিলো।'

সন্ত্রাস : সিরাজগঞ্জ

যে সব অঞ্চলে সন্ত্রাস-নির্যাতন সবচেয়ে বেশী হয়েছে, সিরাজগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সে সবের অন্যতম। এসব অঞ্চলের কিছু অংশে সন্ত্রাসের স্বরূপ জানার জন্য আমি কবি ও ছাত্রনেতা মোহন রায়হানের সঙ্গে কথা বলেছি যিনি তখন সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্র।

যমুনায় লাশ ভাসেনি, এমন কোনো দিন যায়নি :

—মোহন রায়হান

'সিরাজগঞ্জে জাসদের উপর নির্যাতন নেমে আসে '৭২ সালের শেষের দিকে, সিরাজগঞ্জ কলেজে নির্বাচনের সময়। ছাত্রলীগ ভাগ হবার পর ক্ষমতাসীনদের কিছু উচ্ছিষ্ট লোভী ছাড়া মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রায় তরুণশূন্য হয়ে পড়ে। জাসদ প্রতিষ্ঠার পর অভূতপূর্ব

চাঞ্চল্য জাগে সারাদেশে। শাসকগোষ্ঠী জনবিচ্ছিন্নতার কারণেই তখন স্বৈরাচারী ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়।'

আমরা যেখানে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়েছি, সেখানে মুজিববাদীদের শ্লোগান ছিলো "দাগো, দাগো, কামান দাগো।" তাদের ভাষ্য ছিলো "বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে বা কিছু বললে টুপি ছিড়ে ফেলবো।' তারা প্রকাশ্যে স্টেনগান, এস এল আর কাঁধে নিয়ে কলেজে আসতো। টেবিলের উপর রেখে ক্লাশ করতো। আমাদেরকে মিছিল-মিটিং কিছুই করতে দিতো না। এতো কিছুর পরও কলেজ নির্বাচনে জিতে গেলাম। এতে আরো ক্ষিপ্ত হলো তারা।

'জাসদ ও মুজিববাদ বিরোধী কমিউনিস্টদের হত্যা ও নির্যাতন করার জন্য মুজিববাদীরা সিরাজগঞ্জে একুশটি ক্যাম্প করেছিলো। এমন দিন যায়নি, যেদিন যমুনায় দু'চারজনের লাশ না ভেসেছে।

'কলেজ নির্বাচনের আগের রাতে মুজিববাদীরা ভয় দেখানোর জন্য কলেজের হোস্টেলের ছাদে এক নাগাড়ে এল এম জি ব্রাস করে ছাদ উড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছিলো তারা। আমি পালিয়ে পাবনায় চলে যাই। '৭২-এর ডিসেম্বরে আ স ম আবদুর রব ও মেজর জলিল সিরাজগঞ্জে আসবেন সভা করতে। আমরা প্যান্ডেল তৈরি করছিলাম। একদল মুজিববাদী এসে আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে প্যান্ডেল পুড়িয়ে দিলো। রক্ষীবাহিনী আগের রাতে স্থানীয় সব জাসদ নেতার বাড়ীতে হানা দিল। পালিয়ে গেলাম আমরা সবাই। সিরাজগঞ্জে আর সভা করা সম্ভব হলো না। রব-জলিল উল্লাপাড়া পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। আমরা সেখানে গিয়েই তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। মেজর জলিলের- সঙ্গে তখনই আমার প্রথম দেখা। হ্যান্ডশেক করার সময় হাতে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কি, বাহুতে বল আছেতো ? লড়াই করতে পারবে ?" শেষে সভা না করেই তারা চলে গেলেন।

'সিরাজগঞ্জ শহরেই মুজিববাদীদের নির্যাতনক্যাম্প ছিলো চারটি। এ গুলো ছিলো কওমী জুটমিল কালিবাড়ীতে, কলেজের একটি হোস্টেলে, হোসেনপুর পাটের গুদামে এবং এক বিহারীর বাসায়, যেটি এখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। লোক হত্যার জন্য মুজিবাদীদের বাধা জল্লাদ ছিলো সমর ও

শংকর। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর তারা ভারতে পালিয়ে যায়। অবশ্য সব-কিছুই হয়েছে তখনকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে। অনেকে হত্যাকান্ডে নেতৃত্বও দিয়েছেন।'

মুজিববাদীরা প্রথম ধাক্কায় হত্যা করে শ্রমিকনেতা মোকাদ্দেস, তোয়াহা গ্রুপের মনিরুজ্জামান তারা এবং জাসদের নজরুল ও বদরুলকে। কওমী জুটমিলের ক্যাম্পে জবাই করে হত্যা করা হতো। মোকাদ্দেস ছিলেন নাম-করা মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭৩ সালের মার্চে তাকে রায়পুরের কাছে প্রকাশ্য দিনের আলোয় হত্যা করা হয়। তিনি জাসদ সমর্থিত শ্রমিক লীগ করতেন। খুনীদের কিছুই হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা সেলিম ও সালামকে পাবনায় নিয়ে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। শাহজাদপুরে হেলাল, কুরবান, ছগির দীলিপ প্রভৃতিকে হত্যা করা হয় গুলী করে। ছলিম উদ্দিন ও মতিনকে একইভাবে হত্যা করা হয়েছে। কারো কারো মাথা ইট দিয়ে ছেঁচে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কাজিরপুরে আমার এক বন্ধুকে মুজিববাদীরা হত্যা করেছে এই অপরাধে যে সে ছিলো আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে চলাফেরা করতো। মমিন ও হাসিমকে মেরেছে বেয়োনেট চার্জ করে। উল্লাপাড়ার মুক্তিযোদ্ধা গিয়াসের লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

সিরাজগঞ্জে ১৯৭৩ সালেই শ'পাঁচেক বামপন্থী ও জাসদ কর্মী মুজিব-বাদীদের হাতে নিহত হয়েছিলো বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিলো। পুরো মুজিব আমলে এখানে নিহতদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। শাহজাদপুর, কাজিরপুর, বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মানুষ এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নময় সময় অতিবাহিত করেছেন তখন। এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার আপন ভাই নিজে একটি ক্যাম্প চালাতে, সেখানে মানুষ হত্যা ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে স্ফূর্তি করতো। কোনো সুন্দরী মেয়ে তাদের চোখে পড়লে তার বাপকে নির্দেশ দেয়া হতো মেয়েকে রাতে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে। নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যু ছিলো অবধারিত। তাই সেসময় বিশেষ করে শাহজাদপুর এলাকায় যুবক ও যুবতীরা পালিয়ে গিয়েছিলো অন্য এলাকায়। কারণ, যুবকরা ছিলো তাদের বন্ধুকের খোরাক এবং যুবতীরা লালসার।
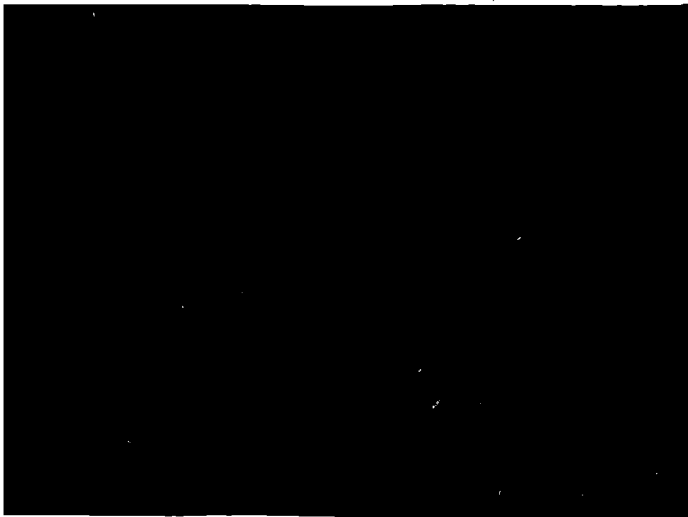
রক্ষীবাহিনী ও পথচারী—সেই পাকিস্তানী কায়দা

—গণকণ্ঠ

রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে একজন বিরোধী দলীয় কর্মীকে —তারকালোক ডাইজেস্ট

সিরাজগঞ্জ ঘাটে ছিলো একটি ভাঙ্গা ফেরি। যে ফেরিতে নিয়ে বেয়োনেট চার্জ করে বহু প্রগতিশীল ছেলেকে হত্যা করেছে।

কওমী জুটমিলে অবস্থিত মুজিববাদীদের ক্যাম্পটি ছিলো ডাকাতের গুহার মতো। সেখানে এল এম জি, এস এল আর, রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতি তাকে তাকে সাজানো থাকতো। নির্যাতনের জন্য একটি কপিকলও লাগানো ছিলো। মদ-মেয়ে-জুয়া সব চলতো ক্যাম্পে। হত্যাও ছিলো তাদের একটা নেশা। প্রশাসন বলে কোনো কিছু ছিলো না। মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনী হাতে হাত মিলিয়ে অত্যাচার করেছে। বিকেল বেলা মুজিববাদীরা ক্যাম্প থেকে বের হতো পরিপাটি হয়ে। সারা গায়ে পারফিউমের গন্ধ, কাঁধে স্টেনগান। কলেজেও আসতো একইভাবে। পার্কে-সিনেমায় আড্ডা দিতো অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়েই। তাদের একটাই কথা ছিলো, শেখ মুজিবের বা তার মুজিব-বাদের বিরোধীতা করা যাবে না, কোনো বিরোধী দল করা যাবে না। আমাদের গণতান্ত্রিক ভাষাকে তারা জবাব দিয়েছে অস্ত্রের ভাষায়। তাদের ব্যক্তিগত শত্রুকেও জাসদ-নক্সাল নাম দিয়ে নির্মূল করেছে।

'১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কলেজের এক অনুষ্ঠানে আমি একটি কবিতা পড়ছিলাম যাতে মুজিববাদের সমালোচনা ছিলো। কবিতার মাঝ-খানেই মুজিববাদী কালা রশিদ পিস্তল নিয়ে তেড়ে এলো আমাকে গুলী করতে। স্যার ও ছাত্ররা তখন আমাকে ঘিরে রাখলেন এবং ঘেরাও করেই কলেজের পেছন দিয়ে বের করে দিলেন। পালিয়ে গেলাম এলাকা ছেড়ে।'

'সে আমলে জাসদ ও তার অংগ-সংগঠনগুলো ছিলো মুজিববাদী ও রক্ষী-বাহিনীর প্রতক্ষ্য আক্রমণের বস্তু। কারণ, আমরা ছিলাম প্রকাশ্য। পরে অবশ্য গণ-বাহিনী করে প্রতিরোধ করতে হয়েছে।

সন্ত্রাস ঈশ্বরগঞ্জ: কাজী শামিমের জরিপ

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় মুজিববাদী ও রক্ষীবাহিনীর হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে একটি জরিপ রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন কাজী শামিম। ১৯৮০ সালের শেষ ভাগে সে এলাকায় প্রায় একমাস থেকে তিনি এই রিপোর্টটি তৈরি করেন। এটি করানো হয়েছিলো একটি

সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষ থেকে। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক বিবেচনায় সেটি সে পত্রিকায় ছাপা সম্ভব হয়নি। পরে এটি ১৯৮৪ সালের জানু-য়ারী মাসে সাপ্তাহিক সংহতি পত্রিকায় ছাপা হয়। এই রিপোর্টটি আমি তুলে ধরছি।

"নির্যাতনের একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার জন্য ময়মনসিংহের একটি থানায় নমুনা জরিপ চালানো হয়েছিলো। সমগ্র বাংলাদেশের মতো ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার নির্যাতনের কাহিনীও এক। তবে এই থানার নিহতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। থানায় এমন কেউ নেই, যিনি তার বাবা, ভাই বা আত্মীয় হারায়নি। একটি সাধারণ হিসেবে এখানে মোট ৯৫০ জন রাজনৈতিক কারণে প্রাণ হারিয়েছেন।

ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ জেলার মধ্যখানে অবস্থিত। বাস এবং ট্রেন উভয় রুটেই যাতায়াত চলে। থানার আয়তন ১০৯,১৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সোয়া দুই লক্ষ।

আওয়ামী লীগ আমলে থানা সদরে একটি মাত্র কলেজ ছিলো। উল্লেখ্য এই কলেজের শতকরা ৩৩ জন শিক্ষার্থী আওয়ামী লীগ আমলে নিহত হয়। এই আমলে এই থানায় বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া ১টি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিলো। অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে এধরনের নির্বিচার গণহত্যা বন্ধের আহবান জানান। তাদের অভিযোগ, এ সময় ছেলেরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলো। অভিভাবকেরা জানান, ভয়ে তাদের ছেলেদের বইপত্র মাটির নীচে গর্ত করে লুকিয়ে রেখে ছাত্র পরিচয় গোপন করা হতো।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঈশ্বরগঞ্জের নামকরণের কিংবদন্তী উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই কিংবদন্তীটি এখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। শোনা যায়, ঈশ্বরগঞ্জের প্রাক্তন নাম দত্তপাড়া। এই দত্তপাড়ায় বৃটিশ নীলকর-দের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বর পাটনী নামে এক সাহসী ব্যক্তি দু'জন নীলকর সাহেবকে গুলী করে হত্যা করে। পরবর্তীতে এই ঈশ্বর পাটনীর নাম অনুসারে দত্তপাড়ার নাম ঈশ্বরগঞ্জে পরিণত হয়।

জরিপ কাজে প্রতিবেদক স্থানীয় বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার চেষ্টা করেন। কেউ কথা বলেছেন, কেউ বলেননি। যারা কথা বলেছেন তাদের মতে, ঈশ্বরগঞ্জে প্রতিটি খুনের সাথে তৎকালীন ঈশ্বরগঞ্জ থানার রিলিফ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ সম্পাদক (জনৈক হাশেমুদ্দীন) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি আই-আর-ডি-পি'র সাড়ে চার লাখ টাকার সার কেলেংকারির নায়ক হিসেবে জেলে ছিলেন। জেল থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করলে এই প্রতিবেদক তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎকার না দিয়ে বরং নানা ধরনের হুমকির মাধ্যমে তার জরিপ কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। শত শত নিরপরাধ লোক হত্যার জন্য দায়ী এই ব্যক্তি ক্ষমতাচ্যুত হবার ৬ বছর পরেও ছিলেন ঈশ্বরগঞ্জের মূর্তিমান সন্ত্রাস।

'৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশনের কাছে ঈশ্বরগঞ্জবাসীরা শত শত আবেদন-পত্র এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাখিল করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং পরবর্তীকালে আই আর ডি পি'র সমবায় সমিতির সভাপতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে তিনি পরবর্তী সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতার ভাগ নিয়েছেন। ঈশ্বরগঞ্জের অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার বলে দেয়া যায়, ঈশ্বর পাটনী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তিনি এখন কিংবদন্তী।'

বিরোধী দলের অবস্থান

আওয়ামী লীগ আমলে ঈশ্বরগঞ্জে কোনো শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থান ছিলো না। অধুনালুপ্ত পি-ডি-পি'র নেতা মরহুম নূরুল আমিনের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী থানা হিসেবে ও তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই থানার কিছু অংশ আওয়ামী লীগ বিরোধী ছিলো। ৭১-এর পর আওয়ামী লীগের সদস্যরা রিলিফের মাল নিয়ে কারচুপি ও ঢালাও নির্যাতন আরম্ভ করলে সেখানে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

'৭৪-এর দিকে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি উক্ত এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সন্ত্রাসধর্মী কার্যকলাপ চালায়। আওয়ামী লীগের দুজন কর্মী-সহ ডাকাত বলে কথিত কয়েকজন লোককে এরা হত্যা করে। এরা এই থানার উচাকিলা পুলিশ ফাঁড়ি লুট করে এবং আঠারোবাড়ীস্থ অগ্রণী ব্যাংকের শাখা প্রকাশ্যে লুট করে। এর ফলে আওয়ামী লীগ তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে অজুহাত খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলো এবং তাতে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের পথও সুগম হয়ে যায়। মূলতঃ তাই ঈশ্বরগঞ্জের হত্যাকান্ডের বেশীর ভাগ হয়েছিলো রাজনীতি বিবর্জিত ব্যক্তিগত ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণে।

সর্বহারা পার্টি ছাড়া ঈশ্বরগঞ্জ থানায় মোজাফফর ন্যাপ এবং জাসদের থানা কমিটি ছিলো। তবে এইসব কমিটি ছিলো নিষ্ক্রিয়। তথাপি এইসব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এখানে নির্যাতিত হয়েছেন।

দুর্যোগের শুরু

তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলে আওয়ামী লীগ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। '৭৩-এর প্রথমদিকে এই থানার থানা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের উপস্থিতিতে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর বাসায় এদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ঈশ্বরগঞ্জের সার্বিক অবস্থা ও বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করে কিছু মারাত্মক অস্ত্র কর্মীদের কাছে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ময়মনসিংহের এক উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার অফিসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তৎকালীন ঈশ্বরগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক উক্ত হাশেমুদ্দীনকে ঈশ্বরগঞ্জস্থ রক্ষীবাহিনীর হাই কমান্ড নির্বাচন করে। একজন দুর্নীতিবাজ সিভিলিয়ানের হাতে শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনীর একটা ইউনিটের সার্বিক দায়িত্ব বর্তাবার পর ঈশ্বরগঞ্জে প্রকৃত দুর্যোগের শুরু হয়।

এই সময় ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ ভুলেও রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতো না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একজন অসহিষ্ণু স্কুল শিক্ষক তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধানের সমালোচনা করলে তাকে জুতার মালা পরিয়ে সারা ঈশ্বরগঞ্জে ঘুরানো হয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বোকাইনগরের চেয়ারম্যান বৃদ্ধ রংগু মিয়ার কপালে। ভারী জুতোর মালা পরিয়ে তাকে দিয়ে ঈশ্বরগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ করানো হয়। আওয়ামী লীগ তার নির্যাতনের ভিত্তি-ভূমি শক্তিশাল করার জন্যে এই থানার প্রতিটি ইউনিয়নে গুন্ডা-বদমাইশদের সংগঠিত করে ডিফেন্স কমিটি নামে একটি খুনী বাহিনী গঠন করে। এরা ছিলো এই এলাকার জন্য সত্যিকারের সন্ত্রাস। এই ডিফেন্স পার্টি ছিলো খুনের ব্যাপারে উন্মাদ। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু কেউ এদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই ডিফেন্স পার্টির ওপর ঢালাও খুনের নির্দেশ ছিলো।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কোনো ধরনের রাখঢাক পছন্দ করতেন না। বিরুদ্ধবাদীদের প্রকাশ্যে জবাই করার জন্যে তারা ডিফেন্স কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত এক সভায় থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক প্রকাশ্যে খুনের আদেশ দিলে ধর্মভীরু কয়েক জন লোক পাপের অজুহাত তোলেন। কিন্তু উক্ত সম্পাদক হাজার হাজার লোকের সামনে দাম্ভিকভাবে উত্তরে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী-দের খুনের যাবতীয় পাপ আমি একাই বহন করবো।

ডিফেন্স কমিটির সদস্যরা এই ধরনের ঢালাও নির্দেশ পেয়ে বাপ-দাদা-পরিবারের ঝগড়ার সূত্র ধরে খুনের পর খুন চালিয়ে গাঁ উজার করে দেয়। এখানে আবারও উল্লেখ করা যায় যে, ঈশ্বরগঞ্জের বেশীর ভাগ খুন সংগঠিত হয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও ঈর্ষা থেকে।

সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাস

বৃদ্ধ বাপ খুব ভোরে উঠে চোখ কচলে তার উঠানে দেখলেন, কয়েক-দিন আগে রক্ষীবাহিনী কর্তৃক ধৃত ছেলের বিকৃত লাশ। অথবা একটা গায়ের মানুষ হতবাক হয়ে দেখলো, তাদের চৌরাস্তার মোড়ে পাঁচটা বিভৎস অপরিচিত লাশ পড়ে আছে। অথবা তারা দেখলো স্কুলের সামনে জাম

গাছে পা বাঁধা অবস্থায় উল্টাভাবে ঝুলছে এক তরুণের লাশ। তৎকালে এটা ঈশ্বরগঞ্জ থানার জনবহুল এলাকাগুলোর একটা প্রাত্যহিক দৃশ্য। জনমনে নিছক সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ধরনের কার্যকলাপ করা হতো।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সুটিয়া বাজারের কাহিনী। এই বাজারে পাঁচজন তরুণের লাশ তিনদিন পর্যন্ত খোলা অবস্থায় পড়েছিলো। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা লাশগুলো আত্মীয়-স্বজনদের নিতে দেয়নি। পরে লাশ পচে গেলে তারা স্থানান্তর করতে দিতে বাধ্য হয়।

সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উল্টোভাবে পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করার অনেক দৃষ্টান্ত এই থানায় রয়েছে। মুগাটোলা ইউনিয়নের তাকা-টিয়া গ্রামের হাশেমকে আটরা হাইস্কুলের পাশের জামগাছে ঝুলিয়ে হত্যা করে তার লাশ কয়েক দিন সেখানেই লটকে রাখা হয়েছিলো। চলতি ট্রাকের পেছনে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে হত্যা করার মতো মারাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। অনেক জায়গায় রক্ষীবাহিনী লাশ ফেলে সাদা কাগজে স্বাক্ষর-বিহীন আদেশনামা লাশের পার্শে রেখে আসতো। ইসলামপুর মাদ্রাসার কাছে এক জায়গায় তিনটা লাশের পাশে এ রকম স্বাক্ষরবিহীন আদেশনামা পাওয়া যায়। এই আদেশনামায় স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে লাশগুলো পুঁতে ফেলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিলো। এতে লেখা ছিলো অবশ্যই যেন লাশগুলো তিনদিন পরে মাটি চাপা দেয়া হয়।

নিছক সন্ত্রাসের জন্য রক্ষীবাহিনী এই থানায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে। রাজীবপুরের হাশেমকে মারার দিন মধুপুর বাজারের আশে-পাশের গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে তাকে ঘুরিয়েছে। প্রতিটি বাড়ীর সামনে হাশেমকে দিয়ে বলিয়েছে, "আমাকে মধুপুর স্কুলের মাঠে আজ বিকেল পাঁচটায় গুলী করে মারা হবে—আপনারা সবাই আসবেন।" নিজের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে হতভাগ্য হাশেম। তবুও সে রক্ষী-বাহিনীর বেয়নেটের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে তাদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী এইদিন পাঁচটায় হাশেমকে মধুপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনী ছাড়াও সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আওয়ামী

লীগের সদস্যরা অনেককে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। আরশ্‌ নামের জনৈক ব্যক্তিকে ঈশ্বরগঞ্জ বাজারের দিন কলেজের মাঠে টিউবওয়েলের হাতল দিয়ে পিটিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা হত্যা করে। রাতের বেলা কে বা কারা তার লাশের মস্তক খণ্ডন করে গায়েব করে ফেলে।

সন্ত্রাস অবশ্য তারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলোও। মানুষ কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলো। সন্ধ্যার সাথে সাথে জনপদ হয়ে যেতো মৃতপুরীর মতো নীরব। সবাই আতংকে থাকতো কে কখন লাশ হয়ে যায়।

'৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত ঈশ্বরগঞ্জের জনবহুল এলাকাগুলোতে লাশের ছড়াছড়ি ছিলো। প্রতিদিন ভোরেই কোথাও না কোথাও পাওয়া যেত বিকৃত অথবা গলাকাটা বেওয়ারিশ লাশ।

খুন ও নির্যাতনের পদ্ধতি

আওয়ামী লীগ সদস্য নিয়ে গঠিত ডিফেন্স কমিটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাই করে হত্যা করতে পছন্দ করতো। জবাই করা লাশের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে, ওরা খুনের কাজে যথেষ্ট নিপুণ ছিলো। হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে শিকারকে আগে কাহিল করে নিত পরে চিৎ করে শুইয়ে কণ্ঠনালীর ঊর্ধাংশে নরম জায়গায় ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে জবাই করা হতো। সাধারণতঃ ঈশ্বরগঞ্জে এইসব জবাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু লোক ছিলো। এ ধরনের একজন খুনীর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে যে, সে প্রতিটি খুনের জন্য ঊর্ধে ২০ টাকা পর্যন্ত পেতো। ব্যক্তিগত জীবনে এই লোক ছিলো ভ্রষ্ট ভূমিহীন কৃষক।

গণহত্যায় ক্লান্ত হয়ে ঈশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী '৭৫-এ ধৃত ব্যক্তিকে খুনের জন্য ডিফেন্স কমিটির হাতে হস্তান্তর করতো। তথাকথিত নির্দোষ হিসেবে রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেয়েও অনেকে ডিফেন্স কমিটির হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। এই ধরনের অনেক কারণহীন খুন অনেক সময় রক্ষীবাহিনী বাধা প্রদান করতো। তবে আওয়ামী নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে বাধা কার্যকরী হতো না। হরিপুর গ্রামের এক পরিবারের ৯ জন নারী-পুরুষ-বৃদ্ধকে হত্যা করার সময় রক্ষীবাহিনী বাধা দিয়েছিলো।

কিন্তু প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের ফলে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। একই সময়ে নয়জন নারী-পুরুষকে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদেরই বাড়ীর আঙ্গিনায় জীবন্ত কবর দেয়। এ ধরনের উন্মত্ত খুনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তৎকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা খুনের জন্যই খুন করতো। এবং খুন এদের কাছে একটা নেশায় পরিণত হয়েছিলো।

নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে তখন সুপরিচিত ছিলো ঈশ্বরগঞ্জ থানা সদরের জেলা বোর্ডস্থ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প এবং মধুপুর বাজারের স্কুলের ক্যাম্প ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। ধৃত ব্যক্তিদের উপর এই দুই কেন্দ্রে নির্যাতনের বিভিন্ন ধরনের কায়দা প্রয়োগ করা হতো। পুলিশের মতো রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কায়দা তত সূক্ষ্ম ছিলোনা। ছিলো নির্মম এবং জঘন্য। মূলতঃ রক্ষী-বাহিনীর নির্যাতনের কায়দা ছিলো লেবরেটারীতে ছাত্রদের বেঙের ডিসেক-শানের মতো সহজ-সরল। ছাত্ররা যেমন বেঙের চার পা পিন দিয়ে গেঁথে নির্বিকারভাবে সার্জিকেল নাইফ ব্যবহার করে রক্ষীবাহিনীও তেমনি করতো। বেশীর ভাগ ধৃত ব্যক্তির উরু, বাহু, হাতের তালু ও কানের লতি বেয়োনেট চালিয়ে ফুটা করা হতো। পা উপর দিকে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় বন্দীর নাকে-মুখে গরম পানি ঢালা হতো। এটা ছিল রক্ষীবাহিনীর সবচেয়ে প্রিয় নির্যাতনের কায়দা। অবশ্য রক্ষীবাহিনী কর্তৃক ধৃত লোকের মাঝে খুব নগণ্য সংখ্যক লোক ভাগ্যক্রমে বাঁচতে পেরেছিল। ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা এখানে জামিনের তদবির করতে আসতো না। আসতো লাশ চাইতে।

অন্য এক জরিপে জানা যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পলাতক ব্যক্তিদের না পেয়ে তার আত্মীয়স্বজনকে ধরে এনে নির্যাতন করতো। এ ছাড়া গরুসহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লুট-পাট করে নিয়ে আসা হতো এবং মোটা অংকের ঘুষ আদায় করা হতো। তাই প্রিয়জনহারা ঈশ্বরগঞ্জের বেশীর ভাগ পরিবার নিঃস্ব।

ব্যক্তিগত ঝগড়া-ফ্যাসাদ

উল্লেখ্য প্রয়োজন যে ঈশ্বরগঞ্জের রক্ষীবাহিনী ছিলো সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন। আওয়ামী লীগই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো

কাকে 'মালিশ' করতে হবে বা কাকে 'খরচ' করতে হবে। তৎকালে আওয়ামী লীগাররা গর্বের সাথে 'খরচ' এবং 'মালিশ' শব্দ খুন ও নির্যাতনের প্রতিকী শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতো। তাই এখানে ৯৮ ভাগ খুন ব্যক্তিগত ঝগড়ার ফ্যাসাদের কারণে ঘটে। এখানে নমুনা হিসেবে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধুতপুর গ্রামের হাফিউজদ্দিন খানের দুই ছেলেকে মারা হয়েছে মূলতঃ আওয়ামী লীগ আত্মীয়ের সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে। অন্য ঘটনাটি ঘটে উচাকিলার রহিম নামক ব্যক্তির ভাগ্যে। উক্ত লোক জনৈক আওয়ামী লীগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত একটা মামলা আদালতে দায়ের করলে প্রভাবশালীরা এই মামলা তুলে নেয়ার জন্য তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। রহিম এতে সম্মত না হলে রক্ষীবাহিনী দিয়ে তাকে খুন করা হয়। সর্বশেষ ঘটনাটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের জনৈক তরুণ নিবেদিত কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাগ্যে এই কর্মীর সাথে ঈশ্বরগঞ্জের জনৈক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার কন্যার সাথে প্রণয়ঘটিত কিছু ব্যাপার ছিল। গরীব কর্মীর দুঃসাহসে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রক্ষীবাহিনী দিয়ে গ্রেফতার করায় এবং হত্যার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। পরে অন্যান্য তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মীদের চাপে এবং উর্ধ্বতন রক্ষীবাহিনীর লীডারের কাছে প্রেমিকার সাথে যৌথ ছবি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পেরে উক্ত কর্মী প্রাণে বেঁচে যায়। তবে তার উরু এবং বাহু বেয়োনেট দিয়ে এফোড়-ওফোড় করা হয়েছিল।

কয়েকটি কাহিনী

আবদুল আজিজ

আবদুল আজিজ ছিলেন মুগটুলার হাফিজউদ্দিন খানের বড় সন্তান। সে ছিল লাজুক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। '৭৫ সালে সে গৌরিপুর কলেজের ছাত্র ছিল। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁর এক আওয়ামী লীগ আত্মীয় রক্ষীবাহিনীর কাছে তার ও তার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তার পরপরই রক্ষীবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া দেয় এবং বাড়ীতে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। আজিজ ও তার

ছোট ভাই নূরুল ইসলামকে না পেয়ে তাদের ছোট ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ছোট ভাইয়ের গ্রেফতারের কয়েকদিন পরে মেঝ ভাই নূরুল ইসলাম ঘাগরা নদীর পাড়ে ধৃত হয় এবং ওখানেই তাকে খুন করা হয়। নূরুল ইসলামের পরিণতি ছোট ভাইয়ের ভাগ্যে ঘটবে এই ধরনের অ... আজিজ সরাসরি ঈশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করে। আওয়ামী লীগ নেতারা আজিজকে পেয়ে উল্লাসিত হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয় কাটালি বাজারে (আজিজের বাড়ীর পার্শ্বস্থ বাজার) তাকে প্রকাশ্যে গুলী করে মারা হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাদের দুর্ভাগ্য তাদের খায়েশ মেটেনি। কারণ ট্রাকে করে কাটালি বাজারে আনার পথে অত্যধিক নির্যাতনে আজিজ মারা যায়। তৎকালে রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত ছোট ভাই জানিয়েছে, আজিজকে কাটালি বাজারে হত্যা করার জন্য আনার সময় পানি খেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে পানি দেওয়া হয় নাই।

আবুল কাশেম :

কাসেম ছিল দুবলির এয়াকুব আলী সরকারের ছোট ছেলে। মৃত্যুর পূর্বে সে ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ থেকে আই, এ পাস করেছিল। রক্ষীবাহিনী ঈশ্বরগঞ্জে ক্যাম্প করার পর থেকেই তাকে খোঁজা হচ্ছিল। তাকে ধরতে না পেরে তার বাপ বৃদ্ধ এয়াকুব আলী সরকারকে হাজতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ধরা পড়ার পাঁচদিন পর কাসেমকে কলতাপাড়া বাস স্ট্যান্ডের পাশে খোলা জায়গায় রাত তিনটার সময় গুলী করে মারে।

কাসেমের সাথে গ্রেফতারকৃত জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, হত্যা করতে নিয়ে আসার সময় কাসেমদের সবাইকে রাত দুটায় জাগানো হয়েছিলো। কিছু মিষ্টিও বিতরণ করেছিল। কিন্তু কাসেম সে মিষ্টি স্পর্শ করেনি। কারণ নাক-মুখে গরম পানি ঢালার ফলে মুখে দগদগে ফস্কা পড়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, সে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

আহমদ আলী :

এই ব্যক্তি ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়নের একমাত্র বি এ পাস ব্যক্তি। ঘটনার সময় সে ময়মনসিংহ ল' কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। ময়মনসিংহ থেকে গ্রামের বাড়ীতে পরীক্ষার ফিস জোগাড় করতে এসে রক্ষীবাহিনীর খপ্পরে পড়ে।

আহমদ আলী গরীব এবং মেধাবী ছাত্র ছিল। বিনয়ী বলে সে এলাকা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। রক্ষীবাহিনী তাকে কেন গ্রেফতার বা হত্যা করে এ কারন জানা যায়নি। প্রথমদিকে সে জাসদ সমর্থক ছিল। কয়েক জায়গা আওয়ামী লীগ বিরোধী মিটিংয়ে সে বক্তৃতা দিয়েছিলো। তার মৃত্যু জন্য অনেকে বক্তৃতাকে দায়ী মনে করে।

তার মৃত্যুর পর তার বৃদ্ধ নানা ঈশ্বরগঞ্জে রক্ষীবাহিনী লীডারের কাছে মাফ চাইতে গিয়েছিল। লাশের জন্য জনৈক আওয়ামী লীগ নেতাকে ৫শ টাকা ঘুষ দিয়েছিল কিন্তু লাশ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

হাবিবুর রহমান:

এই মুক্তিযোদ্ধা আঠারোবাড়ীতে তার আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলো। এখানে সে একটি মেয়ে পছন্দ করে। এখান থেকে সে তার বাপের কাছে চিঠিতে পছন্দের কথা জানায় এবং মেয়ের বাপের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ করে।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে বাপের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত নেমে আসে। '৭৫-এর ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখ তাকে রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ নিয়ে যায়। তার বাপ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। এই পর্যন্ত ছেলের লাশও পায়নি এবং কোনো খবরও পায়নি।

আবদুল কুদ্দুস:

নাউরি গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে ছিলো আবদুল কুদ্দুস। আবদুল কুদ্দুস ছিলো ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র। ছুটিতে বেড়াতে এসেই সে মৃত্যুর খপ্পরে পড়ে। '৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের ২২ তারিখ সে মা ও বোনদের সাথে বসে ঘরের বারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিল সিভিল কাপড়ে এসে রক্ষীবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বিকেলের দিকে তাকে এনে বাড়ীর সবাইকে বেধড়ক পিটায় এবং ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ধরা পড়ার পরের দিনই বাড়ীর সামনে পেটে-মুখে অসংখ্য বেয়োনেট চার্জের দাগ সহ তার লাশ পাওয়া যায়।

ঈশ্বরগঞ্জে এভাবেই মরেছে শত শত তরুণ। মরেছে তারাই যাদের প্রতি

মা-বাবা-পড়শীদের ছিলো অনেক আশা, অনেক ভরসা। আজ তারা নেই। তবে কালো দিনগুলোর দুঃস্বপ্ন নিয়ে বয়ে গেছে তাদের পরিবার-পরিজনের হৃদয়ে মর্মান্তিক স্মৃতি এখনো তোদের কষ্ট দেয়।

তদন্ত

'৭৫-এর আগস্টের পট পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক নিপীড়ন, খুন-এবং পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তাঁরা এ সম্পর্কে কথা বলতে অপারগ বলে জানিয়েছেন। তবে ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ উক্ত তদন্ত কমিশনের কাজে প্রচুর অভিযোগ পেশ করেন। (অনেকে তৎকালীন নির্যাতনের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন)। জানা যায়, শুধুমাত্র পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া অন্য কোনো পদক্ষেপ তদন্ত কমিশন নেয়নি। এই কমিশন কোনো রিপোর্ট পেশ করেছে কিনা তাও জানা যায়নি।

উপসংহার

জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণার বক্তব্য ছিলো, ২৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মী হত্যার বিচার দাবী। বিজয়ের চার বছর পরও এ সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ এ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। যেহেতু জনগণ আর ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ ধরনের নির্মম হত্যাযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি চান না সেহেতু খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও তারা দাবী করেন। খুনীদের ক্ষমা করে দিয়ে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উত্তরণও কোনোমতে সম্ভব নয়। কেননা, দোষী ব্যক্তির শাস্তি প্রদান গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত।'

(সন্ত্রাস '৭৩-৭৪ঃ কাজী শামীম ঃ সাপ্তাহিক সংহতি ঃ ৮ জানুয়ারী ১৯৮৪)

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রক্ষীবাহিনী জাসদ কর্মীদের হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী আলোকচিত্রী নাসির-আলী মামুন এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন ঃ

'আমি তখন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ছবি তুলতাম। জাসদের

১৭ মার্চের সভায় গিয়েছিলাম ছবি তোলার জন্য। সভাশেষে মিছিলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ীর কাছে এলাম। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ৪ থেকে ৫শ' পুলিশ মোতায়েন ছিলো বাড়ীতে। মিছিলকে বাঁধা দিলো তারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বাড়ীতে নেই। মিছিল থেকে কেউ কেউ ইট-পাটকেল ছুড়লো বাড়ীতে। পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে বাড়ী ঘেরাও করতে অগ্রসর হলো মিছিল। এমন সময় চারদিক থেকে অসংখ্য রক্ষী-বাহিনী এসে ঘিরে ফেললো মিছিলের লোকদের। প্রথমে তারা ফাঁকা আওয়াজ করলো এবং সবাইকে চলে যেতে বললো। রক্ষীবাহিনী দেখে লোকজন পালাতে শুরু করলো। এ অবস্থায় রক্ষীবাহিনী নতুন কোনো উস্কানী ছাড়াই মারপিট ও গুলী শুরু করলো। মেজর জলিল, আ, স, ম আবদুর রব ও মমতাজ বেগম বাড়ীর গেটেই ডানদিকের একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরো কয়েকজন নেতাও তাদের সঙ্গে। তারা শুয়ে পড়লেন গাছের নিচে। তখন এলোপাতাড়ি গুলী শুরু করছে রক্ষীবাহিনী। শোওয়া অবস্থায় অনেকের বুকের কাছে এসএলআর রেখে গুলী করতে থাকে। আমিও শুয়ে পড়লাম। চারদিকে মরণ চিৎকার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। আমার শরীর আশে-পাশের কয়েকজনের রক্তে ভিজে যেতে লাগল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমরা যেনো শত্রু দেশের কোনো সৈন্য। পাশবিকভাবে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চললো চোখের সামনে। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকলাম। শুয়ে শুয়ে দেখলাম দেয়াল টপকে পলায়মান অনেককে গুলী করছে, যেন পাখী শিকার। মেজর জলিল কয়েকবারই মাথা উঁচু করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অন্যান্য নেতা তাকে জোর করে ধরে রাখলেন। জলিল শুয়ে শুয়েই চিৎকার করছিলেন, 'স্টপ ফায়ার রক্ষী, স্টপ ফায়ার।' তিনি খুব বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র। পুলিশ তখন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। মনে হচ্ছিলো তারা মিছিলকারীদের পক্ষে। গাছের নিচে শুয়ে থাকা নেতাদের উপর তারা গুলী চালাতে দেয়নি। একটানা পনের মিনিটের মতো গুলী চললো। আমি পাকিস্তানী আর্মিদের হাতেও ধরা পড়েছিলাম, জেলও খেটেছি তখন, কিন্তু এমন নির্মম ও নারকীয় কান্ড জীবনে আর দেখিনি। কোন বিরোধী দলের মিছিলে এত দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কোথাও গুলী চালানো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।'

গুলীবৃষ্টি যখন থামলো, দেখলাম রক্তে লাল হয়ে গেছে চারদিক। চারদিকে মরণ যন্ত্রণা ও কাৎরানির শব্দ। কে কাকে সাহায্য করে? আমি ক্যামেরাটা গলার কাছে ধরে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। উদ্দেশ্য, ক্যামেরা দেখে যদি গুলী না করে। পরে টের পেলাম পালানের চেষ্টা করলেও অনেকে পালাতে পারেনি, রক্ষীবাহিনী পালাতে দেয়নি, তাদের হুঁশিয়ারী ছিলো লোক দেখানো মাত্র গুলী সাথে লাথি ও বন্দুকের আঘাত যে কত করেছে তার হিসেব নেই। শুয়ে থাকা কেউই অক্ষত ছিলো না। গুলীতে আহত ও রক্তাক্ত লোকগুলোকে টেনে, হেচড়িয়ে, কোথাও বা মারতে মারতে গাড়ীতে তুললো তারা। পুলিশ অবশ্য আহতদের সাহায্য করেছে। আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে লাথি মারতে মারতে ট্রাকে তুললো তারা, কোন দোহাই শুনলো না। তবে অন্যের তুলনা কমই মেরেছে আমাকে। আমি রক্ষীবাহিনীর গাড়ীতে উঠার সময় দেখলাম রব ও জলিলকে পুলিশের গাড়ীতে তোলা হচ্ছে ঘেরাও দিয়ে যাতে রক্ষীবাহিনী তাদের মারতে না পারে। পরে আমাদের নিয়ে গেলো শাহবাগের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আমাদর পাঠিয়ে দিল রমনা থানায়, সাথে একজন পুলিশ দিয়ে। তখন আমার গোঁফও ভাল করে ওঠেনি। সম্ভবতঃ পুলিশটির দয়া হয়েছিলো আমাকে দেখে। অনেক গল্প করলেন তিনি, বললেন, দেখেন ভাই কি অত্যাচার শুরু হয়েছে দেশে। রক্ষীরা আমাদের কোনো কথাই শোনে না।'

'রমনা থানার সেলে নিয়ে গেলো এরপর। এই একই সেলে একাত্তর সালে আমাকে ও আমার আব্বাকে আটক রাখা হয়েছিলো। শরীরে তখন প্রচন্ড ব্যথা। ক্যামেরা আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিলো। অবশ্য রমনা থানার তৎকালীন ও, সি-র বদান্যতায় ক্যামেরাটা ফেরৎ পেয়েছিলাম। অবশ্য রিলগুলো পাইনি। একটা রিল লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাত দু'টোর দিকে, আমি তখন হাটুর উপর মাথা রেখে ঘুমুতে চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ শুনলাম একজন ভদ্রলোক সেলের চোর-ছ্যাচড়াদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছেন। মাথা তুলে দেখি কবি আল মাহমুদ। আমাকে চিনতেন তিনি। তাকে রাতে ঘেরাও করে বাসা থেকে ধরে এনেছে। তিনি তখন গণকণ্ঠের সম্পাদক। পরদিন আমাদের দু'জনকে পুলিশ ভ্যানে পাঠিয়ে দিলো সেন্ট্রাল জেলে। জাসদের অফিস অতিক্রম করার সময় দেখলাম আগুন জ্বলছে সেখানে।

পরদিন শুনলাম শেখ কামাল ও পাহাড়ির নেতৃত্বে জাসদ অফিস পোড়ানো হয়েছে। জেলে গিয়ে দেখি আশে-পাশে সব জাসদের লোক। সাতদিন জেলে থাকার পর মুক্তি পেলাম। আমার বড় ভাই তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সঙ্গে জড়িত থাকায় বের হয়ে আসতে পেরেছি। সেদিন আরো বহু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার মার খেয়েছিলেন।'

'১৭ মার্চ ছিল শেখ মুজিবের জন্ম দিন। পরদিন ইত্তেফাকে পাশাপাশি ছবি ছাপা হলো, অসুস্থ শেখ মুজিব ফলের রস পান করেছেন এবং মেজর জলিল ও রবকে টেনে হিঁচড়ে জেলে নেয়া হচ্ছে।'

আবদুল মতিন আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ আমলের সন্ত্রাস সম্পর্কে বলেন: 'আমাদের একজন কর্মী মুজিববাদীদের গুলীতে নিহত হবার সময় তার শেষ কথা ছিলঃ ' আমার রক্ত এর প্রতিশোধ নেবে।"

আওয়ামী লীগ গোড়া থেকেই প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিবন্ধক হিসবে চিহ্নিত করে টার্গেট করেছে। একাত্তরের মার্চে তারা ভারতে চলে গেলো, আমরা দেশে রয়ে গেলাম। পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করলাম স্বাধীনভাবে। একাত্তরের জুলাই আগস্ট মাসে পাক-বাহিনী আমার পিতা ও এক ভাইকে হত্যা করেছে। আমাদের বহু কর্মী-সমর্থক প্রাণ দিয়েছে তাদের হাতে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়েছে অনেকের।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের স্পষ্ট মত পার্থক্য ছিলো এটা ঠিক, কিন্তু তারা আমাদের এভাবে টার্গেট করবে ভাবতে পারিনি। একাত্তরের জুলাই-অগস্ট থেকেই মুজিববাহিনী আকারে তারা এলাকায় প্রবেশ করতে থাকে। সেপ্টেম্বরে তারা ঈশ্বরদীর শাহপুরে ঢুকে পর পর আমাদের ৬/৭ জন কর্মীকে হত্যা করলো। আমরা তখন পাক-বাহিনী ও মুজিববাহীনীর দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার হলাম। ভারতেও আমাদের অনেক কর্মী তাদের টার্গেট হয়েছে। দেলোয়ার নামে আমাদের এক কর্মী যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য ভারতে গিয়েছিলো, কিন্তু পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

স্বাধীনতার পর যশোহর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহীসহ উত্তর বাংলার বিভিন্ন স্থানে আমাদের কর্মীদের তারা নির্বিচারে হত্যা শুরু করলো। বাধ্য

হয়ে আত্মাইয়ে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। পরে ব্যাপক সংঘর্ষ এড়াবার জন্য আমরা পিছিয়ে আসি। এরপর শুরু হয় আমাদের পার্টির কর্মী সমর্থক ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর ব্যাপক অত্যাচার। '৭৩-এর পরই আমরা পিছিয়ে এসেছিলাম। মুজিবের পতনের পূর্ব পর্যন্ত একটানা হত্যা ও সন্ত্রাস হয়েছে সারাদেশ জুড়ে। তাদের নির্দয়তারও তুলনা ছিলো না। আমার চাচার সামনে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমার আপন ভাই গাফফারকে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করতে করতে হত্যা করেছে। পাবনার জেলখানা থেকেও আমাদের কর্মীদের ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের কর্মী মাসুদের মায়ের সামনে তার ১৭ বছরের ছোট ভাইকে হত্যা করেছে নারকীয়ভাবে। মায়ের সামনে প্রথমে তার হাত ও পা কেটেছে। যাকে ধরেছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, ফ্যাসিস্ট আমলের হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেছে তাদের নির্মমতা। নৃশংসতায় পাক বাহিনীর চেয়েও বেশী ছিল তারা। জেলে তারা যে আচরণ করেছে তা বৃটিশরাও করেনি।'

'তবে এটাও ঠিক যে, তখনকার সেনাবাহিনী ছিলো এ ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বরং তারা আমাদের কাছে অপারেশনের আগে খবর পাঠিয়ে দিতো, আমরা সরে যাওয়ার জন্য। রক্ষীবাহিনী-মুজিববাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর যে দ্বন্দ্ব ছিলো সেটা তখন আমরা ভালভাবে বুঝতে পারিনি। আমরাও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছি।'

'সিরাজ সিকদার ও জাসদের তৎপরতা সম্ভব হয়েছিলো পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো বলে। জাসদের সুবিধে ছিলো যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিলো।'

আওয়ামী লীগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হচ্ছিলো জনগণ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতা যত বেড়েছে, তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতাও বেড়েছে সমহারে। সন্ত্রাস দিয়ে তারা সব দমন করতে চেয়েছে।

'আমরা স্বীকার করি, রাজনীতিতে চারু মজুমদারের লাইন গ্রহণ আমাদের জন্য সঠিক ছিলো না। মার্ক্সবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পাশাপাশি চলতে পারে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলে আমাদের হাতিয়ার ধরতে হয়েছিলো বাধ্য হয়ে

তারাই আমাদের ঠেলে দিয়েছে সে পথে। তাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় আমরাও তাদের উপর হামলা করেছি। অথচ এটা কাম্য ছিলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর উচিত ছিলো সবাইকে নিয়ে দেশটা গড়ে তোলা। আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করি, কিন্তু তারা তা করবেনা।'

'জিয়ার আমলে জেলে মনসুর আলী ও তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো। তখন উত্থাপন করেছিলাম এ সব প্রশ্ন, কেন তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, কেন আমাদেরও ঠেলে দিয়েছিলেন বিপর্যয়ের দিকে? মনসুর আলী সাহেব অস্বীকার করে বলেছেন, এতোসব তারা জানতেন না। তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, চলুন বের হবার পর সবাই মিলে মুক্তির পথ নিয়ে ভাবি, দেশটাকে গড়ে তুলি।" কিন্তু তারা বের হবার সুযোগ আর পেলেন না।

'সন্ত্রাসবাদ কখনো মার্ক্সবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দু'টো পাশাপাশি চলেনা। তখন আমরা তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু তলিয়ে দেখা দরকার, যারা সিরিয়াস মার্কিস্ট, যারা ক্ষমতায় যেতে চায়।

আ মেদ বুলবুল তখন জামালপুরে থাকতেন। তিনি আমার কাছে বললেন আরেকটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি, রক্ষী-বাহিনী পেট্রল নায়ক একজন জাসদ কর্মীকে জামালপুর স্কুলের মাঠে প্রকাশ্যে প্রহার করতে করতে হত্যা করে। তাকে হত্যার পূর্বে রক্ষীবাহিনী স্কুলের শিক্ষার্থীও শিক্ষকদের মাঠে আসতে নির্দেশ দেয় এই হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য।

অধ্যায় ঃ গ্রন্থে বিভীষিকার বর্ণনা

আওয়ামী লীগ আমল ও সরকারের সন্ত্রাস-নির্যাতনের স্বরূপ ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় তা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বকে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করে আমি তুলে ধরেছি। চলতি অধ্যায়ে গ্রন্থ ও পরের অধ্যায়ে পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

নিজের দলের উপর আক্রমণ ও তার স্বরূপ সম্পর্কে সিরাজ সিকদার নিজে লিখেছেন ঃ 'পঁচিশ মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে ভুলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবরস্ত করা, নকসাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে। কিন্তু তারও ধৈর্য তাদের ছিল না, অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা খতম শুরু করে। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের কর্মীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।

তারা উগ্রজাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদী নির্মূলের পথ অনুসরণ করে। অপরাধী নিরপরাধী নির্বিশেষে অবাঙ্গালী উর্দু ভাষাভাষী শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধ অর্থাৎ সবাইকে হত্যা করার ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালায়। শত শত নিরপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাঁটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, শিশুদের মায়ের সামনে হত্যা করে, মা'কে শিশুর রক্ত পানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ-যুবকদের সারিবেঁধে গুলি করে হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু-নারীদের তারা নদীর

মাঝে নির্জন দ্বীপে ফেলে আসে অভুক্ত অবস্থায় তাঁদের মারার জন্য! নিরীহ নারী-শিশুরা গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে বেড়ায়। এই ফ্যাসিস্টদের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়। এ সকল আশ্রয়হীন নারী-শিশুদের তারা পথিমধ্যে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও অপহরণ করে।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী প্রাণ হারায়।

এদের অপরাধ এরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এভাবে এরা পূর্ববাংলার উর্দু ভাষাভাষী জনগণের সাথে বাঙ্গালীদের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে।

তাদের এ সকল কার্যকলাপের সাথে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কার্যকলা-পের কোন পার্থক্য নেই।'

'পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের ২৫শে মার্চের পরবর্তীকালীন আক্রমণের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর বহু নেতা ও কর্মীকে সর্বহারা পার্টির কর্মী ও গেরিলারা আশ্রয় দেয়। তাদের ও তাদের পরিবারকে অর্থ, বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগ প্রদান করে।'

'পরবর্তীকালে ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী পূর্ববাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করার ঘৃন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

'তারা এ জঘন্য অন্তর্ঘাতি কার্জ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। কিন্তু তবুও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নীতির স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়।'

'অতীতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েত সামাজিক

সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, নিজেদেরকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ : পূর্ব-বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ—এই ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত করে। পূর্ববাংলাকে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়, তারা ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংসের কাজকে প্রাধান্য দেয়, পক্ষান্তরে পূর্ববাংলার জাতীয় স্বার্থ বিক্রয়কারী জাতীয় শত্রুদের পয়সার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। জনগণের ওপর অত্যাচার করে।'

'ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে, অন্যান্যদের খুঁজে বেড়ায়। মাদারীপুরে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাঁবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়ীতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে, বাড়ী লুট করে।'

'সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দু'জন কর্মীর সাথে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে। তারা গ্রেফতারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় শত্রুর নির্দেশে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।'

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালি, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দী করে, আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, বাকীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনীরা

হত্যা করেছে।'

'এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়।'

'তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দী করে, তার পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে; শিখার উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষণ করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি।

'তারা আরো কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে।'

'তাদের এই ঘৃন্য, বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা।'

'তারা ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে আমাদের দু'জন গেরিলাকে বন্দী ও নিরস্ত্র করে এবং মৃত্যুদন্ড দেয়। তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে জনসাধারণ বুক পেতে দেয়, "আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর এদেরকে হত্যা কর।" জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।'

'কুখ্যাত ডাকাত—নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা মেহেন্দিগঞ্জেও আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেফতার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়।'

'গৌরনদী অঞ্চলে তারা আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয় এবং কর্মীদের খতম করার প্রচেষ্টা চালায়।'

মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনা-সামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। একসাথে কাজ করার ভাওতা দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পিছন থেকে গুলী করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামক

অপর এক কর্মী।'

'বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা সুযোগ সন্ধান করে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে।'

'ঢাকার নরসিংদী অঞ্চলে আমাদের গেরিলাদের তারা অস্ত্র জমা দিতে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলে, অন্যথায় খতম করবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের গ্রেফতাকৃত কর্মীদের নিকট বেত দেখিয়ে এ ফ্যাসিস্টরা বলে তোমাদের নেতা "সিরাজ সিকদারকে" গ্রেফতার করে বেত দিয়ে মারতে মারতে ভারতে নিয়ে যাব।'

পূর্ববাংলার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর এই ফ্যাসিস্টরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের গোলাম হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ দেশপ্রেমিকদের খতম করার জন্য। পাক-সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের খোঁজ করা—খতম করার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।'

'আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাযথ খবরের ভিত্তিতে আমাদের কোন কোন ইউনিটকে ঘেরাও করে, নিরস্ত্র করে কিছু-সংখ্যক কর্মীকে হত্যা করে। টাঙ্গাইলে জাতীয় শত্রু চেয়ারম্যানের খবরের ভিত্তিতে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে কেটে লবণ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বহু স্থানে তারা আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে।'

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল এরূপ কিছু বুদ্ধিজীবী, ভ্রষ্ট সর্বহারাদের আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের গেরিলা বাহিনীতে নিয়েছিলাম, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়শীলদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা প্ররোচিত হয়ে দলত্যাগ করে এবং বিশ্বাস-ঘাতকের ভূমিকা পালন করে আমাদের কর্মীদের ও ইউনিটের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তাদের সাথে যোগদান করে। অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী

বিডিআর রক্ষীবাহিনীকে
বিশ্বাস করতো না।
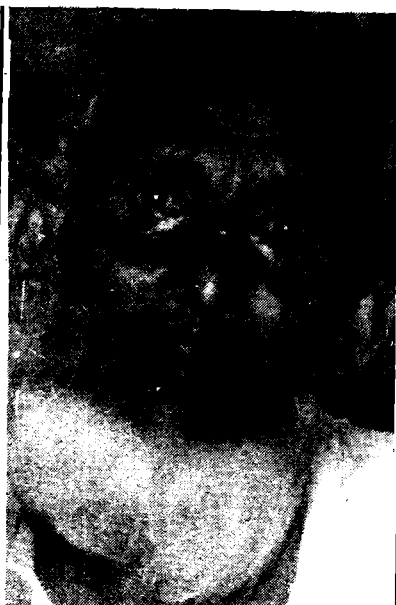
সন্তানহারা আবদুল আলী

ছবি ঃ লেখক
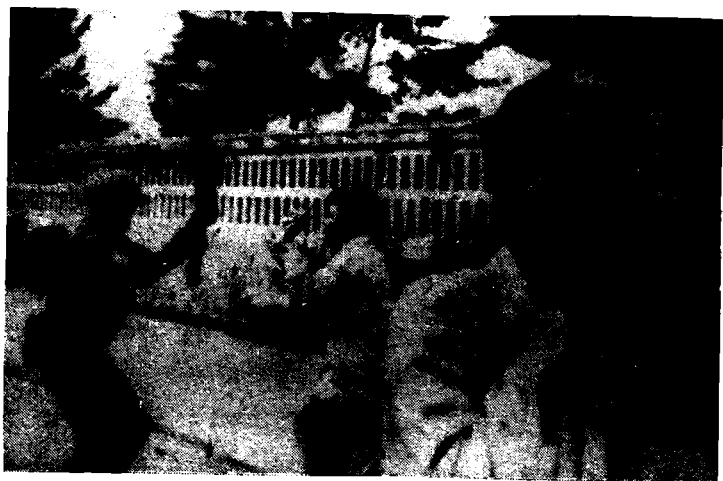
রক্ষী সন্ত্রাস '৭৪ —গণকণ্ঠ

লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে বেঁচেছিল এরূপ কিছুসংখ্যক সামন্তবাদী, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী সহানুভূতিশীলরা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খবর সরবরাহকারী হয়।'

কয়েক ক্ষেত্রে ঐক্যের আলোচনার কথা বলে তারা ঐক্য-বৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করে মৃত্যুদন্ড দেয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে; তারা বুক পেতে বলে আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর একে হত্যা কর। জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কয়েক ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত আমাদের কর্মীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

(সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৬১, ও ৬২)

নূর হোসেন (বিএসসি, বিবম) বাংলাদেশ বিমানে চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী ও ভাল সংগঠক। পাকিস্তান আমলে তিনিই প্রথম (১৯৬৯ সালে) পিআইএ-তে সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ঘেরাও অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানে প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশ ঘটান। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের ২১শে মে মুজিববাদীরা প্রকাশ্য মিছিলে তাকে গুলী করে হত্যা করে। এ সম্পর্কে 'শহীদ নূর হোসেন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক রচনার একাংশে উল্লেখ করা হয়।

'১৯৭৩ সালের ২১শে মে মওলানা ভাসানীর অনশন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আহূত হরতালের দিনে ঢাকায় রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা কালে ডিপিআই অফিসের সামনে মুজিববাদী গুন্ডাদের গুলীতে আহত হন। আহত অবস্থায় তৎকালীন গুন্ডাবাহিনী তাঁকে একটি রেডক্রসের জীপে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর পরিবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিলের সাথে আলাপ আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত শহীদ নূর হোসেনের লাশ ফেরত পাননি।'

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে রাজশাহী জেলে অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বন্দী ছিলেন মনিসিংহ ও দেবেন সিকদার। মার্চ মাসের গোড়ার

দিকে জেলের কয়েদীরা বিদ্রোহ করে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই কাজে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছিলেন সাবান মল্লিক। সাবান মল্লিক রাজনৈতিক কর্মী ছাড়াও ছিলেন 'শৌখিন ডাকাত'। ধনীদের বাড়ীতে ডাকাতি করে সেই অর্থ বিলিয়ে দিতেন গরীবদের মধ্যে। পরে মুজিববাদীরা তাকে হত্যা করে, যদিও তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এ সম্পর্কে দেবেন সিকদার লিখেছেন ঃ

'সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, যার দক্ষতা ও কাজের ফলে রাজশাহী জেল বিদ্রোহ সফল হয়েছিল, সেই দক্ষ সংগঠক কমরেড সাবান মল্লিককে রুশ-ভারতের আওয়ামী পান্ডারা বন্ধুবেশে ডেকে এনে যুদ্ধের শেষদিকে হত্যা করেছিল। যে সাবান মল্লিক জেল থেকে বের হয়ে বাড়ী না গিয়ে সোজা পাবনায় গিয়ে টিপু বিশ্বাসের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল, পরে টিপু বিশ্বাসরা যখন পাকিস্তান বিরোধী যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সাবান মল্লিক পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া একটি চায়নিজ রাইফেল নিয়ে নিজ গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপরও তিনি নিহত হলেন যেহেতু তিনি দেবেন সিকদারের শিষ্য ও কমিউনিষ্ট এবং একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। আজও চাটমোহর থানার সমস্ত জনগণ তার জীবন্ত সাক্ষী। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান অভিসম্পাত দিচ্ছে—মেকী স্বাধীনতার জিম্মাদারদের।

(বাইশ বছরের গোপন জীবন, গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর পৃষ্ঠা-২০২)

কুষ্টিয়া আলোক দিয়ার মতিউর রহমান বাবুকে হত্যার পর রক্ষীবাহিনী তার আরেক ছোট ভাই আনিসুর রহমানকেও হত্যা করে। বামপন্থী নেতা দেবেন শিকদার 'শহীদদের জীবনী সংগ্রহ' প্রশ্নমালায় তাঁর হত্যাকান্ড সম্পর্কে জানতে চেয়ে যে প্রশ্নমালা বিলি করেছিলেন (১৯৭৯ সালে) সেখানে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় ঃ 'কমরেড মতিয়ুর রহমান বাবুকে হত্যা করার পরে তার ছোট ভাই ওয়ালিউর রহমান যখন প্রথমে মতিভাইয়ের লাশ খুঁজে বের করার চেষ্টা নিচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে ধরা পড়ে এবং নিকটআত্মীয় এক রক্ষীবাহিনীর লিডারের সহযোগিতায় ছাড়া পাবার পরও সেই ওয়ালিউর রহমানকে খুঁজতে গিয়ে তাকে না পেয়ে তাদের ছোট ভাই

৯ম শ্রেণীর ছাত্র আনিসুর রহমানকে ধরে নিয়ে গিয়ে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে।'

জাসদের ১৭ই মার্চ '৭৪ ঘেরাওকালে রক্ষীবাহিনীর নির্মমতা সম্পর্কে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিল লিখেছেন :

'আজ ১৭ই মার্চ, ১৯৭৪ সাল। ......বেলা দশটা বাজতেই দেখা গেলো গোটা বিশেক বড় বড় ট্রাক ভর্তি রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ-এর আড্ডা জমেছে বায়তুলমোকাররমের সামনে, আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে এবং পল্টনের আশপাশে। বেলা দু'টো বাজতে আরো গোটা তিরিশেক ট্রাক ভর্তি সরকারী বাহিনী এলো। এছাড়া প্রধান প্রধান মোড়ে পুলিশ ভ্যানগুলোকে দাঁড়ানো দেখা গেলো। মনে হচ্ছে, ওরা যেন নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে নামবে। প্রত্যেকের হাতেই ছিল আধুনিক অস্ত্র, এস,এল,আর, স্টেনগান, এল,এম,জি, গ্রেনেড। সরকারী বাহিনীকে এরকম যুদ্ধাবস্থায় সজ্জিত দেখে জনসাধারণ কৌতূহল বোধ করলো—এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি কাদের ঠেকানোর জন্যে ?

বিকেল তিনটা বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন দিক থেকে জনতার ঢল নেমে এলো পল্টনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পল্টন উপচে লোকজন পার্শ্ববর্তী স্টেডিয়ামের নিচে, উপরে এবং গুলিস্তান বিল্ডিং পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেলো। ......অবশেষে মিছিলটি এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ীর গেটের সামনে ঘিরে দাঁড়ালো। উত্তেজিত জনতার শ্লোগান চলছে তখন পুরোদমে। দীর্ঘক্ষণ এমনি ঘিরে রাখার পর হঠাৎ অসংখ্য অস্ত্রধারী রক্ষীবাহিনী '......' মতো ছুটে এলো গেটের দিকে। রাইফেলের বাট ও বেয়োনেট দিয়ে জখম করলো অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে। লোকজন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটোছুটি শুরু করলো। মেজর জলিল, আ স ম রব সামনে এসে রক্ষীবাহিনীকে খালি হাতেই বাধা দিতে লাগলেন। ......অকস্মাৎ শুরু হলো বন্যার মতো গুলিবর্ষণ। এস এল আর, স্টেনগান সবগুলো টক্‌টক্‌, ঠুস ঠাস, দুরুমদারোম শুরু হলো আপন আপন গতিতে। যেনো শত শত দানাব ছুটে আসছে, যে যেখানে পারলো শুয়ে পড়লো। নিরীহ, নিরস্ত্র জনতার আর্তনাদ শোনা গেলো চারদিকে। এ যেন যুদ্ধ—মহাযুদ্ধ শুরু হলো। মুহূর্তে গোটা মিন্টুরোডটি

একপক্ষীয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের রূপ নিলো। সন্ধ্যা তখন সবেমাত্র ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের গাঢ় ছায়া তখনো পড়েনি। মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো একটি মেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।......রাস্তার পাশে দু'জনের রক্তমাখা দেহ। অদূরে আরো কয়েকটি যুবক-যুবতীর রক্তমাখা স্তব্ধ শরীর পড়ে রয়েছে। রক্ষীবাহিনীর গুলী তখনো থামেনি। গাঢ় অন্ধকারে বীভৎসতা ভৌতিক হয়ে উঠছে। আহতদের মরণ আর্তনাদ, রক্ষীবাহিনীর শিকারী চিৎকার, গুলীর শব্দ ফানা ফানা করে দেয় রাতের নিস্তব্ধতাকে। গোলাগুলি চলার সময়েই পুলিশের একটা ট্রাক এসে তাড়াতাড়ি আহত নিহত অবস্থায় যারা গেটের সামনে পড়েছিলো তাদের ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।'

(সূর্যোদয় : মেজর জলিল : পৃষ্ঠা-১৪৪—১৪৯)

জাসদের ঘেরাও এবং অন্যান্য প্রকাশ্য দলের উপর সরকারী বাহিনীর নির্মমতা ও নির্যাতন সম্পর্কে মওদুদ আহমদ তার, 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল' গ্রন্থে লিখেছেন :

'এই সময়ে মওলানার নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং জাসদ উভয় দল তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সংস্কারপন্থী অসংখ্য যুবকের সমর্থনপুষ্ট জাসদই সরকারের জন্য প্রধান হুমকী হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। দেশব্যাপী জাসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোকসমাগম হতে থাকে। জনগণের কাছে জাসদই ছিল তখন বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল। ১৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠান শেষে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনসভায় জাসদ 'সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষক শ্রেণীর এজেন্টদের' ঘেরাও-এর কর্মসূচী সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঢাকা থেকে এই ঘেরাও অভিযান শুরু হয় এবং একই দিনে রেডক্রসের চেয়ারম্যান, মহল্লা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেআইনী গাড়ী-বাড়ী-জমি সম্পত্তির দখলদার, রাষ্ট্রীয়-বাণিজ্য সংস্থা, ভূয়া লাইসেন্সধারী, সরকারের আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় কারাগার, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ

সদস্যদের অফিস ও বাসগৃহ, রেডিও-টিভি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রক্ষীবাহিনীর কার্যালয় এবং সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ঘেরাওয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করে।'

'একই দিনে জাসদ মিন্টু রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের মাধ্যমে ঘেরাও অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে জনসভা শেষে একটি বিশালকার বিক্ষোভ মিছিল একটি স্মারকলিপি হস্তান্তরের জন্য পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে উত্তেজিত জনতার সাথে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর এক খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী তলব করা হয়। সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার ওপর গুলীবর্ষণ করে। যদিও দুইপক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তথাপি এই গুলীবর্ষণের ফলে মূল্য দিতে হয়েছে বিক্ষোভকারীদেরই। গুলীবর্ষণে সরকারীভাবে ছয়জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জনেরও বেশী, শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং জাসদের সভাপতি এম, এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ, স, ম, আব্দুর রবসহ ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

'পরদিন আওয়ামী লীগ জাসদের ওপর একটি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আরো প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। সরকার যেখানে জাসদকে ধ্বংসযজ্ঞে নিয়োজিত রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগ একে চীন-মার্কিন দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বলে যে, এরা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেদিন আওয়ামী লীগ জাসদকে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঢাকা শহরে নানা ধরনের অস্ত্রসজ্জিত লোক সমন্বয়ে বিরাট এক মিছিল বের করে। তারা জাসদের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দাবি করে ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অবস্থিত জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যলয় পুড়িয়ে দেয়। রক্ষীবাহিনী একই রাতে জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকন্ঠ অফিসের দখল গ্রহণ করে এবং গণকন্ঠের

সম্পাদক আল মাহমুদকে আটক করে জেলখানায় পাঠায়।'

'ঘেরাও মিছিলে জাসদ কর্মী হত্যা এবং দলের অফিস আক্রমণের প্রেক্ষিতে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সরকারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে। পরদিন সরকার দেশব্যাপী প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। শত শত জাসদ কর্মীকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। এতে করে প্রচুর সংখ্যক জাসদ নেতা ও কর্মী জেলে থাকায় এবং আওয়ামী লীগ জাসদকে শায়েস্তা করার নামে ব্যাপক 'প্রতিরোধ আন্দোলন' শুরু করায় দলের অন্যান্য কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। বিক্ষোভ প্রশমিত হলে সরকার ক্ষমাহীনভাবে জাসদকে শায়েস্তা করার জন্য মাঠে নামেন। এ সময় সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের একটি সুসংগঠিত অংশকে জাসদের ওপর দমননীতি চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়। এতে করে দেশের অন্যান্য মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমান ও অন্যান্যের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট গ্রুপগুলোর বিভিন্ন অংশও ক্রমশঃ সক্রিয় হতে থাকে। জাসদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু হওয়ায় দলের অসংখ্য কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র গ্রুপ তৈরী করে দেশের রাজনৈতিক প্রবাহে নতুন ধারা সংযোজনের প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভূত হন।

মুজিব আমলে সামগ্রিকভাবে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাস সম্পর্কে হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন: '৭৩ সালের দিকে কালীগঞ্জে পুলিশী আক্রমণ শুরু হয়। '৭৪ এর দিকে রক্ষীবাহিনী নামে। '৭৩ সালে পার্টির গেরিলারা ৫ জন পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেন। এরপর ব্যাপক পুলিশী অত্যাচার চলে গোটা এলাকায়। আড়মুখ গ্রামে ৬৩টি বাড়ি পোড়ানো হয়, বহু ধর্ষণ করা হয়। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার ছিল আরও বীভৎস। হত্যা ও ধর্ষণ ছিল রক্ষীবাহিনীর নিয়মিত ঘটনা। কালীগঞ্জের কালার বাজারে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের কাছে একটি গণ-কবর করা হয়েছিল।

সেই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জনৈক প্রাক্তন পার্টি গেরিলা নেতা আমাকে বলেছেন, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ তীব্র হলে আশ্রয় পাওয়া যেত না। কিন্তু সরকারী বাহিনী কাছাকাছি না থাকলে আশ্রয় পাওয়া যেত। পার্টি তখনও পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে কোন যুদ্ধ করেনি, বরং যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪-এর ১১ই অক্টোবর পার্টির এক গোপন সভা হচ্ছে। এমন সময় রক্ষীবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। এই প্রথম কালীগঞ্জের পার্টি রক্ষীবাহিনীর সংগে যুদ্ধেঅবতীর্ণ হয়। দু'জন পার্টি নেতা ওয়াজেদ আলী ও কামরুজ্জামান মোল্লা আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। তাঁদেরকে বন্দী ও আহত অবস্থায় ৫/৭ মাইল দূরে গরুর গাড়ীতে করে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য গেরিলারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা করেনি। এই ঘটনা অনেক পার্টি কর্মীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর কিছুদিন পর আরও বেশ কিছু পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী ধরা পড়েন তার মধ্যে রাশিদা নামে একজন নারীকর্মীও ছিলেন। তাদের সবাইকেই রক্ষীবাহিনী হত্যা করে। একই সঙ্গে এলাকায় রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগের গণপিটুনী আরম্ভ হয়। পার্টির সামান্যতম সমর্থকদেরও কালীগঞ্জে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'এই রকম অবস্থায় নতুন করে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৭৫ এর জানুয়ারী মাসে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, চিহ্নিত শত্রুকে খুন করতে হবে এবং বড় রকমের ঘটনা ঘটিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর আগে বহুদিন পর্যন্ত পার্টি খতমের লাইন বাদ দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের পর কয়েক রাতে কালীগঞ্জে পর পর কয়েকটা খতম করা হয়। যাদের খুন করা হয়, তারা সকলেই যুবলীগের সদস্য এবং পার্টি ক্যাডারদের হত্যা করার জন্য দায়ী ছিল। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বড় ধরনের ঘটনা ঘটাতে হবে। এইজন্য এই বৎসর জানুয়ারী মাসে রাতের বেলায় সাধুহাটি ফার্মের ধান লুট করা হয়। প্রায় তিরিশটা গ্রামের কৃষক এতে অংশগ্রহণ করেন। সারারাত পার্টির গেরিলারা সশস্ত্রভাবে রাস্তার দুই দিক পাহারা দেয় এবং রক্ষীবাহিনী আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্যও প্রস্তুত থাকে।'

এবার পাবনা জেলায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কিভাবে সশস্ত্র কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। যশোর জেলার মত পাবনা জেলাতেও শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ছিল। এই কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল তদানিন্তন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন)। এই জেলাতেই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শাহপুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শাহপুর সম্মেলন কৃষকদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। পাবনা জেলায় লাল টুপি পরিহিত কৃষক কর্মীরা অনেক বড় বড় আন্দোলনও সৃষ্টি করেন। কয়েকটি অঞ্চলে তারা অন্যায় হাট তোলা বন্ধ করেন এবং তোলা হ্রাস করাতে বাধ্য করেন। কয়েক জায়গায় পার্টির কর্মীরা স্থানীয়ভাবে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হয়। কিন্তু এরপর আসে চারু মজুমদারের শ্রেণী-শত্রু খতমের লাইন। তখন গণসংগ্রামের লাইন পরিত্যাগ করা হল।'

'......বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, নকশাল এলাকায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ হয়। পাবনায় পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, দখল নিয়ে সরে যেতে হবে। তারা রাজশাহী আত্রাই অঞ্চলে সরে যান। সেখানে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পার্টির অপর নেতা ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে এক বাহিনী গড়ে উঠেছে। আত্রাই অঞ্চলে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চারু মজুমদারের লাইনে খতমের কাজ কম হয়েছে। কিছু প্রকাশ্য বিচার করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু পাবনার দল যোগ দেবার পর সেখানেও পুনরায় খতমের লাইন নেওয়া হল। স্বল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক "শ্রেণীশত্রু" খতম করা হল। ১৯৭২-এর এপ্রিল মে মাসে আত্রাই এলাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঘেরাও করে ফেলে। কয়েকদফা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। পার্টির বাহিনী এই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে পার্টির নেতা আবদুল মতিন ও ওহিদুর রহমান গ্রেফতার হয়ে যান। ১৯৭৫ সালে পার্টি চারু মজুমদারের লাইন পরিত্যাগ করে। বর্তমানে ঐসব অঞ্চলে পার্টির কোন

সশস্ত্র তৎপরতা নেই। ঐ অঞ্চলের পার্টির এক নেতা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, "শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন জনগণ গ্রহণ করেনি। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকে জনগণ সমর্থন করেছেন।"

'অন্যান্য বাম দলের মতো জাসদের উপরও চরম সরকারী নির্যাতন আসে। প্রথম থেকেই জাসদের বহু কর্মী বেসামরিক সশস্ত্র মুজিববাদীদের হাতে নিহত হন। তাছাড়া রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হন জাসদের কর্মীরা। প্রধানতঃ সশস্ত্র মুজিববাদীদের আক্রমণকে সশস্ত্রভাবে প্রতিহত করা দরকার এই চিন্তা থেকেই জাসদ তার সশস্ত্র অঙ্গ গড়ে তোলে। ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুন জাসদ তদানিন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করলে রক্ষীবাহিনী গুলী করে এবং অনেকে হতাহত হন। এই ঘটনার পর সশস্ত্র কার্যক্রমে যাওয়ার চিন্তা আরও বেশী করে আসে।'

(মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম : পৃষ্ঠা ১৬৩—১৬৮)

মুজিব আমলের সন্ত্রাস সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে রেজোয়ান সিদ্দিকী তার 'কথামালার রাজনীতি' গ্রন্থে যে বর্ণনা দেন তার কিছু অংশ বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরছি :

'সরকার প্রধানের সম্পূর্ণ বিরোধিতার মুখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করা হয়। মেজর (অবঃ) এম এ জলিল ১৯৭১ সালের মুক্তি-যুদ্ধে অংশ নেন। ভারতীয় বাহিনী এদেশ থেকে কল-কারখানা ও সমরাস্ত্র ভারতে নিয়ে যাবার সময় মেজর জলিল বাধা দেন। ফলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে গ্রেফতার করেন। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে আটই মার্চ বরিশাল শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় এবং তার মুক্তি দাবী করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৭ই মার্চ (৭২) সরকার জানান যে, 'তার বিরুদ্ধে কতিপয় মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো সামরিক আইন মোতাবেক অপরাধের সমতুল্য।" যাই হোক। জনমতের চাপে অবশেষে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন অন্যতম সেক্টর কমান্ডার।'

এ সময় বিভিন্ন বেসামরিক বাহিনীর তৎপরতা বাড়তে থাকলো। ৯ই সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তৎকালীন প্রধান আবদুর রাজ্জাক বললেন, "আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিশ্বের নবতম মতবাদ মুজিববাদ বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" বাহিনীর জেলা প্রধান ও উপ-প্রধানদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, "প্রতিটি ইউনিয়ন লাঠিসহ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দেয়া হবে। তারপর ট্রেনিংও শুরু হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ একলাখ সদস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়ে গঠন করে লালবাহিনী। ১লা মে ('৭২) লালবাহিনীর জঙ্গী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, ৭ই জুন থেকে তারা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। এই অভিযানের জন্য তারা গ্রেফতার, মারপিট, আটক রাখা, শাস্তি দেয়া প্রভৃতি ক্ষমতার জন্য ৪ঠা জুন ('৭২) সরকারের কাছে দাবী জানান। ক্ষমতা কত দূর পর্যন্ত দেয়া হয়েছিলো সে খবর জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার সাতদিন পর খুলনায় লালবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায় আরও অনেক অঞ্চল থেকে। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা সাধারণ মানুষের ওপর চালাতে থাকে অকথ্য নির্যাতন। অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, সে সময় আওয়ামী লীগের বি-টিম বলে নিন্দিত ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে "বিভিন্ন দলীয় বাহিনীর নামে বেআইনী কার্যকলাপ" বন্ধ করার দাবী জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "কোনো কোনো দলের স্বেচ্ছাসেবক বা অন্যান্য বাহিনী বেআইনী কার্যকলাপ ও নানা রকম দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছে। ক্ষমতাসীন দল ও তার সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এসব বাহিনী দলীয় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখছে না। তারা সরকারী প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, কোথায়ও আবার সান্ধ্য আইন জারি করে তল্লাশী চালায়, আদালত প্রতিষ্ঠা করে বিচারে প্রহসন, নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার ও জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং সরকারী পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা উপরোক্ত বেআইনী কার্যকলাপের সম্মুখে রহস্যজনক

ভাবে নিশ্চুপ রয়েছে।" তিনি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান।"

'মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের মধ্যে আওয়ামী লীগ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। অবশ্য এই শাসনতন্ত্রের কোথায়ও মুজিববাদ সম্পর্কে কোনো কথার উল্লেখ ছিল না। তা হলে কি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তার পরেও মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার কথা কেবল জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যেই বলা হচ্ছিল।'

ইতিমধ্যে সারা দেশে বিরোধীদের ওপর চলতে থাকে হয়রানি নির্যাতন। আওয়ামী লীগে আশ্রয় গ্রহণ করেও মোজাফফর ন্যাপ কর্মীরা এই হয়রানি থেকে রেহাই পায়নি। '৭২ সালের ৮ই জুলাই মোজাফফর ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, 'ন্যাপ কর্মীরা দুর্নীতি, অরাজকতা ও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণের পর বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনযন্ত্র তাদের গ্রেফতার ও হয়রানি করছে। স্বার্থান্বেষী মহল ন্যাপ অফিসে হামলা চালাচ্ছে ও কর্মীদের জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছে।'

'৭২ সালের পল্টনের আয়োজিত এক জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের উদ্দেশেও মোজাফফর আহমদ বলেন, '......আপনি ভাত দিতে পারবেন না, তবে কিল মারার গোসাই কেন? চোখ থাকতে দেখছেন না, কান থাকতে শুনছেন না কেনো? দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আড়তদার, মজুতদার, মুনাফাখোর, দুর্নীতিবাজ দালাল কর্মচারীর শাস্তি দেয়া হয়নি কেনো? শুধুমাত্র কয়েকটি ভালো ভালো কথা ও ঘোষণা ছাড়া সত্যিকারভাবে জনগণ কি পেয়েছে?' সেদিনের জনসভায় ভাষণে মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'বাইশ পরিবারের বদলে ২২শ' পরিবার গড়ে তোলা হচ্ছে।'

২রা জানুয়ারী ('৭৩) ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংগঠন মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ঘোষণা করলেন, "আওয়ামী লীগের ছাত্র হত্যা ইয়াহিয়া-মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপের নামান্তর। আমরা দেশবাসীর দাবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবী করছি।" তিনি বলেন, "নুরুল আমিন সরকারের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটেছিলো, শেখ মুজিবের সরকারের ভাগ্যেও সেই পরিণতি অনিবার্য।"

৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, "দরকার হলে আরও রক্ত দেবো। তবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবোই।" ঐ সভায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন। ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রত্যাহার করে সাবধান করে দেন যে, "সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে আর 'জাতির পিতা' ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।" তিনি বাড়িতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলার আহ্বান জানান। ঐ দিনই বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মনি সিং বলেন, "বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

'৩রা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহীদুল ইসলাম "বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তি উচ্চারণের জন্য" ন্যাপ (মোজাঃ) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেন।' তিনি বলেন, "যদি ক্ষমা না চাওয়া হয় তাহলে জনতা ৭ই জানুয়ারীর পর থেকে বাংলার মাটিতে ন্যাপ (মোজাঃ) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কোনো জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। ঐ সভায়ই শেখ শহীদ বলেন, "যেসব লোক মন্ত্রী হবার খায়েশ এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য সরকারের কাছে শতবার তোষামোদ করেছেন, তারা এবং তাদের ছত্রছায়ায় থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আজ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করছে, তিনি ঘোষণা করেন যে, আজ বৃহস্পতিবার (৪ঠা জানুয়ারী)

থেকে যে পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নামের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না, সংগ্রামী জনতা বাংলার মাটিতে সেই পত্রিকার অস্তিত্ব রাখবে না।" তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করা হয়েছে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য কারও নেই। বর্তমান ডাকসু যেহেতু ছাত্র সমাজের মতবিরোধী কাজ করেছে এবং তাদের আস্থা ও ভালবাসা হারিয়েছে, তাই এই ডাকসু বাতিল। ছাত্রনেতারা এই তৎপরতাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে ডাকসু অফিসও তছনছ করে ফেলা হয়।'

ঐ দিনই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলার দায়ে এক ব্যক্তির কান কেটে দেয়া হয়েছে। পরদিন ঐ পত্রিকা খবর দেয় যে, একই কারণে রংপুরে দু'ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

'এরপর ৫ই জানুয়ারী পল্টনে ছাত্রলীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ছাত্রলীগ নেতারা শ্লোগান দেন যে, "রব-ভাসানী-মোজাফফর-বাংলার তিন মীরজাফর।"

'৬ই জানুয়ারী গোপালগঞ্জের এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচনের প্রাক্কালে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে ও আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। চরম দুঃখের দিনগুলোতে এসব লোককে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। তারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। দেশের উন্নয়নের জন্য যাতে বিদেশ থেকে কোন সাহায্য না আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, ওরা বিশ্বে বাঙালী জাতির মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করেছে।'

'৬ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ন্যাপের মোজাফফর আহমদ তাদের ৭ই জানুয়ারীর প্রস্তাবিত প্রতিবাদ জনসভা বাতিল ঘোষণা করেন। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি ভয় পেয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মওলানা ভাসানীকে

'শেখ মুজিবের দালাল বলে অভিহিত করেন। তিনি তার দলকে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল বলে দাবী করেন এবং গণতান্ত্রিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের দাবী জানান। তবে ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আর বাংলাদেশ সরকারের পদত্যাগ দাবী করেননি। ভিয়েতনামের প্রশ্ন তোলেননি, এবং ছাত্র হত্যারও বিচার চাননি।'

'এরপর আওয়ামী লীগের সঙ্গে মোজাফফর আহমদের ন্যাপ ও মনি সিংয়ের কমুন্যনিস্ট পার্টির একটি আপোসের জন্য শেষোক্ত দুই দল নানা মহলে লবি করতে থাকেন। এবং তারই এক পর্যায়ে ২২শে জানুয়ারী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তার বক্তব্য ও তৎপরতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে আসেন। একই দিন মনি সিং জিল্লুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আপোস আলোচনা করেন। কিন্তু নিহত ছাত্র মতিউল ও কাদেরের হত্যার তদন্ত রিপোর্ট বাকশালে ঐ দু'দলের যোগদানের পরেও ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অনেকেই বলেছেন আপোসের শর্ত হিসেবে তারা ঐ হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

'১৯৭২ সালের ১১ই নভেম্বর মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী যুবলীগ। নূরে আলম সিদ্দিকীও যোগ দেন এই যুবলীগে।'

নির্বাচনী প্রচারণা চলতে থাকে। মোজাফফর আহমদের ন্যাপ ও মনি সিংয়ের কমুন্যনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গঠনের বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

'১লা জানুয়ারীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বলে অভিহিত করতে থাকে। ২০শে জানুয়ারী নবগঠিত যুবলীগের সভায় 'বিরোধীদের নির্মূল করার' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।'

'নির্বাচন সম্পর্কে লীগ নেতারা বলতে শুরু করেন যে, এই নির্বাচন হবে মুজিববাদের ওপর ম্যান্ডেট। ২রা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নেতা

জিল্লুর রহমান বলেন, "নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মুজিববাদের ওপর রায় চাইবে।" ২০শে ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। তাতেও তারা মুজিববাদের পক্ষে রায় চায়। কিন্তু সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই ছিল যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও, সংবিধান প্রণয়ন করেও মুজিবাদ প্রতিষ্ঠায় বাধা কোথায় ছিল। ফলে এই মুজিববাদের শ্লোগান কেবল শ্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করতে থাকে আওয়ামী লীগ।'

'ইতিমধ্যে সারাদেশ থেকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের খবর আসতে থাকে। ৪ঠা মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে যে, "ক্ষমতাসীন দল ত্রাস সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রিত দল ও একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা করছে। ন্যাপনেত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩রা মার্চ ঢাকার এক জনসভায় বলেন, গত এক বছরে অবাধ লুটতরাজ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর রিলিফ চুরির বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ এবার 'বঙ্গবন্ধু'কে একমাত্র পুঁজি করে জনতার কাছে ভোট চাইতে এসেছে। একদিকে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে আজও 'সামনে আছে জোর লড়াই বঙ্গবন্ধু অস্ত্র চাই' বলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। এর নাম কি গণতন্ত্র ?'

'৫ই মার্চ দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় "নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে বেসামাল মুজিববাদীরা গতকাল রোববার (৪ঠা মার্চ) সন্ধ্যায় আবার তারাবো বাজারে ন্যাপের নির্বাচনী প্রচার মিছিলের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড স্টেনগান ও পিস্তলের গুলী ছোড়ে। তারা স্থানীয় ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র, পোস্টার, আসবাবপত্র, লুটপাট ও তছনছ করে এবং ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন অফিসসহ দু'টি কুঁড়েঘরের প্রতীক (উল্লেখ্য, ন্যাপের নির্বাচনী প্রতীক ছিল কুঁড়েঘর) অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। মুজিববাদীরা জনৈক ন্যাপ কর্মীর দোকানও লুট করে এবং কর্মচারীদের মারধোর করে। ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনে 'সংবাদ' পত্রিকার মালিক-সম্পাদক আহমদুল কবিরও ন্যাপের একজন প্রার্থী ছিলেন।'

'৭ই মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।'

নরসিংদীতে হতাহতের ছ...

পল্টনে প্রকাশ্যে নিহত হাসান ওয়ায়েসের ছবি

...নিহত জাসদ নেতা এডভো...
মোশাররফ হো...
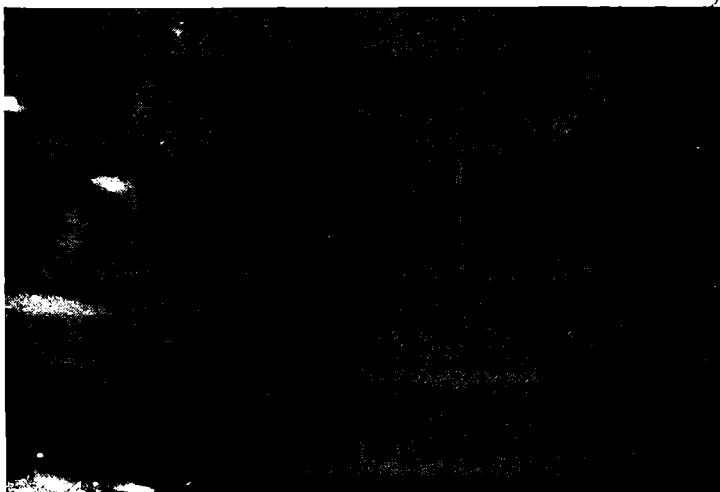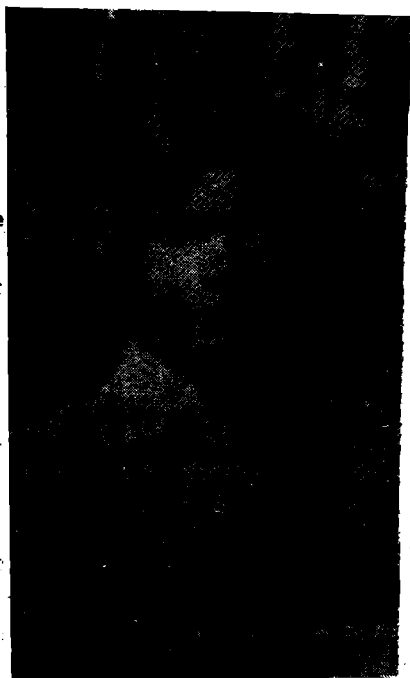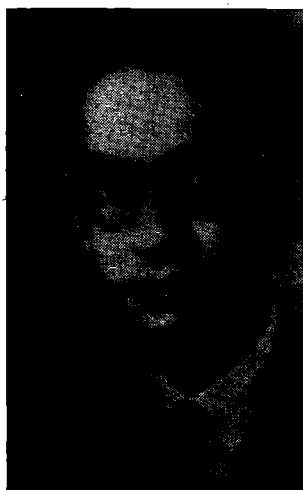
'নির্বাচন সম্পর্কে' দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক গণকণ্ঠের প্রতিবেদনে সন্ত্রাস, গুন্ডামি, নির্যাতন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্ট প্রহৃত, অপহৃত, খুন প্রভৃতি খবর দেয়। ৮ই মার্চের দৈনিক সংবাদ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের শিরোনাম ছিল : 'সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই'; 'পটুয়াখালীতে ব্যালট পেপার ছিনতাই'; ঘটনাস্থল চট্টগ্রাম : ৩১ খানা ব্যালট পেপারসহ ২ ব্যক্তি গ্রেফতার'; ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী সন্ত্রাস চালিয়েছে : আমেনা'; ঢাকা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রসহ দেশের নানা স্থানে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন দারুন অবাধ হয়েছে, একজনে একাধিক ভোট অবাধে দিতে পেরেছে', 'জাসদ-এর দু'জন হাই জ্যাক', 'ঢাকায় একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ'', 'একটি কেন্দ্রে গুলী', পটিয়ার ভোট সশস্ত্র লোকেরাই দিয়েছে ?' 'কুমিল্লা শহরের ব্যাপক সন্ত্রাস : নির্বাচন প্রহসনে পরিণত'; 'কালীগঞ্জেও সন্ত্রাস চলেছে', 'রাজশাহীর ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস', 'ভোটনাট্যের দু'টি দৃশ্য', প্রভৃতি।'

৯ই মার্চ ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন :

'কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতির দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসকদল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী প্রার্থীদের জোড় করে পরাজিত করেছে। ......ঐ সকল আসনে শাসকদল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপ-ব্যবহার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ভয়ভীতি, সন্ত্রাস প্রয়োগ, গুন্ডাবাহিনী ব্যবহার, ভূয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশী সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারী গাড়ী ও রেডক্রসের গাড়ীর অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচন কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনের পরিণত করেছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের জোরপূর্বক পরাজিত করেছে।'

'৯ই মার্চ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদ সভাপতি মেজর (অবসর প্রাপ্ত) এম, এ জলিল বলেন :

"প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রচলিত কোনো

ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না রেখে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, এতে তাকে আমি জাতির পিতা বলতে ঘৃণাবোধ করি।"

তিনি বলেন, "নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গণনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দমত হিসেব অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।"

"জাসদ সভাপতি মেজর জলিল আওয়ামী লীগ সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের তাঁবেদার বলে অভিহিত করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়কে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াং কাইশেকের বিজয়ের সংগে তুলনা করেন।"

৯ই জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে ভাসানী ন্যাপের তৎকালীন সহ-সভাপতি ডঃ আলীম আল রাজী বলেন, "ক্ষমতাসীন সরকার এক দলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূয়া ভোট প্রদান, বিপুল অর্থ ব্যয়, বেতার টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। বিরোধী দলগুলো ও জনসাধারণ যাতে বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী-নীলবাহিনীর হাতে বিপুল অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধাণকে হয়রানি করেছে।"

'তিনি বেতার টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যম সরকারী দলের দলীয় স্বার্থে যদৃচ্ছা ব্যবহারের উল্লেখ করে একে "বেবিলনিয়ান ক্যাপটিভ প্রেস" বলে অভিহিত করেন। জানুয়ারীতে দু'জন ছাত্র হত্যার কথা উল্লেখ করে ডঃ রাজী বলেন, ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন সরকার যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, দু'শ বছরের ইতিহাসে তার নজির নেই।'

তিনি বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টিতে আওয়ামী লীগকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, মোজাফফর ন্যাপের সুরঞ্জিত সেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একজন এবং অপর ক'টি আসনে নির্দলীয় প্রার্থীরা জয়লাভ করেন।

'চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্র থেকে প্রথম মোজাফফর ন্যাপের মোশতাক আহমদ চৌধুরীকে জয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সব ক'টি বিরোধী দল এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। মোশতাক আহমদ চৌধুরী এই নির্বাচনে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রীট আবেদন করেন।'

'১০ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময়, নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর তার নির্বাচনী এলাকা ধামরাইয়ে সংঘটিত 'আওয়ামী লীগ, ছাত্রনেত কর্মী ও রক্ষীবাহিনীর সার্বিক সন্ত্রাস'কে "দুঃসপ্নের কালরাত্রি" বলে অভিহিত করেন।'

'১১ই মার্চ যুবলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "৭ই মার্চের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তারা রাজাকার, আলবদর। স্বাধীনতার শত্রু এইসব বিদেশী চরদের মুজিববাদের নিড়ানি দিয়ে উৎখাত করা হবে।" পরদিন বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শেখ ফজলুল হক মনি মুজিববাদ বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন।'

'এই যুদ্ধ ৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকে।'

'এই সময় ১৯৭৩ সালের ১৫ই মে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী "দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এ সরকারী নির্যাতনের" বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন। একই সময় ১৭ই মে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলে গঠন করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এটিই সম্ভবত বাকশালের সঙ্গে মস্কোপন্থীদের বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রথম আলামত। মওলানা ভাসানীর অনশনকে কেন্দ্র করে তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক

সহ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, হবু মন্ত্রীরা মওলানা ভাসানীকে আর একদফা "সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, রাজাকারদের দালাল ও দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার চক্রান্তকারী" বলে অভিহিত করতে শুরু করেন। মওলানার ডাকে ২১শে মে সারা দেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ বলে হরতাল হয়নি। সংবাদপত্রে রিপোর্ট বের হয় যে, "গাড়ি কিছু চলছে, তবে তাতে কোন ভিড় ছিল না, এবং সেগুলো কোথাও থামেনি। বাজার বসেছিল কিন্তু কোন লোক আসেনি। দোকান দু'একটি খোলা ছিল কিন্তু কোন ক্রেতা ছিল না।" সেদিনই ভাসানী ন্যাপ নেতা কাজী জাফর আহমদ অভিযোগ করেন যে, "মুজিববাদীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে।"

'এ সময় (১৯৭৩-মে) রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন বাড়তে থাকে। জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে বিভিন্ন স্থানে। ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন নোয়াখালীর মাইজদীতে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষ ঘটে। শহরবাসীরা এই হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন। ৯ই জুন মাইজদীতে ঐ হামলার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। ঐ দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনার তদন্ত করতে যান।'

'তারপর ১০ই জুন '৭৩ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল ঘোষণা করলেন যে, "মাইজদীর ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।" কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে খবর খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। জানতে পারেননি এদেশের নির্যাতিত জনগণ।'

ঐ ১০ই জুনই, বায়তুল মোকাররমে মনি সিংয়ের কম্যুনিস্ট পার্টির এক সমাবেশে দলের সভাপতি মনি সিং উচ্চকন্ঠে বলেন: "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনের নেতৃত্বে এবং তাদের সহযোগী ভাসানী ন্যাপ, উগ্রপন্থী জাসদ, মুসলিম লীগ ও জামাতপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।"

'তারপর ১৯৭৩ সালের ১৯শে জুন ঢাকার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণা জারি করেন যে, শহরে অতঃপর আর বিনানুমতিতে মাইক

ব্যবহার করা যাবে না। মাইক ব্যবহারের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সুস্পষ্টভাবে বিরোধী দলের জনসভা অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা। মোজাফফর ন্যাপ বা সিপিবি এর কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং ২৪শে জুন মোজাফফর ন্যাপের সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, "তার দল বাস্তব অবস্থাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।" ঐ জনসভায়ও তিনি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে 'সাম্রাজ্যবাদের চর' বলে অভিহিত করেন।'

২৯শে জুন চট্টগ্রামে ঘটে আর এক ঘটনা। 'চট্টগ্রামের ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাসের ওপর রক্ষীবাহিনীর গুলীবর্ষণে নিহত হয় একজন। আর গুরুতর আহত হয় দু'জন। ইস্টার্ন রিফাইনারীর শ্রমিকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। ঘটনাটি ছিল সামান্য। রিফাইনারীর একটি বাস কর্মচারীদের রিফাইনারীতে নিয়ে যাবার পথে রক্ষীবাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। তাতে ক্রুদ্ধ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা একটি রেল ক্রসিংয়ের মুখে ঐ গাড়ি ঘেরাও করে গুলীবর্ষণ করে। এমনি সামান্য ছুতোতেই রক্ষীবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে এদেশের সাধারণ মানুষকে। এই সময় দৈনিক বাংলার কলামিস্ট নির্মল সেন (অনিকেত) মার্চের নির্বাচনের ক'দিন পরে লিখেছিলেন, "আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ। ঐ লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১৩টি হত্যার। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পেঁছে না। সব খবর পেঁছে না থানায়। দূর দুরান্ত হতে কে দেয় কার খবর। আর খবর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা ক'জন রাজী?" লুটেরা বলে, রাজাকার বলে, খুনী বলে এই নির্বিচার হত্যা-কান্ডের প্রতিবাদ করে নির্মল সেন জানতে চেয়েছিলেন, (১) ১৯৭২ সাল হাত আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক'টি হত্যাকান্ডের কিনারা হয়েছে। (২) ক'জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে। (৩) ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে। সে হাইজ্যাকার কারা। কি তাদের পরিচয়। কি তাদের ঠিকানা। (৪) যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (৫) পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের

ধরা হলে ফোনের জন্য মুক্তি দিতে হয়। এই অভিযোগ কতটুকু সত্য। এই ফোন কারা করে থাকেন। তিনি বলেন, "খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা রাহাজানির খবর বের হয় অথচ একটি প্রাণীরও শাস্তি হয় না—এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে।" এ প্রশ্ন এদেশের জনগণেরও ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি।"

'চট্টগ্রামের রিফাইনারীতে গুলিবর্ষণের ও অকারণ হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীর কেউ সাজা পেয়েছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই রাষ্ট্রপতির অগণতান্ত্রিক ৫০ নম্বর ধারা অনুসারে রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হয় নতুন ক্ষমতা। তাতে "জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরিস্ত সকল অফিসারকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া করেছে সন্দেহ যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা" দেয়া হয়।

২০শে জুলাই ভাসানী ন্যাপের ভাইস-চেয়ারম্যান ডঃ আলীম আল-রাজী রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ বাতিলের দাবী করেন। তিনি বলেন, ও ধারায় যথেচ্ছ প্রয়োগ করে বিরোধীদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা হচ্ছে। ১৪ই আগস্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল সেন ঐ ধারার প্রতিবাদ করেন। এমনকি ১৯৭৩ সালের ১৮ই অক্টোবর সংসদে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত ইত্তেফাক সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এই আইনে গ্রেফতারের বিধান আছে কিন্তু জামিনের বিধান নেই। ফলে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের বিদ্বেষই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে অনেকেই দুষ্কৃতকারী হচ্ছে।" দেশে '৫০ নং আদেশের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে' বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনিও ৫০ নং আদেশের সংশোধনী দাবী করেন।"

'সে সময় ৪ঠা অক্টোবর সংসদে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল বললেন, রাজনৈতিক কারণে কাউকে আটক করা হয়নি।' এদিকে ২৯শে সেপ্টেম্বর

জনাব উকিল ঘোষণা করেন যে, 'থানায় থানায় দুর্বৃত্তের তালিকা তৈরী হচ্ছে। সারা দেশ থেকে দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করা হবে। তার কয়েকদিন পর ১২ই অক্টোবর বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করেন যে, 'থানায় থানায় রক্ষীবাহিনী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি করছে।'

'এরপর ১৪ই অক্টোবর ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের (মনি-মোজাফফর-আওয়ামী লীগ) ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে বলা যে, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ গঠন, দেশের সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষা, দুষ্কৃতকারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, মজুদদার, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতার শত্রুদের উৎখাত করার ক্ষেত্রে এই তিনটি দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে যাবে। তাতে নির্ধারিত হয় যে, জোটের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা থাকবে ১১ জন, মোঃ-ন্যাপের ৫ জন এবং মনি সিংয়ের কম্যুনিস্ট পার্টির ৩ জন। ১৫ই অক্টোবর ন্যাপের মোজাফফর আহমদ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার মিঃ সুবিমল দত্তের সঙ্গে দেখা করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর ২১শে অক্টোবর ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। তাতে আওয়ামী লীগের জিল্লুর রহমান হন আহ্বায়ক। মোজাফফর আহমদ আর মনি সিং থাকেন ঐ কমিটিতে। ইতিমধ্যে ১৮ই অক্টোবর জাতীয় লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, দুষ্কৃতিকারী আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলীয় কর্মীদের ওপর পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চলছে। সরকার দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূলের নামে সরকারী দলের লোকদের কাছে অস্ত্র দিচ্ছেন—এটা উদ্বেগজনক। এ পদক্ষেপ দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২১শে অক্টোবর অভিযোগ করে যে, তাদের রাজবাড়ী জেলা শাখার সম্পাদককে গ্রেফতার করে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে, ২৪ তারিখে অভিযোগ করে যে, বাগমারীর জাসদ নেতাকে রক্ষীবাহিনী খুন করেছে। একই অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যজোটের আশ্রয়গ্রহণকারী মোজাফফর ন্যাপ। ১৬ই অক্টোবর পাবনার ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকে রক্ষীবাহিনী গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে 'জেলা ন্যাপ কমিটি একটি বিবৃতি দেয়। ২রা নভেম্বর

মো-ন্যাপের সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন যে, তার "কর্মীদের ওপর রক্ষীবাহিনীর হামলা, হত্যা, নির্যাতন চলছে।" তিনি বলেন, "১লা নভেম্বর সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রধান ন্যাপকর্মী বংকু দাশকে রক্ষীবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পীরগাছায় ন্যাপ কর্মীদের নির্বিচারে মারধোর করা হয়েছে। ৩১শে অক্টোবর নাটরের ন্যাপ কর্মীকে রক্ষীবাহিনী অপহরণ করেছে।" সেই সাথে পংকজ ভট্টাচার্য অনুনয় করে বলেন যে, "এদের ওপর হামলা হলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।"

'আর আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে বিরোধীদের দমনের জন্য অস্ত্র দেয়া শুরু হয় তখন থেকেই। '৭৩ সালের ২৪শে অক্টোবর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (পরে আওয়ামী লীগের নানা গ্রুপে আশ্রয় গ্রহণকারী) জনাব আবদুল মালেক উকিল জানান যে, "গ্রামরক্ষী দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককে একটি করে শটগান দেয়া হবে। কাজের মেয়াদ শেষ হলে এসব অস্ত্র থানায় জমা দেয়া হবে।" তিনি আরও পরিষ্কার করে বলেন যে, "এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এমপির সাথে আলোচনা করে গ্রামরক্ষীদল গঠনের জন্য ওসির প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'এরপর ২৯শে নভেম্বর ('৭৩) সরকারের অস্ত্র সংক্রান্ত এক ঘোষণায় বলা হয় যে, "রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রী এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যরা লাইসেন্স- ছাড়াই নন-প্রহিবিটেড বোরের অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।" এর বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও এই সিদ্ধান্ত থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটিয়েছিল।'

'১২ই নভেম্বর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। সেখানে মনি সিং বলেন, "ঐক্যজোটের ঘোষণায় যাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ভাসানী ন্যাপ ও জাসদসহ) আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতা লাভ করতে

পারি, তাহলে দেশে বিপ্লবের বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে। এটি আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য।" ৭ই ডিসেম্বর ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা করে যে, সকল সমাজ বিরোধীকে নিশ্চিহ্ন করে সমাজতন্ত্রের পথ বাধামুক্ত করা হবে। সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।'

'ইতিমধ্যে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সরকারী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসে। লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয় জনসাধারণ। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়। চার মাসে সরকার ৬৩ কোটি টাকা ছাড়ে বাজারে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সরকারের। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর "দুষ্কৃতিকারীদের" সঙ্গে গুলী বিনিময়ের পর পুলিশ ৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে ছিল প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শেখ কামালও। তখন পুলিশ জানায় "দুষ্কৃতিকারীদের তাড়া করার সময় এরা আকস্মিকভাবে গুলীবিদ্ধ হন।" ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে রেল, পাটকল, বিদ্যুৎ, বিআরটিসি, স্বাস্থ্য দফতর, নৌ-পরিবহণ কোম্পানী প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দেন।'

'সেই সময় ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মালেক উকিল ঢাকার কমলাপুরে এক জনসমাবেশে বলেন যে, "দেশের আইন শৃংখলা রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে অস্ত্র দেয়া হবে।" কত অস্ত্র এই সেবকদের দেয়া হয়েছিল দেশবাসী ৩০ হাজার দেশপ্রেমিকের প্রাণের বিনিময়েও সে খবর জানতে পারেনি।

'বাকশালের প্রাথমিক পর্ব' সম্ভবত ১৯৭৩ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ১৯৭৪ সালে শুরু এর ব্যাপক প্রস্তুতি পর্ব। '৭৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী জাসদ ঘোষণা করে যে ২০শে জানুয়ারী পল্টনে তারা জনসভা করবে। আওয়ামী লীগও সেই দিনই পল্টনে জনসভা ডাকে। এ নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক নির্দেশে ১৪ই জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করেন। পরে তা অনির্দিষ্টকাল বাড়িয়ে দেয়া

হয়। ২০শে জানুয়ারী রাজশাহীতেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪ই জানুয়ারী জাসদ এই ১৪৪ ধারা জারির তীব্র নিন্দা করে এবং এই ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। ১৬ই জানুয়ারী জাসদের ঢাকা নগর শাখার সহ সম্পাদক অপহৃত হন। ১৮ই জানুয়ারী জাসদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করার চেষ্টা করে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে, লাঠি চার্জ করে এবং বহু লোককে গ্রেফতার করে। জাসদের ডাকে ২০শে জানুয়ারী '৭৪ ধর্মঘট পালিত হয়। বিকেলে তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এক বিরাট জঙ্গী মিছিল বের করে। পল্টনে সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তারা মিছিলের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। পরদিন এক সরকারী প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয়, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ঐ প্রেসনোটের পাশে দৈনিক ইত্তেফাক সচিত্র খবর পরিবেশন করে যে, পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং দু'জনের অবস্থা গুরুতর। চিত্রে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের রক্ষীবাহিনী বায়তুল মোকাররমের ভেতর গিয়েও হামলা চালাচ্ছে। জাসদ দাবি করে যে, তাদের এক হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২রা ফেব্রুয়ারী '৭৪ জাসদের সহ-সভাপতি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে নিহত হন।

এই সময়ে '৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে। সংসদের স্পীকার হন আব্দুল মালেক উকিল। এই অধিবেশনেই মোহাম্মদউল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২৮শে জানুয়ারী আব্দুল মালেক উকিলের স্পীকারত্বের সময় প্রথম যে আইনটি তিনি কণ্ঠ ভোটে পাস করেন— তা'ছিল রক্ষীবাহিনী বিল। বিলটি উত্থাপন করেছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। বিলটিই প্রমাণ করে তা' কতটুকু গণবিরোধী ছিল। এতে রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার, তল্লাশী ও আটক করার ক্ষমতা দান করা হয়। উকিল সাহেব বিলের ওপর বিরোধী দলের বক্তব্যের কিছু অংশ প্রসিডিংস থেকে বাদ দেয়ার কথা ঘোষণা করলে বিরোধী সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এই ওয়াক আউটের নিন্দা করেন।'

'ইতিমধ্যে ১৭ই মার্চ ('৭৪) পল্টনে জাসদ এক জনসভার ডাক দেয়। জনসভার পর জাসদ সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে যায়। সেখানে পুলিশের গুলীতে সরকারী হিসেবে নিহত হয় ৬ জন,

আহত হয় শতাধিক। জাসদ দাবি করে ঐ গুলীবর্ষণের ফলে তাদের ৫০ জন কর্মী নিহত হয়। সেখান থেকে আ, স, ম, আব্দুর রব সহ জাসদের প্রায় সব নেতাই আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। জাসদের ঐ মিছিলে রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। সেদিনই সরকার জাসদের মুখপাত্র দৈনিক গণকন্ঠ পত্রিকার সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিককেও গ্রেফতার করেন। ফলে পর দিন গণকন্ঠ প্রকাশিত হতে-পারেনি।

মোজাফফর ন্যাপ জাসদের এই মিছিলকে হঠকারী ও উস্কানীমূলক বলে অভিহিত করে এর নিন্দা করে। সিপিবি বলে, জাসদ অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টায় মেতেছে। মনি সিং জনগণের কাছে এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করার আহবান জানান।'

'ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে ১৯৭৪ সালের ৫ঠা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে ৭ জন ছাত্র নিহত হয়।'

'২রা জুলাই তারিখে মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ রাখা প্রশ্নে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুর আলী বলেন, "ভাসানী নিরাপত্তার জন্য পুলিশ চেয়েছেন।" মন্ত্রী বলেন যে, "দেশের যে কোনো সাংবাদিক সন্তোষে গিয়ে ভাসানীর অবস্থা দেখে আসতে পারেন যে, তিনি গৃহবন্দী নেই।"

'তার পরদিনই দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ২রা জুলাই মওলানা ভাসানীর স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠির ফটোকপি ছাপে, ঐ চিঠিতে মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশে বলেন :

"২৯শে জুন আমার ঐক্যফ্রন্টের কর্মীদের ওপর রমনা থানার পুলিশ যে দুর্ব্যবহার এবং প্রহার করেছে, তার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দানের দাবি জানাচ্ছি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং আমাদের ঐক্য ফ্রন্ট এবং ছাত্রকর্মী ও নেতাদের আশু মুক্তি দানের দাবি জানাচ্ছি।

"২৯শে জুন দিবাগত রাত্রি আড়াইটার সময় মশিউর রহমানের বাড়িতে বহু পুলিশ ও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ঢাকার এডিসির দস্তখতযুক্ত ডিটেনশনের অর্ডার দেখিয়ে ৩০ দিনের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখার জন্য

আমাকে গ্রেফতার করে। পরে সেণ্ট্রাল জেলের রাস্তা পরিবর্তন করে সন্তোষে কড়া পুলিশ পাহারায় নজরবন্দী রেখেছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আইউব শাহীর আমলে তোমার (শেখ মুজিব) বাসার নিকট ৮ জন পুলিশ, ২ জন হাবিলদার, ১ জন সাব-ইনসপেক্টরের পাহারায় তোমাকে ধানমন্ডীতে নজরবন্দী রেখেছিল।"

"আজ তোমার আমলে সন্তোষে অসংখ্য পুলিশ, হাবিলদার এস আই, আর, আই, একজন ডেপুটি সুপার দ্বারা আমার বাসার চারদিকে ঘিরে রেখেছে; এমনকি পায়খানা পেশাবখানাও বাদ পড়েনি। আমার গরু ঘরেও পুলিশ আছে। সরকারের কোনো ঘরের ব্যবস্থা নাই। আমার মেহমান-খানা ও ছেলেমেয়ে থাকার ঘরেও পুলিশ পাহারা আছে। একজন ডিআইবি ওয়াচার আমার ঘরের দরোজার সম্মুখে (আমার বিবাহিতা মেয়ের জন্য এই ঘর) সর্বদা পাহারায় থাকে। বাহিরে ভিতরে বাসার লোকজন ডেপুটি সুপারের পারমিশন নিয়ে যাতায়াত করে। তোমার (শেখ মুজিব) আমলে আমি অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করবো এটা কল্পনাও করিনি। অদৃষ্টের পরিহাস। তাই তুমি যত শীঘ্র পার, অনুগ্রহ করে আমার বাড়ির মেয়েদের পর্দা-পুষিদা রক্ষার জন্য নিজস্ব ঘরে বা তাম্বুর ব্যবস্থা করে পুলিশ ও অফিসারদের রাখার ব্যবস্থা করবে। অথবা টাঙ্গাইল বা অন্য কোনো স্থানে আমার পরিবারবর্গসহ থাকার স্থান পরিবর্তন করার ব্যবস্থা সত্বর করবে।"

এই চিঠি যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিনই ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকার প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথামতো মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার নিতে সন্তোষে যান। তখন মওলানা ভাসানীর বাড়িতে প্রহরারত পুলিশ অফিসার একজন ফটোগ্রাফারের ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তা নষ্ট করে ফেলেন। তাদের সঙ্গে মওলানার সাক্ষাৎ করতে দিতেও অস্বীকার করেন। মওলানা ভাসানী প্রতিনিধিকে কি অবস্থায় তিনি আছেন তা দেখে যেতে বলেন। ৪ঠা জুলাই সে খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। ২০শে জুলাই সাংবাদিকরা আবার মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার তাদের জানান যে, "মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাংবাদিকদের ও রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাতের অনুমতি নেই।"

'এরপর '৭৪ সালের ১৭ই মার্চ জাসদের জনসভাকে কেন্দ্র করে ঘটে আর

একদফা হয়রানি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করতে গিয়ে বহু জাসদকর্মী নিহত ও আহত হন। 'গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮ই মার্চ জিপিও'র বিপরীত দিকে কসকর দোকানের ওপর তলায় অবস্থিত জাসদ অফিস আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। গণকণ্ঠ সম্পাদক ও অন্যান্য সাংবাদিক কর্মচারী গ্রেফতার হন। ১৯ তারিখে ডিউইজে অভিযোগ করে যে, 'সাংবাদিকদের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চলছে।' গণকণ্ঠ অফিসে আর একদফা হামলা চলে ভাসানীর জনসভাকে কেন্দ্র করে ৩০শে জুন। পুলিশ ঐ অফিসে গিয়ে পত্রিকার ফর্মা ভেঙ্গে দেয়। তারপর জুলাই মাসে মওলানা ভাসানীর পত্রিকা 'প্রাচ্য বার্তার' সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় চট্টগ্রামের 'ইস্টার্ন একজামিনার' পত্রিকা। তারপর ১৭ই ডিসেম্বর ('৭৪) সিরাজ শিকদার সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাপার জন্য ঢাকার সাপ্তাহিক 'অভিমত' পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় এর সম্পাদক আলী আশরাফের বিরুদ্ধে।' (পৃষ্ঠা ৮—২৭ ও ৩১—৫৩ এবং ৭২—৭৩)

এ সম্পর্কে হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন :

'বাগাড়ম্বর' দুর্নীতি আর সন্ত্রাস এই তিনটাই ছিল তাদের ('আওয়ামী লীগারদের'—লেখক) প্রধান বৈশিষ্ট্য—একটা ফ্যাসিস্ট পার্টি হবার জন্য যা যা দরকার। আওয়ামী লীগের বড়, মাঝারি ও নিচু স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি ব্যাপক ও সাধারণ ছিল। বাংলাদেশের জনগণের কাছে এটা আর নতুন করে বলতে হবে না। আর বাগাড়ম্বরেতো তারা সেরা। সমাজতন্ত্র, বিপ্লব—এসব বুলি তাদের লেগেই আছে। সমাজতন্ত্র শব্দটি তাদের কাছে বিশেষ প্রিয়। কারণ তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজতন্ত্র মানে এক দলীয় এক নায়কত্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত '৭২-এর সংবিধানে চমৎকার চমৎকার কথা লেখা আছে—যার এক বর্ণও তারা বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগের নেতা-উপনেতাদের শতকরা নব্বই জন দুর্নীতিপরায়ণ শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কে কত তাড়াতাড়ি কিভাবে ধনী হতে পারবে, তারই প্রতিযোগিতায় তারা ব্যস্ত ছিল। মুজিববাদীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হলো সন্ত্রাসের রাজনীতি। প্রকাশ্য হত্যা,

গুপ্ত হত্যা, গুন্ডামী এগুলো ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পগুলো ছিল হত্যাযজ্ঞের আখড়া। যশোরের কালিগঞ্জ থেকে রক্ষী-বাহিনীর ক্যাম্প উঠে গেলে সেখানে গণকবর আবিষ্কৃত হয়—যেখানে ৬০টি কংকাল পাওয়া যায়।

খাদ্যের দাবীতে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করতে গিয়ে এই ঢাকা শহরেই সাদা পোশাকধারী গুন্ডাদের গুলীতে শাহাদত বরণ করেন নূর হোসেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় রক্ষী-বাহিনীর নির্বিচার গুলীতে অসংখ্য হতাহত হন। মুজিববাদীরা বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট কারাগার ও কসাইখানা স্থাপন করে, যেখানে মানুষ জবাই হতো। মুজিব সরকার কয়েক হাজার—বাম গণতান্ত্রিক কর্মীকে হত্যা করেছে। ......মুজিববাদীদের খুনের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। সরকারই বেসরকারীভাবে মুজিববাদীদের অস্ত্র সরবরাহ করতো। কখনো পুলিশ বা মিলিটারী কর্মকর্তা বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কোন মুজিববাদীকে গ্রেফতার করলে সে বেচারার চাকরি থাকতো না। এই অবস্থার সঙ্গে ইতালী বা জার্মানির ফ্যাসিস্ট কর্মকান্ডের এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। লুইগী ভিলারী তার "ইতালী জাগছে" বইতে লিখেছেন, "ফ্যাসিস্টদের হিংসাত্মক কাজগুলি যদিও বেআইনী ছিল গিওলিত্তি হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।" ফ্যাসিস্ট ওডনপোর তাঁর 'ফ্যাসিজম' বইতে উল্লেখ করেছেন, "ফ্যাসিস্টরা অস্ত্র পেয়েছিল সেনাবাহিনীর কাছ থেকে।" আমেরিকান সাংবাদিক জে, কার্টার ১৯২১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলেন, "সারা ইতালী ব্যাপী ফ্যাসিস্টরা তার বিরোধীদের মারধর করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, অথচ সরকার নিরপেক্ষতার ভান করছে।" জি প্রেজোলিনি তাঁর 'লা ফ্যাসিজম' বইতে লিখেছেন, "তারা ফ্যাসিস্টরা সশস্ত্র বাহিনী-রূপে চলাফেরা করতে পারতো, খুশীমতো হত্যা করতে পারতো। তারা নিশ্চিত ছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করবে না।" আমেরিকান সাংবাদিক ই, এ, মোয়ের তাঁর লেখা 'ইমর্টার ইতালী' বইতে লিখেছেন "যখন হত্যা চলছে, বাড়ীতে আগুন দিচ্ছে, বলপ্রয়োগ করছে, পুলিশ তখন নিরপেক্ষ। ......সোস্যালিস্টরা যখন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে পুলিশের

কাছে নালিশ জানায়, তখন পাল্টা ওদেরই গ্রেফতার করা হয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে ওদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আর ফ্যাসিস্টরা যদি গ্রেফতার হয়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণাভাব দেখিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।" বর্ণনাসমূহ পড়লে মনে হয়, প্রত্যেকটি কথা যেন মুজিব আমলের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে লেখা।

'আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনটি প্রধান বিরোধীদল ছিল—ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ ও জাসদ। এই তিনটি দলই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ......মুজিববাদীর এই তিনটি দলেরই অফিস আক্রমণ করেছে। আওয়ামী লীগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোজাফফর ন্যাপের অফিস তারা অগ্নিদগ্ধ করেছে। তারা ভাসানী ন্যাপের অফিস বেসরকারী সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ করেছে। বলাবাহুল্য, ঘটনাক্ষেত্রে পুলিশ তাদেরকে সাহায্য করেছিল। মাওলানা ভাসানী যখন খাদ্যের দাবিতে অনশন করছিলেন, তখন ন্যাপ এই দাবীর সমর্থনে পল্টন ময়দানে জনসভার আয়োজন করে। মুজিববাদী গুণ্ডারা স্টেনগানের গুলী বর্ষণ করে সভাভঙ্গ করে দেয় এবং সভামঞ্চে অগ্নিসংযোগ করে। ...... মুজিববাদীদের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল শ্রমিক এলাকাগুলি। ...টঙ্গী থানার সামনে মেশিনগান স্থাপন করে শ্রমিক কলোনীর উপর নির্বিচারে গুলী চালানো হলো। শতাধিক নিহত হলেন। হাজার হাজার শ্রমিক বিশ মাইল হেঁটে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হন। এবং তারা তিনদিন তিন রাত পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত আকাশের নীচে অবস্থান করতে বাধ্য হন। চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ড এলাকায় মুজিববাদীরা শ্রমিক এলাকা ঘেরাও করে চতুর্দিক থেকে গুলীবর্ষণ করে এবং কলোনীতে অগ্নিসংযোগ করে। বলাবাহুল্যে, পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিলো। ......১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারী সিপিবি'র ছাত্রফ্রন্ট ভিয়েতনামের সমর্থনে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে মুজিব সরকার গুলী চালায় এবং দুই-জন শহীদ হন। সিপিবি'র উদ্যোগে সেগুনবাগিচার মোড়ে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মুজিব সরকার তা ভেঙ্গে দেয়। এর পরের ঘটনাও সবার জানা। শেখ মুজিব গুলী

মুজিববাদীদের হাতে আহত —গণকণ্ঠ
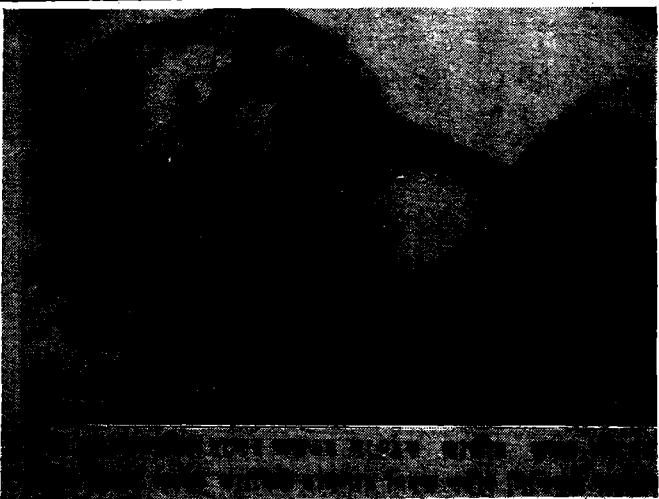
গণকণ্ঠে প্রকাশিত নিহত সিদ্দিকুর রহমানের ছবি
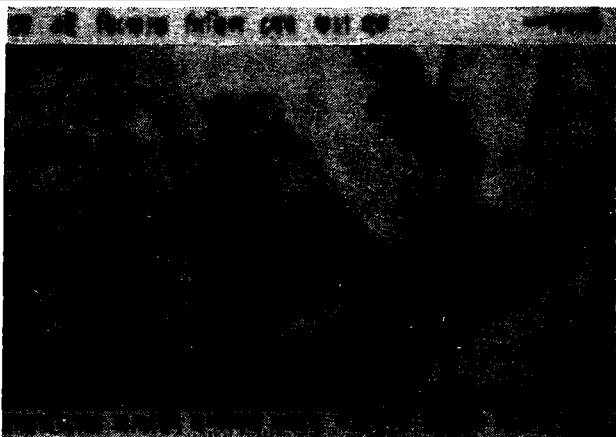
আহত মাহমুদুর রহমান মান্না

করার জন্য ক্ষমা চাননি। বরং সিপিবি নেতৃবৃন্দ 'বাড়াবাড়ি'র জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।'

(দুই দশকের বাম রাজনীতি : সংকট ও সমস্যা : হায়দর আকবর খান রনো : পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৬৯)

'১৯৭২-এর মে মাসে স্থানীয় রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলাম। আমার বিরুদ্ধে নেতৃত্বের প্রচারণার ফলেই এ ঘটনা ঘটে। কারাগারে থাকতে হয় পুরো চারটি বছর। ......'৭২-এর কারাজীবন ছিলো ভয়াবহ। 'জাতির পিতা'র মানুষের গুদাম।'

(নকুল মল্লিক : সংস্কৃতি : ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃষ্ঠা : ২৩)

'লুটের মাল ও ক্ষমতার বখরা নিয়ে মুজিববাদীদের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ, হানাহানি, মারামারি শুরু হয় তা দেশকে আরো দ্রুত অরাজকতা ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। মুজিব আমলে পাঁচজন আওয়ামী লীগ এমপি খুন হয়। তাদের মধ্যে চারজনকে আওয়ামী লীগাররাই হত্যা করে। মহসীন হলের হত্যাকান্ড ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মধ্যকার সংঘর্ষের ফল। এই হত্যাকান্ডের মূলে ছিলো ক্ষমতা ও লুটের বখরা নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরকার হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ছাত্রলীগকে "প্রেরণা" যোগাচ্ছিলো তোফায়েল ও রাজ্জাক। আর যুবলীগকে মদদ দিচ্ছিলো ক্ষমতার জন্য তোফায়েল রাজ্জাকের প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ ফজলুল হক মনি। হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হবার পর খুনীরা মহসীন হলের প্রভোস্ট অফিসে ঢুকে পড়ে এবং টেলিফোনে তোফায়েলকে জানায় যে, তাদের "ঐতিহাসিক বক্তব্য' সুসম্পন্ন হয়েছে। এই হত্যাকান্ড দেশের শিক্ষার ইতিহাসকে কলংকিত করেছে। পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে শিক্ষাঙ্গনে এ রকম নৃশংস হত্যাকান্ডের কোন নজির নেই।'

(ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই : আসহাব উদ্দিন আহমদ : পৃষ্ঠা : ৯২)

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সন্ত্রাস ও কারচুপি সম্পর্কে মওদুদ আহমদ তার পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থে লিখেছেন :

'এরপরেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও ভীতি প্রদর্শনের পন্থা

গ্রহণ করে। দলীয় নেতাকে খুশী করতে গিয়ে এক একজন আওয়ামী লীগ নেতা ভোট সংগ্রহের যুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। নিদারুণ রোষ ও অসহিষ্ণুতার কাছে পদানত আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করতে থাকেন যে, দেশ শাসন করার অধিকার তাদের ছাড়া আর কারো নেই। কাজেই নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনযুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণের কথা বিস্মৃত হয়ে বেপরোয়াভাবে ভোট কারচুপি করে দেখাতে চান যে তার এলাকায় বাস্তবে বিরোধী রাজনীতির কোনো অস্তিত্বই নেই। এ সময় সম্পূর্ণ সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ছিলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে, দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মতো সংবাদ মাধ্যমসমূহ, সরকারী যানবাহন সরকারের প্রচারণার কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সকল রকমের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ছিলেন দুর্বিনীত, রোষায়ত, অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ এবং নির্বাচনে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে তারা প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি দেখাননি।'

'ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও বিরোধী দলগুলোর বিশেষ করে ভাসানী ন্যাপ ও জসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোক সমাগম হচ্ছিলো—যা বাংলাদেশে নির্বাচনে জনপ্রিয়তার একটি মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শেখ মুজিব এবং তার মন্ত্রীরা ত্রাণকার্যের জন্য ব্যবহার্য হেলিকপ্টার নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করলেও বিরোধী দলগুলো ক্রমশঃ জোর সমর্থন পেতে থাকে। ফলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের প্রতি ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ বিরোধের সূচনা ঘটে। এ উপমহাদেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াটাকে একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে আসতে পারলে সরকারী দলে উচ্চাসন তার জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষিত রাখা হয়।'

'কাজেই ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে যখন প্রার্থীদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হলো, তখন দেখা গেলো ছয়জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন ঃ

১। জনাব এম, সোহরাব হোসেন,

২। জনাব তোফায়েল আহমদ,

৩। জনাব মোঃ মোতাহার উদ্দিন,

৪। শেখ মুজিবুর রহমান,

৫। কে, এম, ওবায়দুর রহমান,

৬। শেখ মুজিবুর রহমান (অন্য একটি আসনে)।

'সম্ভবতঃ কেবলমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া অন্যান্য আসনগুলোতে অভিযোগ তোলা হয় যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী কিংবা তাদের সমর্থকরা অন্য কাউকে সেই এলাকা থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেননি। জীবনের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন কিংবা অপহরণসহ অন্যান্য নানা ধরনের উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। পরবর্তীকালে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে দেখা যায় যে আরো ৫ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন ঃ

১। জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান,

২। জনাব রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া,

৩। জনাব মনোরঞ্জন ধর,

৪। সৈয়দ নজরুল ইসলাম,

৫। জনাব জিল্লুর রহমান।'

'উপরোক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কারো কারো এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন সহকর্মীদের সঙ্গে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় নেমে তারা নিজেদের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। এবারও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য সেই একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়।'

'বিরোধী দলগুলো এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় ও ক্ষমতাসীন দলের এ হেন আচরণকে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচায়ক বলে অভিযোগ উত্থাপিত করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য নতুন তারিখ স্থির করার দাবী জানায়। অন্যান্য দলগুলোর পক্ষ থেকেও একই দাবী উত্থাপন করা হয়। নির্বাচনের দিন কি ঘটতে পারে, এ নিয়ে তারা আগাম আশংকা প্রকাশ করতে থাকেন। বায়তুল মোকাররম চত্বরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জাসদের আ, স, ম, আবদুর রব ঘোষণা করেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়, কারণ সরকার ভীতি প্রদর্শনের পন্থা বেছে নিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, জাসদের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি এবং সরকার সেক্ষেত্রে সামান্য সৌজন্যবোধও প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। একথা সত্য যে, বিদ্যমান অবস্থায় তাদের যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দেয়া হতো, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এর পরেও তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাতে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটে এবং ক্ষমতাসীন দলকে এর জন্য অনেক অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।'

'বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগের এই মনোভাব নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময় জুড়ে অব্যাহত ছিলো এবং নির্বাচনের দিনে তা চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ ধরনের প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই ডজন আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যান। ভোট গণনা শুরু হবার পর কোনো কোনো আসনে স্থানীয় অফিসারেরা বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি। বিরোধী দলীয় নেতাদের মধ্যে টাঙ্গাইল ন্যাপ ভাসানীর ডঃ আলীম আল-রাজী ক্ষমতাসীন মন্ত্রী আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে, জাসদের শাজাহান সিরাজ আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে, ভাসানী ন্যাপের আবদুর রহমান মীর্জা তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে বাকেরগঞ্জে জাসদের মেজর (অব) জলিল আবদুল মান্নান ও হরনাথ বাইন-এর বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), ভাসানী ন্যাপের রাশেদ খান মেনন

ফজলুল হক ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), সিলেট ভাসানী ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে, কুমিল্লার ন্যাপ (মো)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর বিরুদ্ধে এবং ভাসানী ন্যাপের মোশতাক আহমেদ চৌধুরী এম, সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এদের মধ্যে এম, এ, জলিল শাজাহান সিরাজ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরীর নাম টেলিভিশনে বিজয়ী বলে ঘোষণাও করা হয়। এছাড়াও আরো কয়েকজন বিরোধী দলীয় প্রার্থী নূরুদ্দিন জাহিদ (জাসদ) কুমিল্লা-৭ আসনে, মোখতার আহমদ (জাসদ) চট্টগ্রাম-১৫ আসনে, এ, কে, এম, হাম্মাদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) নোয়াখালী-১৩ আসনে, নূরুল ইসলাম মাস্টার (জাসদ) নোয়াখালী-৭ আসনে, মোঃ ইসমাইল মিয়া (জাসদ) নোয়াখালী-৫ আসনে, আবদুর রশীদ (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৯ আসনে, মুর্তজা হোসেন মোল্লা (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৮ আসনে, ফজলুল হক খোন্দকার (স্বতন্ত্র) ঢাকা-২৪ আসনে, হারুনুর-রশিদ ময়মনসিংহ-৪ আসনে, এস, এম, এ সবুর (ন্যাপ-ভা) খুলনা-৩ আসনে এবং আহসান আহমেদ (ন্যাপ-ভা) রংপুর-২ আসনে ভোট গণনায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের খুবই কাছাকাছি ছিলেন। তাঁরা এবং আরো প্রায় এক ডজন বিরোধী প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না হলে এবং আওয়ামী লীগ অসৎ পন্থা অবলম্বন না করলে নিজেদের নির্বাচনী এলাকা থেকে তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতেন।'

'কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পুরো ঘটনাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতাদের নির্বাচনে পাস করিয়ে আনা ছিলো তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলের নেতারা যুক্তি দেখান যে, আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান, এম, এ জলিল, শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, ডঃ আলীম-আল-রাজী, মুজাফফর আহমদ, সুরঞ্জিত সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তা শুধুমাত্র দলের ওপর প্রত্যক্ষ হুমকিই সৃষ্টি করবেনা, 'জাতির পিতা'র জন্যও তা হবে অবমাননাকর। 'বঙ্গবন্ধু' জীবিত থাকাকালে এবং তিনি দল ও সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। নির্বাচনে যদি উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ জয়ী হন

তাহলে তা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাই প্রমাণ করতো এবং পক্ষান্তরে তা বিরোধী দলের চূড়ান্ত বিজয় বলেই প্রতিভাত হতো। তাছাড়া বিরোধী দলে এরা জিতে এলে সংসদে তাঁদের মুখোমুখি হওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হতো। আওয়ামী লীগ আরো মনে করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলোর কয়েকজন নেতা দুর্নাম কুড়িয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে তারাও জয়লাভ করলে তা তো স্বাধীনতারই ধারা-বিরোধী। তারা মনে করেন, নির্বাচনে গুরুত্ববিহীন কিছুসংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন--তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে আবদুল মান্নান ও আবদুস সামাদ আজাদের মতো মন্ত্রী পরাজিত হলে তা হতো আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।'

'বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার শুরু হতেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তৎপর হয়ে ওঠেন। যখন তারা দেখতে পান যে, আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটে। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বাহ্নে গঠিত কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে গণভবনের একটি কন্টোল রুম নির্বাচন পরিচালনা ও কৌশল পরিনির্ণয়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন পরাজয়ের সম্মুখীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যাকুলকন্ঠে বার বার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্টোল রুমে আবেদন জানাতে থাকেন, তখন গোটা প্রশাসনযন্ত্র ও রক্ষীবাহিনী বিপন্ন নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবণতা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিলো, তখন অন্তত-পক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। তারা সমস্ত ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয় ও পূর্বেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স সেগুলোর পরিবর্তে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে।'

'নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ আওয়ামী লীগের শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তিই বৃদ্ধি করেনি, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সরকার পরিচালনায়ও লাভ করে একচ্ছত্র অধিকার। দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের

আচরণেও এধরনের মানসিকতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে। নির্বাচনে যা হয়েছে, তার জন্য দঃখ প্রকাশ না করে পক্ষান্তরে তারা চলতে থাকেন উল্টো পথে। নির্বাচনের পর মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বহিষ্কারের অভিযান চালায়। তাদের যুক্তি ছিলো, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এমতাবস্থায় দেশের অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই।'

'১৯৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে তারা টঙ্গী শিল্প এলাকায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি বামপন্থী দলের শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রথম-বারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন ও অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত শ্রমিক সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পেঁছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে শেখ মুজিব তাদের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগের এক বৈঠকে পথভ্রষ্ট শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেশের সমস্ত শিল্প এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।'

'এর আগেই আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান 'লাল বাহিনী' গঠন করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করাই ছিলো এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। শিল্প এলাকা থেকে 'খারাপ লোক-দের' বহিষ্কার এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে 'দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের' অপসারণ ছিলো এর প্রধান কাজ। অবশ্য প্রায়ই তারা ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করে শিল্প খাত অতিক্রম করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাত-গুলোর জন্য যে শৃঙ্খলা ছিলো অতি প্রয়োজনীয়, ক্রমশ সেই শৃংখলার ভিত ধ্বসে যেতে থাকে। দেশের বহুস্থানে নিরীহ শ্রমিকরা এদের হাতে

নির্যাতিত হতে থাকে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তারা শ্রমিকদের স্থানীয় ও অস্থানীয় এই দুই শিবিরের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাষ্প সঞ্চারিত হয়। এর আগেই প্রথমে টঙ্গী ও পরে কালুরঘাট ও সর্বশেষে চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে অবস্থিত আর.আর, পাট ও বস্ত্রকলে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। তাদের বেশীরভাগই চটগ্রামের বাইরের জেলাগুলো থেকে বছরের পর বছর ধরে কাজ করছিলেন। এভাবে বাহিনী সদস্যদের মাধ্যমে দাঙ্গা বেঁধে উঠতে থাকে, এবং বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শ্রমিক লীগ বা এর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।'

'এমতাবস্থায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিল্পখাতে উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যঘাটতির ক্রমবৃদ্ধির পেক্ষাপটে দেশ আরেক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে—জনগণের এই প্রত্যাশা এ সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের দুরাচারে কুয়াশার আবরণে তলিয়ে যায়। লালবাহিনী, মুজিববাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে। লালবাহিনীসহ সরকারের আরো কয়েকটি সংগঠন কালোবজারী, মজুদদারী, চোরাচলানকারী ও ভুয়া ডিলার ও শিল্পপতিদের ওপর এক সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে। রাজনৈতিকভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে আওয়ামী লীগের সবকয়টি অঙ্গসংগঠনই এই অভিযানে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীণ দলের অংগসংঠন হলেও এই সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতার পেছনে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ৩রা মে হরতালের ডাক দেয়। কিন্তু তাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ; (১) দুষ্কৃতকারীরা ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিলো; (২) আচরণের বাড়াবাড়ি সাধারণ নির্বিরোধ লোকদের ওপর অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; (৩) শৃংখলা বিধানকারীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি বলে সংশোধনকারীরা স্বয়ং এর ফায়দা লুটতে থাকে; (৪) পুলিশবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন তাদের অসহযোগিতা করেন, কারণ, তাদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিলো। অন্যদিকে বিচার বিভাগ ছিলো অসহায়, কেননা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টি করা হচ্ছিলো প্রতিবন্ধকতা; (৫) আচরণবিধি না

থাকায় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করছিলো; এবং (৬) তাদের এই প্রতারণার বলি হচ্ছিলেন বিরোধী রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা।'

'এ অবস্থায় জনগণের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। তাদের প্রচারণা শুধু কোন ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই ব্যর্থ হয়নি, পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে আইনহীনতা। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হতে থাকে। গোটা অভিযানই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সরকার যখন ১৩ই এপ্রিল ১৯৮৩ তারিখে ঘোষণা করেন যে, সিমেন্ট, সুতা ও অন্যান্য লাভজনক আইটেমের ৬৭ জন ভুয়া ডিলারকে আটক করা হয়েছে এবং ছোটবড় ১,২৭৭টি ভুয়া প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করা হয়েছে, তখন জনমনে এমন একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি প্রতিফলিত হয় যে, এবার বোধহয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছেন। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকলো ততই দেখা গেলো যে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না; কারণ, দুষ্কৃতকারীরা হয় ছিলো ক্ষমতাসীন দলের সদস্য কিংবা কোনো না কোনোভাবে দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছিলো।'

দেশের আইন শৃংখলা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লিখেন ঃ

'ইতিমধ্যে ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ১১ই মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির ৫০নং আদেশ সংশোধন করে আরো কয়েকটি অপরাধ উক্ত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং অপরাধীদের সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এধরনের অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ছিলো ডাকাতি, দস্যুতা, হাইজ্যাকিং, অপহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ওষধ, ড্রাগ ও খাদ্যশস্যে ভেজাল মিশ্রিতকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও মজুদদারী। এ সমস্ত অপরাধে শাস্তির মেয়াদ ছিলো ৩ থেকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড! এতে কেবলমাত্র সমকালীন সময়ে দেশে সংঘটিত অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য বলে বিধান রাখা হয়।'

'এভাবে একটি কার্যকর কৌশল বলে বিবেচিত হবে—এই ধারণা নিয়ে আওয়ামী লীগ একই সাথে দুইকূল রক্ষা করে চলতে থাকে। প্রথমত, কঠোর আইন জারি করে তা বাস্তবায়নের জন্য রক্ষীবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়; এবং দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এর পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফলে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয় যা শেখ মুজিব নিজেও কখনো সমর্থন করেননি। যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছিলো এবং সরকারের জনপ্রিয়তা যাচ্ছিলো কমে, সেহেতু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সরকারের ন্যায় আওয়ামী লীগও এবার আরো কঠোর রাজনৈতিক নিপীড়নের পথ বেছে নেয়।'

'নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যে সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখিত আদর্শবাদ বিসর্জন দেন। সরকার সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরী অবস্থা জারি করার বিধান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এভাবে সরকার পিছনদিকে তার গন্তব্য স্থির করেন এবং তদনুসারে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন। এতে ৩৩নং অনুচ্ছেদের স্থলে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কীয় নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয়। ৯ (ক) নামে একটি নতুন ভাগ সংযোজন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'

'সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান নগণ্য থাকায় খুব অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক ছাড়াই সংশোধনী বিল পাস হয়ে যায়। আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য বিরোধী নেতা জনমত যাচাইয়ের জন্য এই বিল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দাবী জানালে সেই দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়। নতুন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর অবশ্য যুক্তি দেখান যে, যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের সময় এই বিধানগুলো সংযোজন করা হয়নি বিধায় এখন সংশোধনী এনে সেই ভুল শোধরানো হচ্ছে। তার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হয়তো সাংবিধানিক পরিষদ এই বিধান দুটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছিলো, কিংবা ডঃ কামাল হোসেন ভুলক্রমে তা করেননি।'

(পৃষ্ঠা ১৭৭—১৮১ ও ১৮৬—১৮৯)

'নির্বাচনী সন্ত্রাস ও কারচুপি সম্পর্কে' আবুজাফর মোস্তফা সাদেক লিখেছেন : '৭ই মার্চ' সাধারণ নির্বাচন 'ঢাকার একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ', 'জাসদের দুইজন হাইজ্যাক,' ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী সন্ত্রাস চালিয়েছে, কালিগঞ্জেও সন্ত্রাস চলছে, সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পটুয়াখালিতে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত, রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস—ইত্যাদি'র মধ্য দিয়ে মুজিব সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ভোটের পর অনেকটা প্রকাশ্যেই শুরু হয় –

'আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী/জয় বাংলা বাহিনী/লাল বাহিনী/আওয়ামী যুবলীগসহ বিভিন্ন বেসামরিক ও আধা সামরিক, যথা রক্ষী-বাহিনীর সদস্যদের বিরোধী দলীয় কর্মী গুম, ব্যাংক ডাকাতি, লুট, খুন, নারী হাইজ্যাক ও ধর্ষণের এক বিভীষিকাময় রাজত্ব।'

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন : পৃষ্ঠা ৭৫

আসহাব উদ্দিন আহমদ তার লেখা 'ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ১৬ জনের নামে যাদের চৌদ্দজন নিহত হয়েছেন মুজিব-বাহিনীর হাতে। উৎসর্গ নামায় তিনি লেখেন :

'সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দালাল বর্বর মুজিব-বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার নাপোড়া পাহাড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত বীর শহীদানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই লেখাটি অর্পিত হলো। নিহত বীর কমরেডরা হলেন : ১। প্রধান বিপ্লবী নেতা প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য ২। বিপ্লবী বাহিনীর কমান্ডার জাহেদ হোলে আহমেদ ৩। কৃষক নেতা আবু সাদেক ৪। ডাক্তার তুহিন (কুষ্টিয়া) ৫। এম, এ মোস্তফা চৌধুরী ৬। আমানত খান চৌধুরী ৭। মামুন ৮। হাবিল-দার রুস্তম ৯। আসাদুল্লাহ ১০। বজল আহমদ ১১। নুরুল ইসলাম ১২। আবুল হাসেম ১৩। কালু মিয়া ১৪। শের আলী।

(পৃষ্ঠা-১)

রক্ষীবাহিনীর হত্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বা আইনগত প্রতিকারের সুযোগ যে কত সীমাবদ্ধ ছিল সে সম্পর্কে মওদুদ আহমদ তার পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থে লিখেছেন : 'রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের

প্রেক্ষিতে দেশের আদালতগুলোতে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করলে রক্ষীবাহিনীর বেপরোয়া আচরণের লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। এধরনের একটি মামলার বিবরণ এতদপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার জনৈক শাজাহানের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এই মামলায় রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। মামলার বিবরণে জানা গেছে, শাজাহান নামের ১৮ বছরের এই বালককে ১৯৭৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে। তারপর তাকে রমনা থানায় সোপর্দ করে তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডাইরী লিপিবদ্ধ করা হয়। ফৌজদারী দন্ডবিধির ৫৪ ধারায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সেদিনই রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে তাকে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়।'

'শাজাহানের ভাই মামলার অভিযোগে উল্লেখ করে যে, রক্ষীবাহিনী শাজাহানের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় ১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী শাজাহানের সাথে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে। এর পর থেকে শাজাহানের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'তখন শাজাহানের ভাই একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলায় কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনী আটকাদেশের অভিযোগ আনে। মামলায় রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শাজাহান ছিলো নড়িয়া থানায় দায়েরকৃত একটি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার কাছে বেআইনী অস্ত্র থাকার অভিযোগ ছিলো। এই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনী তাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। এতে আরো বলা হয়, শাজাহানের স্বিকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষীবাহিনী তাকে ঢাকার রায়ের বাজারের এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি গলির সামনে নেমে শাহজাহান হঠাৎ করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনী ৩১শে ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় একটি প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টও দাখিল করে। কাজেই শাহজাহনকে আদালতে উপস্থিত করা রক্ষীবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

'এ সময়ে শাজাহানের ভাই সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতের নথির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, নড়িয়া থানায় কোন মামলায় শাজাহান কখনো অভিযুক্ত ছিলো না। ১৯৭৩ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর শাজাহানের পলাতকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ ২রা জানুয়ারী (১৯৭৪) তারিখে রক্ষী-বাহিনীর সদর দপ্তরে শাজাহানের সাথে তার দেখা হয়েছে। তিনি আশংকা করেন যে রক্ষীবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করেছে।'

'এই মামলার ফলে আদলত রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উন্মোচিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আদালত তলব করে। কাগজপত্র পরীক্ষা করে আদালত দেখতে পায় যে, সেই পলায়নের ঘটনার তিনদিন পরে থানায় প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিলো। সবকিছু পরীক্ষা করে আদালত নড়িয়া থানার অভিযোগ, অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনী এবং শাজাহানের পলায়নের বিষয়টিকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করে। মামলার রায়ে বলা হয়, রক্ষীবাহিনী যা করেছে, তা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধারই প্রমাণ দিয়েছে।'

'রক্ষীবাহিনীর ~~আশঙ্কাজনক~~ তৎপরতার এটি একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। অত্যা-ধুনিক অস্ত্রবাহী, সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনপ্রাপ্ত এবং হিসাবযোগ্যতাবিহীন এই বাহিনীর জঘন্য তৎপরতা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিলো না। সনা-তন পদ্ধতিতে সজ্জিত পুলিশ এই বাহিনীর সামনে ছিলো অসহায় নীরব দর্শক। এ সময় থেকে প্রতিদিনই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের অভিযোগ আসছিলো। নোয়াখালীর মাইজদী কোর্টে রক্ষী-বাহিনীর সাথে স্থানীয় রিক্সাচালকদের এক ঘটনার জের হিসেবে সেখানে এক-দিনের পূর্ণ ধর্মঘটও পালিত হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কিংবা তার কোন অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের উপর চড়াও হতো না। তাদের এই দলীয় ভূমিকায় জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিলো। নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য তারা মফস্বল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করতো, জেলা প্রশাসন কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আগমনী রিপোর্ট দাখিল করা প্রয়োজন বলে মনে করতো না। রক্ষীবাহিনী তার কাজ করতে গিয়ে সেনাবাহিনীসহ

অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতোনা বলে অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন এদের উপর বিক্ষুব্ধ। জনগণের এক বিরাট অংশসহ দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিনই রক্ষীবাহিনী নারকীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলো। রক্ষী বাহিনীর আইনগত ক্ষমতাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জও হচ্ছিলো।

'আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করছেন যে, তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচারণবিধি ছিলো না। নিজেদের কাজকর্মের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতো না। কোনো গ্রেফতার কিংবা তল্লাশীর রেকর্ডও তারা রাখতো না। তাহলে তারা কিভাবে কাজ করেছে, আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লীডার হাফিজ উদ্দিন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়ে ছিলেন, "আমরা যেভাবে করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি।" প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন আরো জানান যে, কোনো অভিযানের ব্যাপারে তারা ডাইরী রাখতো না, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদেরও হিসাবের জন্য কোনো রেজিস্ট্রারও তাদের ছিলো না।'

'ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, অসংখ্য হতভাগ্যের ন্যায় শাহজাহান ছিলো বিরোধী দল জাসদের ছাত্র সংগঠনের একজন সদস্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করা যায়নি। যাই হোক, শেষাবধি আদালত ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনের পর শাহজাহানের সন্ধান জানার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।'

'মামলার রায় এবং তদন্ত কমিটি গঠনের পরামর্শ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে পাঠানো হলেও এই তদন্ত আর কোনোদিনই অনুষ্ঠিত হয়নি।'

'দেশের কোন কোন স্থানে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনার কোন ভাষা ছিলো না। নিজেদের এরা অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মনে করতো। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে অস্থায়ী শিবির স্থাপন করতো, 'সন্দেহভাজন' লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে

আসতো, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে কোনো রকম নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করতো। কোন রসিদ না দিয়ে তল্লাশীকালে তারা জনগণের সম্পত্তি হরণ করতো। ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করতো ঘড়ি, ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। এমনও খবর পাওয়া যায় যে, বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তারা টাকা সংগ্রহ করতো।'

এ প্রসঙ্গে আরো একটি মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে রক্ষীবাহিনী বদরগঞ্জ মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রামে প্রবেশ করে ও শান্তি সেন নামক জনৈক মার্কসবাদী নেতার খোঁজে গিয়ে তার বাড়ী থেকে শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন (৬০), পুত্রবধূ রীনা সিনহা (১৯) ও পাশের বাড়ীর একজন অতিথি হনুফা বেগমকে (১৬) ধরে নিয়ে যায়। তারা এই তিনজন মহিলাকে নিজেদের শিবিরে আটক করে রাখলে জনমনে প্রবল রোষ সঞ্চারিত হয়। রাজধানীর পত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সরকারের টনক নড়ে। প্রথম অবস্থায় এ ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও উক্ত তিনজনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনী গঠনের পর থেকেই একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও বিরোধী রাজনৈতিক দল রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নানারকমের কুৎসা রটনা করে আসছে। এতে বলা হয় অরুণা সেন বা অন্য কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করা হয়নি। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাগজপত্র পাওয়া গেছে বলে ঘটনার তদন্তের জন্য তাদের পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রেসনোটে তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাও দেয়া হয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা ছিলো কিনা প্রেসনোটে তার উল্লেখ ছিলো না।'

'প্রায় একই সময়ে উক্ত তিনজনের অবৈধ আটকাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই-কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের জন্য একটি রীট আবেদন করা হয়। এতে বলা হয়, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে উক্ত তিনজনের উপর নিদারুণ নির্যাতন চালানো হতো। অরুণা সেনকে হাত বেঁধে নিকটস্থ নদীর ঠান্ডা পানিতে নিক্ষেপ

নিহত রাবেয়া আকতার বেলী
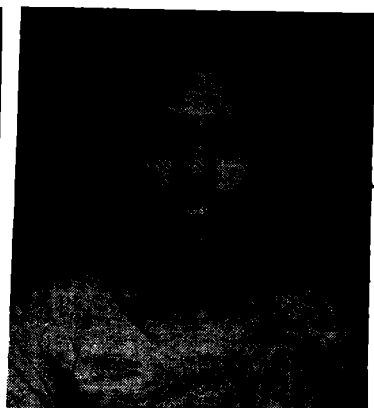
নির্যাতনের শিকার রীণা
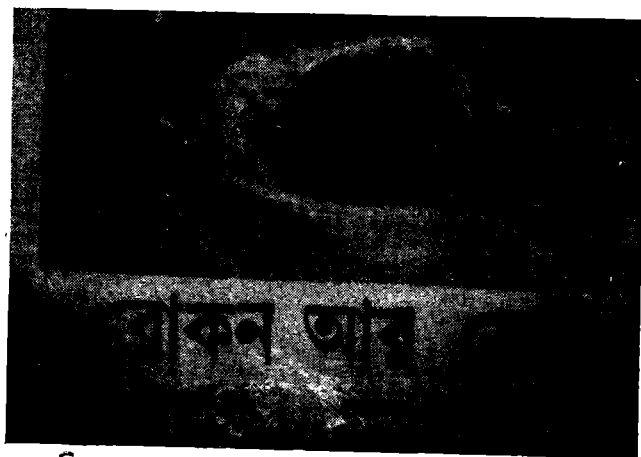
নিহত রোকন

গণকণ্ঠ

জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের নিহত দু'জন

করে আবার টেনে তোলা হতো। যুবতী দুজনকেও নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। শারিরীকভাবে তাদের মর্যাদাও হানি করা হয়। উক্ত তিনজনকে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য আবেদনে অনুরোধ জানানো হয়।"

আবেদন পেশ করার পর আদালত উক্ত তিনজনকে সাত দিনের মধ্যে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন মামলা দায়ের ছাড়া প্রায় দুইমাস অবৈধভাবে আটক রাখার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সরকারের ছিলো না। দেশের সর্বোচ্চ শাসকও এতে বিচলিত হয়ে বার বার এ্যাটর্নী জেনারেলকে ডেকে পাঠাতে থাকেন। এ্যাটর্নী জেনারেল উক্ত তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আদালতের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাদের আদালতে আনতে হবে যা আদালতের জন্য মর্যাদাকর হবে না। অবশেষে মাননীয় বিচারক তার আদেশ সামান্য পরিবর্তন করে বলেন যে, আদালত কক্ষের পরিবর্তে তার চেম্বারে উক্ত তিন মহিলাকে উপস্থিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের একটি ভ্যানে করে তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। আদালত ঘটনার বিবরণ শুনে দুদিন পর শুনানীর তারিখ দেন।

সেদিন ঘটনার ফলাফল দেখার জন্য আদালত ছিলো লোকে লোকারণ্য। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করে আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুনানীর শুরু হওয়ার আগের রাতে জেল সুপারিণটেনডেন্ট এই লেখককে টেলিফোনে জানান যে সরকার বিনাশর্তে তিন মহিলাকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি, মামলার আবেদনকারী বদরুদ্দীন উমর এবং হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান তারপর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই ও অরুণা সেন ও অপর দু'জনকে নিয়ে আসি। সরকারের প্রেসনোটটি ছিলো সবৈব মিথ্যা এবং পরদিন আদালতকে এই মুক্তিদানের নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হয়।'

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী গ্রন্থে লেখা হয় 'এক কথায় বাহাত্তর থেকে পচাত্তর এসময়টা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল কালোমেঘে ঢাকা। বাকশাল গঠনের পূর্বে ময়দানে বিরোধী রাজনৈতিক

দল থাকলেও শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের কাছে তাদের তৎপরতা ছিল খুবই সীমিত। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের অত্যাচার, অবিচার, লুন্ঠন সমাজকে বিষিয়ে তুলে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি, লুট, অপহরন এ ছিল এদের নিত্য দিনের কার্যক্রম। এ জঘন্য তৎপরতায় শেখ মুজিবের মসনদ রক্ষাকারী বিশেষ বাহিনী 'রক্ষীবাহিনী' অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করতো। এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অসহায় থাকলেও মাঝে মধ্যে দু'একটি ক্ষেত্রে দুএকজন ধরা পড়লেও স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনে কিংবা কোন মহারথী আওয়ামী নেতার টেলিফোনে ছাড়া পেয়ে যেত।'

(গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ইবরাহিম রহমান ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৮)

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাস ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সে আমলে শুধু প্রতিবাদ-প্রতিরোধই হয়নি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দাবি সম্বলিত দফায়ও এসব বাহিনীর বিলুপ্তির কথা বলেছে।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভাসানী ন্যাপ তার ১১ দফার এক নম্বর দফায় দাবি জানায় ঃ 'অবিলম্বে রাজনৈতিক হত্যা, অপহরণ, গুন্ডামী, হামলা বন্ধকরণ।' ছয় নম্বর দফায় বলা হয়, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ বিভিন্ন বেসরকারী বাহিনী নিষিদ্ধকরণ এবং হত্যা, অপহরণ ও হয়রানীর ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তিদান।'

১৯৭৪ সালের ১৪ই এপ্রিল সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের দেয়া ৪ দফা দাবির এক নম্বরে (খ) বলা হয় 'বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, রাষ্ট্রপতির ৮ ও ৯ নং আদেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমন আইন বাতিল।' এক নম্বর (ক)-তে বলা হয়, 'সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক কারণে হুলিয়া গ্রেফতার, পরোয়ানা ও মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।'

দুই নম্বর দাবীর (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রক্ষীবাহিনী বাতিল করে উপযুক্তভাবে তাদের পুণর্বাসন।'

১৯৭৫ সালের ২৯ আগস্ট উত্থাপিত ইউ পি পি তার সাত দফা দাবির মুখবন্ধে বলে, 'আর এই সকল দেশী-বিদেশী লুটেরা-বদমাশ ও চক্রান্তকারীদের স্বার্থ পাহারা দেওয়ার জন্য মুজিব তার সিংহাসন থেকে হুকুম করেছে

নির্বিচারে জনগণ ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের হত্যা, গ্রেফতার, এমনকি স্বপরিবারে ধ্বংস করার জন্য। জেলে আটক হাজার হাজার রাজবন্দী, বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত গণকবর এর প্রমাণ।

ইউপিপি তার চার নম্বর দফায় বলে, 'মুজিবী সন্ত্রাস, স্থানীয় পান্ডা, হত্যা-লুট-নারী ধর্ষণকারী বদমাইশ ও তাদের নির্দেশ ও আশ্রয়দানকারী এমপি, দলীয় কর্মকর্তা ও অফিসারদের গ্রেফতার, বিচার ও শাস্তিদান।'

(২১ দফা থেকে ৫ দফা : আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা)

এ্যান্হোনী ম্যাসকারেনাস তাঁর লেখা 'বাংলাদেশ : লিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থে মুজিব আমলের কিছু সন্ত্রাসী দিক ও রক্ষীবাহিনীর প্রতি সরকারের পক্ষপাত এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সরকারী অবজ্ঞার চিত্র তুলে ধরেছেন। তার গ্রন্থটির ভাবানুবাদ হয়েছে বাংলায়। তাতে লেখা হয় : ১৯৭৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর, মুজিব নিহত হবার পর জেনারেল জিয়া আমাকে বলেছেন যে, "আমরা তো সামরিক লোক নই। কাগজপত্রে আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের বেতন দেওয়া হয় কারণ মুজিব বলেছেন, আমরা যেন বেতন পাই। আমাদের অস্তিত্ব ছিলো সম্পূর্ণতই মুজিবের ওপর নির্ভরশীল। আইনগত কোনো ভিত্তি নেই আমাদের। আমাদের লোকেরা জাহান্নামে যাচ্ছে—কিন্তু তাদের কোন অভিযোগ নেই। কারণ, তারা দেশের সেবায় নিয়োজিত। দেশের জন্যে যে কোন ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত।"

'একই দিন জেনারেল জিয়ার চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন যে, "এদেশের সেনাবাহিনী হচ্ছে একক স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো। আমাদের অফিসার এবং লোকেরা যেহেতু আর্মী হিসেবে তাদের ক্যারিয়ার তৈরী করতে চায়, সেহেতু তাদের স্বেচ্ছাসেবক হয়েই কাজ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে কি পেয়েছে তারা? তারা প্রত্যেকেই হতভাগ্য, তুমি অবাক হবে, তাদের জার্সী, কোট, বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদের কম্বল গায়ে দিয়ে গার্ড দিতে হয়। আমাদের অনেক ট্রুফ এখনো লুঙ্গি পরে তাদের কাজ করছে। তাদের কোন ইউনিফর্ম নেই।"

'মঞ্জুর দুঃখের সংগে বলেছিলেন, "আমাদের লোককে পুলিশরা হয়রানী করতো। বুরোক্র্যাটরা—যারা পাকিস্তানে ছিলেন তারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার

চোখে দেখতেন। একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো। আমরা মুজিবের কাছে গেলাম। মুজিব আশ্বাস দিলেন যে, তিনি ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখবেন। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, আমাদের ছেলেরা নাকি কোল্যাবোরেটর্স ছিলো। মঞ্জুরের কথা অনুযায়ী, "মুজিব সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে সব রকম পন্থাই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কাউকে তাঁর জীবনের জন্যে হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সন্দেহ করলেই সেখানে ভাঙ্গন ধরিয়েছেন। টুকরো টুকরো করেছেন সেনাবাহিনীকে।'

জেনারেল জিয়া; মঞ্জুর এবং আরো অনেক অফিসারের সঙ্গে আলাপের পর আমার ধারণা হলো যে, মুজিব তার দ্বিতীয় ছেলে জামালকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদের জন্যে তৈরি করেছিলেন। মঞ্জুরের কথা অনুযায়ী, মুজিব জামালকে ইয়াগোশ্লাভ মিলিটারী একাডেমীতে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। জামাল সেখানে খুব ভাল ফল না করায় মুজিব তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন এবং স্যান্ডহার্স্ট-এ পাঠাতে চাইলেন। তিনি তখন চীফ-অব আর্মী স্টাফ জেনারেল শহিউল্লাহকে ফোন করলেন, যাতে তিনি জামালকে স্যান্ডহার্স্টে ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। এই ব্যাপারটি একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।'

'কারণ, স্যান্ডহার্স্টের ক্যাডেটদের বহু পরীক্ষা ও পদ্ধতির পর নির্বাচন করা হয়। আর সেখানে জামালের চেয়ে অনেক মেধাবী ক্যান্ডিডেট ছিলো। ফলে এটা ধারণা করা হয়েছিলো যে, ব্রিটেনের প্রিমিয়ার মিলিটারী একাডেমী জামালকে যথেষ্ট যোগ্য বিবেচনা করবে না। কিন্তু যেহেতু একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ, তাই তারা ৬০০০ পাউন্ড ফীসহ বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে নিতে রাজী হলো। মঞ্জুরের মতে এই টাকা অর্থমন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে বিশেষ চ্যানেলে পাঠানো হয়েছিলো।'

মুজিব এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গ প্রথম থেকেই সেনাবাহিনীর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আসছিলেন। আর এ ঘটনার চূড়ান্ত হলো, যখন মুজিব ভারতের সঙ্গে পঁচিশ বছরের একটি শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। মুজিবের মতে, যেহেতু ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেহেতু ভবিষ্যতে যে কোন অনাকাঙ্খিত

আক্রমণ থেকে এরাই তাঁকে বাঁচাতে পারবে। ফলে দেসের সেনাবাহিনী ও সামরিক প্রশাসন সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হলো। সেনাবাহিনী হয়ে দাঁড়ালো রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাহন বিশেষ।'

'১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে মুজিব আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে। তিনি বলছিলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মতো আমি কোন দানব সৃষ্টি করতে চাই না।'

'অল্পদিনের মধ্যেই রক্ষী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পঁচিশ হাজারে উন্নীত হয়। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঠে এই বাহিনী। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই বাহিনী সারাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। হত্যা-খুন-নির্যাতনের বহু ঘটনা রক্ষী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হয়। মুজিবের ছেলে কামাল ছিল খুব 'হট-হেডেড'। বাবার মতো তারও বাংলাদেশের প্রতি মালিকজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচারণকে সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করতো। প্রকৃত পক্ষে, কামালের অনেক আচরণে মুজিব খুব বিব্রত বোধ করতেন।'

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে শেখ মুজিব নিজের বিজয় বলে মনে করতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, দেশের জনগণ তাকে আগের মতোই ভালবাসে। কিন্তু এটা ঠিক যে শেখ মুজিবও তার দলের ভোট গ্রহণের নীতিমালা কৌশল আশ্রিত ছিলো। মুজিব সরকার একটি ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন কারণ ভোটের সমস্ত হিসেব ক্যান্টেনমেন্টে রক্ষিত হয়ে ছিলো। ঢাকায় এ ব্যাপারে একটি কথা কানে এসেছে আমার। সেটা ছিল ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। জেনারেল জিয়া এবং বিগ্রেডিয়ার মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন যে, মুজিবের দল আওয়ামী লীগের পক্ষে ৮০% ভোট সংগ্রহ কারছিলো। এবং তা ছিলো কৌশল আশ্রিত। মুজিবের ক্যান্ডিডেটদের অধিকাংশ ছিলো অযোগ্য লোক।'

ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ নানা রকমের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হচ্ছেন। দেখা গেলো, তাঁরা বহু কষ্টে যে শত শত চোরা

চালানী, খুনী এবং ডাকাতদের আটক করেছেন, ঢাকা থেকে একটি টেলিফোন কলেই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এ ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ফারুক আমাকে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "যখনই আমরা কোন দুষ্কৃতকারীকে আটক করি, তখনই দেখা যায়, হয় সে আওয়ামী লীগের নয়তো আওয়ামী লীগের কোন ক্ষমতাশালী সমর্থকের লোক। ফলে ওপরঅলাদের ইচ্ছে অনুযায়ী এদের ছেড়ে দিতে হতো। বিনিময়ে ঝামেলা পোহাতে হতো আমাদের।"

'ফারুক আমাকে জানিয়েছিলেন, সে সময় তিনি একটি লিখিত নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাতে বলা হয় যে, তিনি যাকে খুশি আটক বা বন্দী করতে পারবেন। তবে তা করতে হবে তার নিজের দায়িত্বে। রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসার বা ব্রিগেড কমান্ডার এসব ব্যাপারে দায়ী থাকবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রী তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'যে কোন উল্টোপাল্টা ধরপাকড়ের জন্যে সেনাবাহিনীকেই দায়ী হতে হবে।'

"এটা ছিল এক ধরনের প্রহসন" ফারুক বলেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সেনাবাহিনীকে বলা হলো নক্সালদের নামে সিরাজ সিকদার এবং কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রমুখদের খতম করতে। ফারুক এ জাতীয় নির্দেশ পালনে উৎসাহী হলেন না। "আমি মার্ক্সিস্টদের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলাম না। আদর্শগতভাবে তারা হয়তো ভুল পথে ছিল—কিন্তু তারা দেশের খুব বেশি ক্ষতি করেনি"—ফারুক বলেছিলেন।

একবার টঙ্গীতে মেজর নাসের তিন ব্যক্তিকে আটক করেন। এরা তিনটি খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। নববিবাহিত এক দম্পতি তাদের গাড়িতে টঙ্গী যাওয়ার পথে মোজাম্মেল নামে দুর্ধর্ষ আওয়ামী লীগার ও তার সহকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। গাড়ির ড্রাইভার এবং আরোহীকে মেরে তারা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। তিনদিন পর রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসেরকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু নাসের তাদের কোর্টে চালান করে। কিছুদিন পর তিনটি নৃশংস খুনের আসামী

মোজাম্মেলকে জনসম্মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই ঘটনাটি সেনাবাহিনীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফারুক পরে জানান যে, আমরা তখন নিশ্চিত যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। এবং সে আমি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি শেখ মুজিবকে না মারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি তখন ক্যাপ্টেন শারফুল হোসেনকে বলেছিলাম 'শারফুল চলো, মুজিবকে খতম করে দেই।'

'তিনি বলেছিলেন, 'ওই ঘটনার পর প্রমোশন, ক্যারিয়ার এসব ব্যাপারে আমার আর কোন মোহ ছিল না। শেখ মুজিবের প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। আমার তখন একটাই চিন্তা—কিভাবে এই সরকারকে উৎখাত করা যায়।'

(গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তর করেছেন ফরিদ কবির, রূপান্তরের পৃষ্ঠা ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ২৮ ও ২৯)

মোহাম্মদ তোয়াহার পাণ্ডুলিপি থেকে:

১৯৭৪ সালে আত্মগোপরত অবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা (মরহুম) আওয়ামী লীগের হত্যা ও নির্বাচনসহ বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। এটি গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে সাপ্তাহিক গণশক্তিতে ১৯৭৭ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসের কয়েকটি সংখ্যায় পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়। আমার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান '৭২-এর ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে সকল বে-আইনী অস্ত্রধারীদের উপর অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি তাঁর বিগত ২৬শে মার্চের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন, যে বিগত তিন বছরে তাঁর দলীয় জাতীয় পরিষদের ৫ জন সদস্য সহ ৩ হাজারেরও অধিক ব্যক্তি বে-আইনী অস্ত্রধারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। কাজেই তিনি "দুষ্কৃতিকারীদের" নিরস্ত্র করে দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে চান।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই : বিগত ৩ বছরে "দুষ্কৃতিকারীদের" হাতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা সরকার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ২১ হাজারেরও বেশী; অথচ শেখ মুজিব মাত্র তাঁর দলীয় ৫ জন পরিষদ সদস্য এবং ৩ হাজার কর্মীর কথা উল্লেখ করলেন কেন? তাঁর দলের বাইরের যাঁরা নিহত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের কি কোনো দায়-দায়িত্ব নাই? এবং এই যে-হত্যাকাণ্ড আজও প্রতিদিন চলেছে তার পরিণতি কি? এই সমস্ত প্রশ্নের উপর আমরা দেশবাসী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-যন্ত্র ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা তথা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশের দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই।

এই হত্যাযজ্ঞের হোতা কারা এবং এর উৎস কোথায়?

সর্ব প্রথমে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার দাবী রাখে তা হচ্ছে : এই হত্যাকাণ্ডের হোতা কারা এবং তার উৎস কোথায়? প্রশ্নটি আমরা ঘটনাভিত্তিক আলোচনার পক্ষপাতি।

যে-রাজনৈতিক কারণে ১৯৭১-এর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে মতভেদের অবকাশ থাকলেও ২৫শে মার্চ (১৯৭১) পাক-সামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রশ্নে কোনো মতপার্থক্যের অবকাশ ছিলো না। বস্তুতঃ বোলতার চাকে ঢিল ছুড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক সাধারণ ও অন্যান্য বাম-পন্থী রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা দারুণ বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করে-ছিলাম যে, ঐ জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে তৎকালীন আওয়ামী লীগের (বর্তমান "বাকশাল") পক্ষ থেকে এক গোপন নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল : বামপন্থীদেরকেও শত্রু বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; তাদের হাতে যাতে কোন অস্ত্র না যায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বলাবাহুল্য যে, এই নির্দেশ সাথে সাথে কার্যকর হয়েছিল। অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারিটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করবো :

নোয়াখালী জেলায়ঃ

(১) সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে সামরিক দিক থেকে পাক-বাহিনীর আক্রমণের প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতাই তখনকার আওয়ামী লীগের ছিলো না। বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ ছিলো একটি ঢিলেঢালা নির্বাচনী হৈ চৈ করার মত গণ-সংগঠন। কাজেই স্থানীয় জনমতের চাপে আওয়ামী লীগের জেলা নেতারা একটি অঞ্চলে আমাদের পার্টির হাতে যৎসামান্য অস্ত্র (৪টি রাইফেল) দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেয়ার সময় বন্দুকগুলির ট্রিগার খুলে রাখা হয়। এই অকেজো বন্দুকই ভাসানী ন্যাপের বিশিষ্ট নেতা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভ্য জনাব সিদ্দিকউল্লাহর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল পাক-বাহিনীর হাতে; পাক-বাহিনী খবর পেয়ে তার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গুলী করে হত্যা করে।

(২) উক্ত জেলায় কার্যরত আমাদের পার্টির অন্যতম কর্মী ও তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নুরুল হাসানকে আওয়ামী স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী ৪ঠা এপ্রিল (১৯৭১) গ্রেফতার করে। তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার পরই আওয়ামী লীগের তৎকালীন ও বর্তমান পরিষদ সদস্য মিঃ হানিফের নেতৃত্বে গঠিত "সামরিক আদালত" তাঁকে মৃত্যুদন্ড দান করে। সৌভাগ্যবশতঃ সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ঘটনাটি উধর্বতন জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার ফলে নুরুল হাসানের প্রাণ রক্ষা পায় বটে, কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিতে সাহস পাননি। তারা তাকে হাজতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী সময় আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপের ফলে নুরুল হাসান মুক্তি লাভ করেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে সময়মত আমাদের পার্টির হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি সেইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের হাতে আমাদের এবং অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা প্রাণ হারিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপঃ নোয়া-খালী জেলার পাক-বাহিনীর সাথে লড়াই চলাকালীন আমাদের বাহিনীর তিনজন গেরিলা যোদ্ধা পশ্চাদপসরণকালীন রায়পুর থানার এলাকায় আওয়ামী সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বন্দী হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন (ফয়েজ আহমদ) চৌমুহনী কলেজের ছাত্র এবং আওয়ামী লীগের

তৎকালীন এবং বর্তমান পরিষদ সদস্য মিঃ সিরাজুল হকের (রামগতি) শ্যালকের ছেলে। আমাদের গেরিলা যোদ্ধাগণ রাজনৈতিকভাবেই তাদেরকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং কোনো কোনো প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পাক-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা না করে পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়ার সুযোগ দানের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। উক্ত সিরাজুল হকের নির্দেশে তিনদিন পর তাদেরকে হত্যা করার জন্য নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হলে একজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দীর্ঘ ১৮ মাইল পথ সাঁতরিয়ে প্রাণ বাঁচান; অপর দুইজন তাদের হাতে নিহত হন। বেঁচে আসা গেরিলা কমরেডের নিকট থেকেই আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই।

উক্ত জেলায় যুদ্ধ চলাকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় বাবর নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রকর্মী তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে উক্ত জেলায় যুদ্ধের একমাত্র সংগঠক আমাদের পার্টিই। উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ নেতারা সপরিবারে ও সদলবলে ইতিপূর্বেই ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তাই তারা দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে অস্ত্রসহ আমাদের বাহিনীতে যোগ দেন। এই অপরাধে বাবরসহ তিনজন কর্মীকে হত্যা করা হয়।

(৪) যুদ্ধের এক পর্যায়ে (জুন অথবা জুলাই মাসের দিকে) সীমানা অতিক্রম করে আওয়ামী লীগের একটি বাহিনী আমাদের পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকায় উপস্থিত হয়। আমাদের প্রভাবিত জনগণ সরল বিশ্বাসে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাদের বাহিনী পাক-বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় ঠিক তখনই এই বিশ্বাসঘাতকরা পিছন দিয়ে আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে দুইদিকে আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে আমাদের বাহিনীর কয়েকজন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে বন্দী ও নিহত হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন

পাক-বাহিনী (কোর) পরিত্যাগকারী যোদ্ধা এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ট। আমাদের পার্টির সাথে সংযোগের কারণেই তাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সবচাইতে তিনি আওয়ামী লীগের লোকদেরকে এতদূর বিশ্বাস করেছিলেন যে, নিজে উদ্যোগ নিয়েই তিনি আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য তাদেরকে বোঝাতে যান। অথচ বেঈমানরা তাঁকে দুইদিন আটক রাখার পর ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে।

ফরিদপুর জেলায়

ফরিদপুর জেলায় আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা শান্তি সেনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় ভিত্তিতে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছিলো। ঠিক সেই সময়ই কলিকাতাস্থ তৎকালীন "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের" প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনের স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার মারফৎ নির্দেশ আসে : বামপন্থীদের নিরস্ত্র করো এবং হত্যা করো। একই সময় আরেকটি নির্দেশ আসে শান্তি সেন, সর্দার সিরাজউদ্দীন (ভাসানী ন্যাপ) ও সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার জন্য। এই নির্দেশের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ও স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার স্টুয়ার্ড মুজিব কলিকাতায় বন্দী হয় এবং তার স্থলে নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হয় অন্য একজন। ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর হাতে শান্তি সেনসহ আমাদের পার্টির ৫ জন কর্মী বন্দী হন। কিন্তু জনমতের চাপে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

যাই হোক। আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার এবং বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য ভারতীয় কবজার বিরোধিতা করার 'অপরাধে' পরবর্তী সময় স্টুয়ার্ড মুজিব ও তার সহকারী কমান্ডার কাঞ্চনসহ আরো কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা গ্রেফতার হয়। তাদের মধ্যে কাঞ্চনসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আদৌ আমরা জানতে পারিনি।

আওয়ামী লীগের এই আচরণে আমাদের পার্টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মগোপনে চলে যায়। কিন্তু সরদার সিরাজউদ্দিনসহ অন্যান্য দলের লোকেরা প্রকাশ্য থেকে যান। এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপরই মুক্তি

বাহিনীর হাতে নিহত হন। সর্দার সিরাজউদ্দিনকে হত্যাকান্ডে আওয়ামী মুক্তিবাহিনী যে পৈশাচিক বর্বরতা দেখিয়েছে তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে উঠে। সর্দার সিরাজউদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমন্ত্রিত অতিথির একটি একটি করে হাত-পা কাটার পর তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। তিলে তিলে এইরূপে চরম মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে হত্যা সংগঠিত করার পেছনে কোন বর্বর পৈশাচিক ও বিকৃত মানসিকতা কাজ করেছিলো তা থেকেই বোঝা যায় তাদের পদলেহী শ্রেণীচরিত্র। সম্প্রতি সিরাজ সিকদারকেও গ্রেফতার করে বন্দী অবস্থায় হত্যা করে তার পালিয়ে যাওয়ার এক মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায়

চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের পার্টির ডাক্তার তুহীনের নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, স্কুল শিক্ষক বাবু প্রাণকুমার ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগও একটি বাহিনী গঠনকরে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় আমাদের পার্টিরই একটি বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েকদিন পর আমাদের বাহিনী এসে তাদের সাথে মিলিত হয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বাহিনীর লোকেরা যখন নিজের ঘরে নিদ্রায় মগ্ন তখন আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা হঠাৎ অতর্কিত-ভাবে আক্রমণ করে তাদের ৩০ জনের সকলকেই হত্যা করে।

অন্যদিকে তারা প্রাণকুমার বাবুকেও ডেকে পাঠায়। তিনি এই হত্যা-কান্ড সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেখানে উপস্থিত হলে তাকে হত্যা করা হয়। পরদিন আশ্রয়দাতা সেই বাড়ীর মালিককেও তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে এবং ঘটা করেই তা করা হয়। কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে তিনি নাকি "নাপাক" হয়ে গেছেন। তাই তাকে গোসল করিয়ে নেওয়া হয় এবং অতঃপর ঠান্ডা মাথায় তার হত্যার কাজ সমাধা করা হয়। এর পেছনে কোন বিকৃত মানসিকতা ছিলো তা আর যাই হোক সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নয়।

(৯) চট্টগ্রাম জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা এবং এককালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহম্মদকে হত্যা করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা একটি সশস্ত্র স্কোয়াড নিযুক্ত করেছিল।

কিন্তু উক্ত স্কোয়াডেরই একজন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ভ্রান্ত কর্মনীতির ভুল উপলব্ধি করে অধ্যাপক সাহেবকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং পরবর্তী সময়ে সমস্ত ষড়যন্ত্রটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে অকপটে স্বীকার করেন যে, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীনের ন্যায় একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে হত্যা করা হলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হতো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও আসহাব উদ্দীনকে জানানো হয়েছে যে, তিনি এখনও বিপদমুক্ত নন। তাই তিনি বাধ্য হয়ে বিগত তিন বছরাধিককাল আত্মগোপনে জীবনযাপন করছেন।

ঢাকা জেলায়

১৯৭১-এর ২৮শে মার্চ তারিখ আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা জনাব তোয়াহা এবং গণশক্তি'র সম্পাদক অধ্যাপক বদর উদ্দিন ওমর ঢাকা শহর থেকে গ্রামের নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার পথে বুড়িগঙ্গার অপর তীরবর্তী ব্রাহ্মণ কির্তায় আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর হাতে আটক হন। তাঁদের সাথে ছিলো তাদের পরিচিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুইজন পদস্থ অফিসারের দুই ছেলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত অফিসারদ্বয় ইতিমধ্যে রেজিমেন্ট ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

যাই হোক। জনাব তোয়াহা ও ওমরের গ্রেফতারের খবর পেয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার তদন্ত করতে আসেন এবং যাওয়ার সময় তাদের দুইখানা রেডিও ট্রানজিস্টার ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে চলে যান। রাত্রি আনুমানিক ১১টার দিকে সাবেক ই, পি, আর-এর একজন জওয়ান গোপনে জনাব তোয়াহার সাথে দেখা করে তাঁকে তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ করে জানান যে তাদের সখের ছেলে দুইটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তাদের দুইজনের (তোয়াহা ও বদর উদ্দীন ওমরের) বিষয়

তখনো আলোচনা চলছিলো। উক্ত ই পি আর জওয়ান তাঁদেরকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় জনৈক কলেজ অধ্যাপক বিষয়টি উক্ত ব্রাহ্মণ কির্তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তাঁর ছোট ভাই হাফেজ সাহেবের গোচরীভূত করেন। উক্ত হাফেজ সাহেব কিছুটা অনুসন্ধিৎসু এবং ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়েই মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আমাদের দেখতে আসেন। যখন তিনি জনাব তোয়াহা ও তাঁর সাথীদের পরিচয় পান তখন তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে উক্ত অধ্যাপকের সহায়তায় তাদেরকে নৌকায় করে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত মুক্তিবাহিনীর লোকেরা নৌকা নিয়ে জনাব তোয়াহাদের নৌকার পেছনে ধাওয়া করেছিলো বলে পরদিন জানা গেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত চেয়ারম্যান এবং তাঁর ভাই হাফেজ সাহেবই ছিলেন ঐ সমস্ত অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আশ্রয়কর্তা কিন্তু আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোয়াহা ও তার সাথীদেরকে মুক্তি দেয়ার 'অপরাধে' (?) বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উক্ত চেয়ারম্যান ও তার ভাইকে হত্যা করা হয়।

(১১) ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ থানায় আমাদের দলীয় বিশিষ্ট নেতা আব্বাসসহ কতিপয় ব্যক্তিকে ও মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা হত্যা করার। এদেরই একজন পংকুকে গ্রেফতার করলে স্থানীয় জনসাধারণ আওয়ামী ঘাতকদের ঘেরাও করে তাকে মুক্ত করে।

পাবনা জেলায়,

পাবনা জেলার মোহনপুরের আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হামিদ ও তার সহকর্মী ১১ জনকে আওয়ামী বাহিনীর লোকেরা হত্যা করে। এই জেলার আওয়ামী লীগের ঘাতকদের ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়েছিলো পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম, এল)-র কর্মী ও সমর্থকরা।

ময়মনসিংহ জেলায়ঃ

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এলাকার আমাদের পার্টির দুইজন বিশিষ্ট কর্মী নুরু ও বাতেনকে আওয়ামী লীগের লোকেরা ঐ সময় হত্যা করে।

যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়ায়ঃ

যশোহর, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলায় বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক বিশেষ করে আমাদের পার্টির কর্মীদের ব্যাপক হত্যাকান্ড ভারতীয় আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাটির প্রকৃত রূপটি উদঘাটিত করতে সাহায্য করে। বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের শুরুতে আমাদের পার্টি এবং কোনো কোনো এলাকায় অন্যান্য বামপন্থীদেরই ব্যাপক গণভিত্তিক সংগঠন ছিলো। নির্বাচনী হৈ-চৈকারী ব্যবস্থা ছাড়া আওয়ামী লীগের প্রকৃত সংগ্রামী সংগঠন বলতে কিছুই ছিলোনা। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো আমাদের পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থীরা। পরবর্তী পর্যায়ে ভারত থেকে যখন অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে তারা আগমন করে তখনো তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের সংরক্ষণ এবং আশ্রয় প্রদান করে প্রধানত আমাদের পার্টিই। পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই সংগঠিত করে আমাদের পার্টি যশোর ও খুলনার ব্যাপক অঞ্চল মুক্ত করে। তারপর নভেম্বর মাসের দিকে হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র মুক্তিবাহিনী আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী ও পার্টি সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্র লড়াইকালীন তারা আমাদের পার্টির কর্মীদেরকে হত্যা করেন। খুলনা জেলায় আমাদের পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী রউফ এবং অন্যান্য বহু কর্মীকে হত্যা করে। যশোরের পুলম ও মোহাম্মদপুর এলাকায় এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হত্যাকান্ড ব্যাপক আকার ধারণ করতেই আমাদের পার্টির স্থানীয় নেতাদের টনক নড়ে। প্রথমে কিছুটা হতভম্বতা ও বিভ্রান্তি তাদের মধ্যে দেখা দিলেও অচিরেই সমগ্র ষড়যন্ত্রটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে, ঐ সময় নোয়াখালী, যশোর, খুলনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় আমাদের পার্টির

নিহত নূর হোসেন

নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের সফলতার খবর বি, বি, সি, ভয়েস অফ আমেরিকা, রেডিও জাপান প্রভৃতি বেতার থেকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ভারতের "নকশাল পন্থীরা" আমাদের পার্টির সাথে যোগাযোগ করছেন বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ) যে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোধিতা করছিলেন তা সর্বজনবিদিত। কাজেই পূর্ব বাংলায় ভারতের আক্রমণ ও দখলকে নিরংকুশ করার উদ্দেশ্যে ভারতের সম্প্রসারণবাদী শাসনচক্রের নির্দেশে তাদের দালাল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে পরিচালিত মুজিববাহিনী যে আমাদের পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে তা ছিলো অবধারিত।

১৯৭১ সলের ২১শে নভেম্বরের পর এই আক্রমণ আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশের সাথে তা অভাবিতপূর্ব ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজের বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সাথে সাথে এই বীভৎসতা ক্রমশঃ সারা দেশের সব কয়টি জেলায় পরিব্যাপ্ত হয়।

উপরে আমরা জেলাওয়ারী নমুনা সার্ভে হিসাবে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছি মাত্র। বলাবাহুল্য যে বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি ও দেশপ্রেমিকদের এই ব্যাপক হত্যাকান্ড ছিলো ভারতীয় আগ্রাসন ও দখলকে নিরংকুশ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত মুজিববাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে ও পরে তা কোনো সময়ই প্রশমিত হয়নি।

পাঁচজন পরিষদ সদস্য খুন হলো কেন ?

এবার শেখ মুজিবুর রহমানের আরেকটি বক্তব্যের বিচার করা যাক। তিনি বলেছেন, বিগত তিন বছরে তার দলীয় ৫ জন পরিষদ সদস্য খুন হয়েছেন। তারপর শ্লেষাত্মক ভাষায় তিনি বলেছেন, "রাত্রির অন্ধকারে এরা মানুষ খুন করে। এটা নাকি বিপ্লব। এরা বিপ্লবী।" শেখ মুজিব কি

একজন "বিপ্লবী" বলে দাবী করেন। একের পর এক "বিপ্লব" করে চলেছেন তিনি। এই মুহূর্তে চলেছে তাঁর তথাকথিত "দ্বিতীয় বিপ্লব।" তাঁর "বিপ্লবের" বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষ খুন করা। উপরে আমরা অসংখ্য ঘটনার মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর দলীয় "বিপ্লবীদের" প্রতি যদি তিনি কটাক্ষ করে উপরের কথাগুলি বলতেন তাতে আপত্তি এবং নিন্দা করার থাকলেও আমরা আপাততঃ নীরব থাকাটাই সমচীন মনে করতে পারতাম কেননা, "বিপ্লবের ধারায় যদি দলীয় খুনীরা কিছু পরিমাণ শায়েস্তা হয় তাঁর নিজের 'বিপ্লবীদের'' চোখ খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তিনি কটাক্ষ করেছেন দেশের খাঁটি বিপ্লবীদের প্রতি এবং তাদেরকেই তিনি তার বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা হত্যা করে চলেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে তার দলীয় ৫জন পরিষদ সদস্য কি খাঁটি বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন? প্রথম যে ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার ঘটনা (১) পরিষদ সদস্য জনাব নুরুল হক আত্তায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। মুজিব সরকার ধরে নিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এটা পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দলের কাজ না হয়ে পারেনা কারণ ঐ অঞ্চল বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আমাদের পার্টিই তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। কাজেই মন্ত্রী ফনী মজুমদার এবং বাকশাল নেতা রাজ্জাক কয়েকশত রক্ষীবাহিনী নিয়ে এলাকায় হাজির হন এবং জনসভায় আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে বক্তৃতা করেন। বাকশাল নেতা রাজ্জাক তার ঝাঁঝালো বক্তৃতায় ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রোশ প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন "আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য খুন হওয়ার পরিণতি কি হয় তা এই এলাকার জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আমি এসেছি।" জনগণকে নাকি তিনি উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবেও তাঁরা করলেন তাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সমগ্র এলাকার জনগণের উপর পাইকারী হারে গ্রেফতার মারপিট লুটতরাজের এক বীভৎস তান্ডবলীলা চালিয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন তারা। অথচ কয়েক দিন পর জানা গেল যে, জনাব নুরুল হকের হত্যাকারী একজন আওয়ামী লীগ কর্মী এবং প্রাক্তন মুক্তি বাহিনীর সদস্য। তিনি ইতিমধ্যে

গা ঢাকা দিয়েছেন, তারপর আর কিছুই শোনা যায়নি। সরকারও এমন চুপ হয়ে গেলেন, যেন কিছুই ঘটেনি। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে ক্ষতি-গ্রস্তদের বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেননি মুজিব ও তার সরকার।

(২) দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বরিশাল জেলার ভোলায়। পরিষদ সদস্য রতনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও শাসক দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই পরিণতি। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে, অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল দুইটি ঃ

(ক) শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বিক কোন এক নেতা দলীয় কর্মীদের মধ্যে রতনের প্রভাব বৃদ্ধিকে তার নিজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে গণ্য করেন ;

(খ) রতন ছিলেন ধুরন্ধর, সুচতুর ব্যক্তি। দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হতে দেখে তিনি জনগণের উপর স্বীয় প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর দলীয় সরকারের ভারতঘেঁষা নীতির সমালোচনায়, মুখর হয়ে উঠেছিলেন ক্রমশঃ এর সাথে যুক্ত হল অন্যান্য স্থানীয় কোন্দল। সন্ধ্যায় প্রাক্কালে রক্ষীবাহিনীর পোষাকের অনুরূপ পোষাকধারী কয়েক ব্যক্তি গুলী করে তাঁকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতদের অন্যতম সন্দেহে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের জনৈক চেয়ারম্যান গেরেফতার হয়ে হাজতে গেলেন। সম্প্রতি তিনি জামিনে খালাস হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে স্থানীয় বাজারে এক চায়ের দোকান আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারালেন। নিঃসন্দেহে প্রতিশোধমূলক এই হত্যাকাণ্ডটি এই বিয়োগান্তক নাটিকার শেষ অংক নয়।

(৩) বিগত ঈদের দিনে ঈদের জামাতে প্রকাশ্য দিবালোকেই কুষ্টিয়ার জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কিবরিয়া আততায়ীর ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন। ঘটনাটি শাসক চক্রগুলির আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি, কোনো বিপ্লবী দলের কাজ নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে ঃ এঘটনা আত্মগোপনকারী কোন কোন বামপন্থী দলের কাজ নয়। কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত সরকার তা ভালভাবেই জানেন। তৎ-কালীন মন্ত্রী এবং বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় পরিষদের বক্তৃতায়ে অবশেষে সত্যটি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাক্তন মন্ত্রী তাজুদ্দিন প্রকাশ্য জনসভাতেই অনেক আগেই বলেছেন : গুপ্তহত্যা বন্ধ করা কঠিন কাজ নয়, আমরা বন্ধ করতে চাইলে তা বন্ধ হয়ে যায়। অতি খাঁটি কথা। গুপ্তহত্যা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ। তারা নিজেরা হত্যাকান্ড বন্ধ করলেই গুপ্তহত্যা বন্ধ হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৪) কুষ্টিয়া জেলায় কিছু দিন পূর্বে মাছ শিকারে যাওয়ার পথে তাদের গাড়ীর উপরে ব্রাশ ফায়ার করে ৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে কারা হত্যা করেছিল তা কি সরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের অজানা ? ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তথাকথিত স্বাধীনতা যুদ্ধে কারো চাইতে অবদান কম ছিলনা বলে দাবী করার অধিকার যারা দাবী করতে পারেন বলে মনে করেন, অথচ শাসন ক্ষমতার অংশ থেকে বঞ্চিত, শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরে এই ধরনের উপদল যে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয় ? কেবল তাই নয়। এমনকি ক্ষমতাসীনদের গুপ্তঘাতকদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এই বিরোধ উন্মত্ত গুপ্তহত্যার পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য।

(৫) কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার ট্রেজারি লুট, রায়পুর থানা আক্রমণ, আওয়ামী লীগের বড় বড় চাঁইদের ক্ষেতের ও গোলার ধান লুট প্রভৃতি ঘটনা যে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের এককালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই ফল তা স্বয়ং শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের ভালভাবেই জানা আছে, কিন্তু কোন এক জায়গায় এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থের এমন একটি গভীর সংযোগ রয়েছে যে, তাঁদের পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কিছু বলা বা করা সম্ভব নয় কিছুতেই স্বয়ং শেখ মুজিব সব কিছুই জানেন এবং বোঝেন। রুশ, ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

বে-আইনী অস্ত্র কাদের নিকট কি পরিমাণ আছে এবং কাদের নিকট কি পরিমাণ আছে এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ঐসব দেয়া

হয়েছে এই সবই শেখ মুজিবের সবচাইতে ভালো জানা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মুজিব প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে তোলা তাঁর দলীয় সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনীর হাতে বে-আইনী অস্ত্র রাখতে দেবেন এবং তাদের দ্বারা হত্যাকান্ড চালাতে থাকবেন (উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর, রায়পুর, সিকান্দি প্রভৃতি থানার চারিটি বাহিনীর নাম ধামসহ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি) আর প্রতিপক্ষকে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণের নির্দেশ বা 'উপদেশ' দেবেন এবং তা করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যত আশ্বাসবাণীই প্রচার করুন না কেন, তাতে কোন ফল হবে কি? কারণ, অস্ত্র সমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে বে-আইনী অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা যখন শেখ মুজিব নিজের হাতে রেখেছেন, তখন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না" বলে তাঁর প্রদত্ত আশ্বাস বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষকে সুকৌশলে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত নিছক ধোঁকাবাজি তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না।

আহত আ স ম আবদুর রব —গণকণ্ঠ
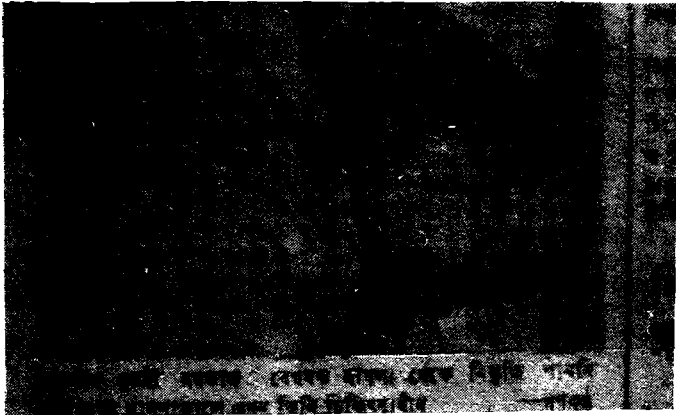
আহত মমতাজ বেগম —গণকণ্ঠ
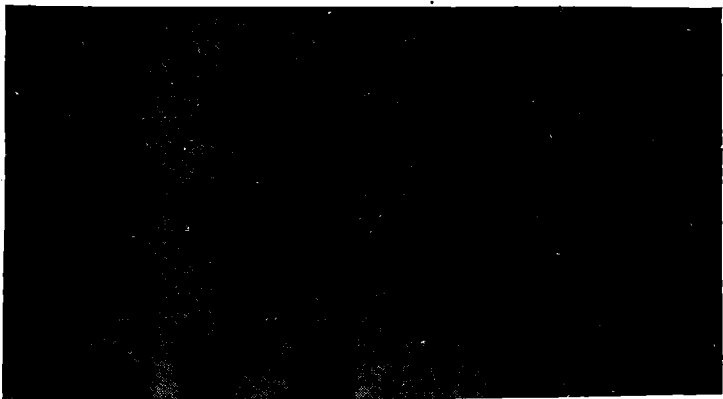
আহত কয়েকজন—গণকণ্ঠ

অধ্যায় ঃ দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিভীষিকার বর্ণনা

আওয়ামী লীগ-শাসনামলে সরকার সংবাদপত্রের উপর কঠোর খড়গ-হস্ত থাকা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশী-বিদেশী পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এসব রিপোর্ট ছাপার অপরাধে দেশের বহু পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশী অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। আমি বিষয়সূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু রিপোর্ট দেশী-বিদেশী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

বিদেশী পত্রিকা

ফ্রন্টিয়ার কলিকাতা :
ভলিউম বি, নং-২

'তাহলে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং নাগরিক অধিকার মুলতবী রাখার রাজনৈতিক গুরুত্ব কি? নিঃসন্দেহে মুজিবের প্রথম উদ্বেগের কারণ হচ্ছে বামপন্থী দল ও উপদলগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের রাজনীতি এতোটা একদলীয় হয়ে গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তাঁর গুপ্ত পুলিশ ও আধা-সামরিক মিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী। গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।'

'ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল থানা) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এ এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে সিরাজ শিকদারের দলের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং গত তিন বছরের শেষেও তারা কার্যতঃ এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'প্রত্যক্ষদর্শীর হিসেব মতে, রক্ষীবাহিনী গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই অন্ততঃ এক হাজার ৫শ' কিশোরকে হত্যা করে। এদের অনেকেই সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি (ই বি পি পি)-এর সদস্য ছিলো। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিলো। এমন কি, অনেক বাঙালী যুবক, যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রিয় ছিলো না, তারাও এই সন্ত্রাসের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে। রক্ষীবাহিনী কি করে মস্তকবিহীন দেহে 'সিরাজ সিকদার' নামাংকিত পোস্টার পেরেক দিয়ে এঁটে লাশ সদর রাস্তায় ফেলে দিয়েছে তার বর্ণনা নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার অভাব নেই। যারা সৌভাগ্যবশতঃ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে তাদের মুখে মধ্যযুগের অত্যাচার পদ্ধতি অনুসৃত হবার কথা শোনা যায়। অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদণ্ড, সূচ, গরম পানি ও অন্যান্য গার্হস্থ্য সামগ্রী। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উদঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া এসব হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে শরীরের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তার জের চলে সারা জীবন। ...... ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এর প্রধান দিক হচ্ছে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিভিন্ন সংবাদপত্র (বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাপ্তাহিক-ইকনমিস্ট) মত প্রকাশ করেছে যে, দ্বিতীয় বিপ্লব প্রবর্তনে মুজিবের নিজস্ব উদ্দেশ্য হলো প্রধানত তার নিজের অহমিকা চরিতার্থ করা এবং রাজনৈতিক গৌরবের অন্বেষণ—যে গৌরব পাগলামির নামান্তর।

জো গ্যাণ্ডেলম্যান :
শিকাগো ডেইলী নিউজ
২৩ জুন—১৯৭৫

'জনৈক বিদেশী সাংবাদিক একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করার পর স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ

সরকারের কাছে প্রিয় আলোচ্য বিষয় নয়। নীরব হুকুম জারি হলো, উক্ত সাংবাদিককে ফের বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এই স্পর্শকাতরতা কেন? সম্ভবতঃ এ জন্যই যে, রক্ষীবাহিনী বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ একটি আধাসামরিক প্রতিষ্ঠান। অথবা রক্ষীবাহিনীর বিরতকর সংখ্যা এর কারণ হতে পারে। এখনই এর সংখ্যা ২৫ হাজার। এবং পরিকল্পনা থেকে বুঝা যায় যে, যখন চূড়ান্ত রূপ নেবে তখন রক্ষী-বাহিনী পাকিস্তান, এমনকি বৃটিশ আমলে যে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হতো তা ছাড়িয়ে যেতে পারে।'

"জাতির পিতার" নামে রক্ষীবাহিনী ব্যাপক উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। বস্তুতঃ এর প্রতীক হচ্ছে একটি আর্মব্যান্ড। আর্মব্যান্ডের ছবিতে তর্জনী উপরের দিকে উঁচিয়ে আছে যা মুজিবের সচরাচর বক্তৃতাকালীন ভঙ্গীকে প্রতিফলিত করে। বাঙালীরা বলেন, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে যা করা হতো তা থেকে এ আদৌ তফাৎ নয়। একমাত্র রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে লোকজন মুখ খুলে কথা বলে। ঢাকার অবস্থানরত জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলেছেন, "ঢাকায় বিখ্যাত প্রেসক্লাবে যারা সব রকম বিষয়ে কথা বলতেন এখন তারা শুধু আবহাওয়া, কানাডা—এ ধরনের বিষয়ে কথা বলেন।" আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দমন করা ছাড়াও সরকার সাংবাদিকদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পক্ষে শুভ নয়। হংকং নিউজ ম্যাগাজিনে মুজিবের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জনৈক সাংবাদিককে বাংলাদেশের নিউজ এজেন্সি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

পিটার গিল:

ডেইলি টেলিগ্রাফ

লণ্ডন: ২৭শে জানুয়ারী—১৯৭৫

একমাস আগে শেখ মুজিব জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, কয়েক-জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বামপন্থী গেরিলা নেতা সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরী আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সুশাসন—বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছুই নেই—পুনঃপ্রতিষ্ঠা সন্দেহ কিনা।'

রিডার্স ডাইজেস্ট

মে—১৯৭৫

'জনগণের মধ্যে শেখের যাদুকরী ইমেজ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। এই পটভূমিতে শেখের পদক্ষেপগুলোও ক্রমেই নির্দয় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবতকাল পর্যন্ত অন্ততঃ দু'হাজার আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন। শেখ মুজিব দু'টি বেসামরিক সংগঠনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে তার ভাগিনার নেতৃত্বাধীন একলাখ সশস্ত্র একগুঁয়ে যুবকের সংগঠন যুবলীগ। এটি জাতীয় "শুদ্ধি অভিযানে" নিয়োজিত। অপরটি হচ্ছে তার (মুজিব) নিরাপত্তাবাহিনী, নিষ্ঠুর রক্ষীবাহিনী। শেষোক্ত দলটি যে কোন কারণে যখন-তখন বন্দুক উঁচিয়ে কারখানায় প্রবেশ করে, শ্রমিক নেতাদের উপর খবরদারি করে, গ্রাম এলাকায় আকস্মিক কারফিউ জারি করে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। এরা লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এমন নির্মম নির্যাতন চালিয়ে থাকে, যার পরিণতিতে এ যাবত বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।'

নিউজ উইক :

১৫ই জুলাই—১৯৭৫

'রক্ষীবাহিনী' নামক একটি আধা-সামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে যেয়ে আজো পাকিস্তানী আমলের মতোই জনগণ ভয়ে কেঁপে ওঠে।......সম্প্রতি জনৈক মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাওকারী একটি মিছিলের ওপর রক্ষীবাহিনীর মেশিনগান উত্থিত হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় এরা উক্ত মিছিলের ১৯ জনকে হত্যা করে। নাগরিক অধিকার এবং আইন সাহায্যকারী কমিটির ১৬০ জন সদস্য গত সপ্তাহ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রক্ষীবাহিনীর নিন্দা করেছে। সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে উক্ত কমিটি অভিযোগ করে।'

কেভিন রেফার্টি

ফিনানসিয়াল টাইমস, লণ্ডন

১৬ই আগস্ট—১৯৭৫

'চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজী হলেন না, বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। বিশেষ সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী মুজিবের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রতি সেনাবাহিনীর বিশেষ বিরাগ ছিল। সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার মন্তব্য করেছিলেন যে, রক্ষীবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম, কেননা তারা স্থানীয় গুন্ডাদের তুলনীয় উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঠগদের নিয়ে গঠিত।

'কার্যতঃ মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শংকিত হয়ে পড়ল। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশী দুর্নীতিবাজদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।'

মার্টিন উলকাট

গার্ডিয়ান (লণ্ডন)

১৬ আগস্ট—১৯৭৫

'১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিলো। এরপরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা-ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেতো। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিলো। লক্ষ্য ছিলো আরো অনেক বেশী। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যেভাবে সরকার তাদের অনুগ্রহ দেখাতো তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। প্রচুর টাকা খরচ করা হতো রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরির জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই পেতে রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেলে সজ্জিত করার আলাপ-আলোচনা চলছিলো। অথচ সেনাবাহিনীর হাতে পুরনো ৩০০ রাইফেলের বেশী কিছু নেই।'

অমিত রায় : সানডে টেলিগ্রাফ :
লন্ডন : ১৭ আগস্ট—১৯৭৫

'সমস্যার মোকাবেলা না করে মুজিব গুণ্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী আর বিদ্রোহ করার সাহস না পায়। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেখতে পেলেন যে তাদের অধিনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিংগিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিলো। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরা-কারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগলে, তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সবকিছু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

নিউ স্টেটসম্যান, লণ্ডন
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

'সদ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠা তরুণ বাঙালীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শরাবখানায় ভিড় জমায়। তারা বেশ ভালই আছে।......রাজনৈতিক দালালী করে ও ব্যবসায়ীদের পারমিট জোগাড় করে তারা আজ ধনাঢ্য জীবন-যাপন করছে। সরকারী কর্মচারীদের তারা ভয় দেখাচ্ছে। নেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্র প্রয়োগ করছে। এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাইকরা পোষ্য। আওয়ামী লীগের ওপরতলায় যারা আছেন তারা আরো জঘন্য। যাদের মুক্ত করেছেন সেই জনসাধারণের মেরুদণ্ডটি ভেঙ্গে তারা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছেন।'

ডেভিড হার্ট
ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিয়্যু
হংকং, ১০ জানুয়ারী—১৯৭৫

গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে (১৯৭৪ সালের) গ্রাম বাংলায় দৈনিক গড়ে ৭টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই খুনের শিকার হয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা অথবা তাদের সমর্থকরা। প্রতি-শোধ নিতে গিলে আওয়ামী লীগের অনুচররা এবং সরকারী এজেন্সিগুলো গ্রাম বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে জনসাধারণকে সরকারের কাছ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। জরুরী আইনে ন্যাস্ত 'স্পেশিয়াল' ক্ষমতার বলে শেখ মুজিব স্বয়ং কিংবা তার দল যাকেই 'বিপজ্জনক মনে করবেন তাকেই জেলে পুরতে পারবেন, আর এভাবে বংলাদেশে আজও যেটুকু সরকার বিরোধিতা টিকে আছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।'

'শেখ মুজিবকে চলে যেতে হয়েছে। কারণ তিনি নির্মমভাবে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করেন। এর বিরুদ্ধে চলার মতো সরকারের যদি কোন বক্তব্য থাকে অথবা যদি কোন সাক্ষী-সাবুদ থাকে তাহলে তা বলা বা দাখিল করার জন্য আমি সরকারকে আহ্বান জানাই।'

(কর্ণেল (অবঃ) ফারুক রহমানের জবানবন্দী : সানডে টাইমস (লন্ডন) ২৬মে, ১৯৭৬)

দেশী পত্র-পত্রিকা

দেশী পত্রিকার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃতি নিয়েছি দৈনিক গণকন্ঠ থেকে, কারণ দৈনিক গণকন্ঠই তখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সাহসীভাবে সোচ্চার ছিলো। গনকণ্ঠে রিপোর্টে অবশ্য জাসদ ও জাসদের অঙ্গ সংগঠন রব-শাহজাহান সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং জাসদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের উপর আক্রমণ নির্যাতনের খবরই বেশী ছাপা হয়েছিলো।

'কাজী শামীম লিখেছেন: প্রত্যক্ষভাবে ২৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মী হত্যার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার দায়ী। তাদের সাড়ে তিন বছরের-শাসনে সমগ্র বাংলাদেশে সংগঠিতভাবে চালানো হয় রাজনৈতিক নিপীড়ন,

খুন ও গুম। সে সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা এরা দেখায়নি, নির্যাতনের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। '৭২ থেকে '৭৫ সালে বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল থেকে বের করে খুন করা হয়েছে। খুন করা হয়েছে প্রকাশ্য মিছিলে গুলী করে। বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, এরকম হাজারো দৃষ্টান্ত করুণ স্মৃতি হিসেবে এখনো এ দেশের জনগণের হৃদয়ে জীবন্ত।'

'এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট) ছেলের বিমান কর্মচারীদের মিছিলে প্রকাশ্য গুলীবর্ষণের ঘটনাটা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা '৭৪ সালে মতি-ঝিলের কাছে বিমান কর্মচারীদের মিছিলে গুলীবর্ষণ করে, বিমান কর্ম-চারী নূর মোহাম্মদকে হত্যা করে। পরে নূর মোহাম্মদের লাশ ৩০ মীরপুর রোডস্থ তৎকালীন ছাত্রলীগ অফিসে এনে ফেলে রাখা হয়েছিলো। তখন আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনের সব কটি অফিস রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও তৎ-কালীন নেতৃবর্গের মফঃস্বলের বাড়ীগুলোও এ কাজে ব্যবহৃত হতো। এসব বাড়ীতে ভাড়াটিয়া খুনীর দল পোষা হতো। ভাড়াটিয়া খুনীরা নেতার নির্দেশে খুন করতো এবং নিরীহ জনগণকে ধরে এনে নির্যাতন চালাতো। মানিকগঞ্জ এবং বিক্রমপুর নিবাসী দু'জন আওয়ামী লীগ মন্ত্রীর বাড়ীতে এ ধরনের কার্যকলাপের অনেক ঘটনা স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। পক্ষান্তরে এই আমলে একটা আধা-সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছিলো। সত্যিকার অর্থে এই বাহিনী ছিলো একটি আতংক এবং দুঃস্বপ্ন। এ নাম ছিলো রক্ষীবাহিনী।'

আওয়ামী রাজনৈতিক নিপীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক রাজনৈতিক নেতা একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, '৭৩ সালে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার মহকুমা পর্যায়ে কর্মীদের রাইফেল, স্টেনগান প্রভৃতি সরবরাহ করে ঢালাও হত্যার

নির্দেশ দেয়। বলা হয়, সে সময়ের অনেক রাজনৈতিক হত্যার সঙ্গে মন্ত্রীরাও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। খুলনায় একজন রাজনৈতিক নেতা জানিয়েছেন, খুলনার একজন রাজনৈতিক কর্মী তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে এলে পরদিনই ঢাকার লালবাগের কাছে তার লাশ পাওয়া যায়।

(সাপ্তাহিক সংহতি ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৪)

সর্বহারা পার্টির কর্মীদের উপর সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে সাপ্তাহিক বিচিত্রা লিখেছে ঃ

'এই দ্রুত অবনতিশীল সম্পর্ক এবং তিক্ততা ও সংঘাতের জন্য সিরাজ সিকদার সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে দায়ী করেছিলেন। তার মতে, ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে গিয়ে 'ছয় পাহাড়' তথা ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজি-বাদ ও সামন্তবাদের 'দালালে' পরিণত হয়েছেন। এদের প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়েছেন, পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে বন্ধক দিয়েছেন এবং দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনীকেও তাদের তাঁবেদারে পরিণত করেছেন। পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' বর্ণনা করে সিরাজ সিকদার বলেছিলেন, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে (আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী) আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলংকিত করেছে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করার ঘৃণ্যপ্র চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশপ্রেমিকের বেশে 'ছয় পাহাড়ের দালাল' শীর্ষক ইশতেহার, অক্টোবর, ৭১ দেখুন ঃ রচনা সংকলন প্রথম খণ্ড পৃঃ—৪০-৫৭।]'

'বস্তুতঃ সিরাজ সিকদারের অভিযোগটি ভিত্তিহীন ছিলো না ঃ জুলাই পরবর্তী অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি ও কাউখালি অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির তিনটি

ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে গেরিলাদের বন্দী করা হয়, স্বরূপকাঠিতে প্রাণ হারান চারজন। পেয়ারা বাগানের হেডকোয়ার্টার, গৌরনদী ও মঠবাড়িয়ার বিরাট মুক্ত এলাকা মুক্তিবাহিনী আক্রমণের মুখে দখল করে নেয়, হাসান ও হিমুসহ হত্যা করে কয়েকজনকে; গেরিলা শিখার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়, তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সরাসরি আক্রমণের পাশাপাশি ছলচাতুরীর পথেও সর্বহারা পার্টিকে ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালানো হয়। টাঙ্গাইলের নাগরপুরে, বরিশালের পাদ্রি-শিবপুরে এবং ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে গেরিলাদের আলোচনা ও সমঝোতার মিথ্যা কথা বলে। ডেকে নেয়া হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই গেরিলারা বিশ্বাসঘাতকতার মুখে পড়েন। টাঙ্গাইলে দু'জনকে কাটা ঘায়ে লবণ ছিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, কালকিনীতে দু'জন এবং পাদ্রিশিব-পুরে মাসুমসহ একজন গেরিলা মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকায় নরসিংদী অঞ্চলে, বরিশালের মেহদিগঞ্জেও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই সংঘাত চলতেই থাকে, টাঙ্গাইলের অধিনায়ক নজরুল ছিলেন এর সর্বশেষ শিকার: স্বাধীনতার পর তাকে প্রকাশ্য জনসভায় বেয়োনেটের আঘাতে হত্যা করা হয়। [তথ্যগুলো পূর্বোক্ত ইশতেহার এবং '৭২ সালের মার্চে প্রকাশিত অপর একটি ইশতেহার থেকে সংগৃহীত, দ্বিতীয়টির জন্য দেখুন: রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড পৃঃ-৭৭-৯৫] এর ফলে সর্বহারা পার্টির গেরিলাদের পক্ষে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং যুদ্ধ পরিচালনা করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে মুক্ত, এলাকাগুলিরও ক্রমাগত পতন ঘটতে থাকে। ব্যতিক্রম ছিলো কেবল বরিশাল জেলার কয়েকটি অঞ্চল: সর্বহারা পার্টির শক্তিশালী সংগঠন এবং নিরাপদ পশ্চাদপসরণের উপযোগী বিস্তৃত মুক্ত এলাকা থাকায় শেষ পর্যন্তও এখানে পার্টি টিকে থাকে। এই অঞ্চলের অভিযানগুলিতে সিরাজ সিকদার স্বয়ং নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

('৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির ভূমিকা: বিচিত্রা স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা—৮৭)

আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হত্যার ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে আলোড়িত করেছিলো সিরাজ সিকদার হত্যার ঘটনাটি। তাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল এ নিয়ে পরে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। তবে সরকার যে ভাষ্যটি দিয়েছিলো সেটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা। তাকে গ্রেফতার ও হত্যা সম্পর্কে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখা হয় :

'সিরাজ সিকদার কিভাবে গ্রেফতার হন এবং পুলিশী নিরাপত্তায় কিভাবে তার 'মৃত্যু' ঘটে তার সঠিক সরকারী ভাষ্য এখনো জানা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাকে নির্ভর-যোগ্য মনে করেই আমরা তা প্রকাশ করছি।'

'১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন সিরাজ সিকদার। এর আগেই তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন তাকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।'

ডিসেম্বরের ('৭৪) প্রথম থেকেই তার দলের উপর ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে। হরতাল আহ্বানের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রেফতার হয়ে যায় বহু কর্মী। অপরদিকে, ১৯৭২ সালে দল পরিচালনার জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়, ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে তার অবস্থা দাঁড়ায় ২ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি। সেপ্টেম্বর মাসে আর একজন সদস্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারিত হলে, অবশিষ্ট থাকেন শুধু সিরাজ সিকদার।

সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ছাত্রাবস্থায়। ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি জড়িত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর সংগে, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে। ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী কয়েকজন সমমতাবলম্বীকে নিয়ে সিকদার গঠন করেন 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নামে একটি 'প্রস্তুতি' সংগঠন। এই আন্দোলনকেই তিনি পার্টিতে রূপান্তরিত করেন ১৯৭১-এর ৩রা জুন, বরিশাল জেলার পেয়ারা বাগানে। ১৯৭২-এর ১৪ই জানুয়ারী

এ পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে সাংগঠনিকভাবে এর বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সময়ে কিছু ব্যক্তি এই সংগঠনে যোগদান (লেঃ কর্ণেল (অবঃ) জিয়া উদ্দীন প্রমুখ) এবং সবশেষে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের হরতালের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শক্তি জোগায়।

১৯৭৪ সালে ব্যাপক বিকাশের সময় তার দলে ব্যাপক অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঘটে বা পরবর্তীতে তার গ্রেফতারের কারণ।

গ্রেফতারের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে এবং বিভিন্ন সূত্রে সে সংবাদ পেয়ে সিরাজ সিকদার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ই জানুয়ারী আরো গোপন অবস্থানে সরে যাবেন।

তার দলের অভিযোগ, ১৯৭৪ সালেই জনৈক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার 'ভাগনে' এই দলের সদস্যপদ লাভ করে। তার মাধ্যমে সিরাজ সিকদারকে পাঠানো সবগুলো সতর্কীকরণ চিঠিই পুলিশের হাতে পৌঁছে যায়। এভাবেই পুলিশ জানতে পারে, তার চট্টগ্রাম বৈঠকের (১লা জানুয়ারী) কথা।

চট্টগ্রাম (হালিশহর) বৈঠকে আমন্ত্রিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগে, নিয়ম ভঙ্গ করে একজন সদস্য বাইরে চলে যায়, ঘুরে আসার কথা বলে। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

নিরাপত্তার কারণে, সে বৈঠকে নির্ধারিত হয়েছিলো, সকলের আগে 'কুরিয়ার'সহ বেরিয়ে যাবেন সিরাজ সিকদার। সেই মোতাবেক মহসিনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েন সিরাজ সিকদার।

কিছুদূর গিয়েই তারা একটি বেবিট্যাক্সী ভাড়া করেন। এ সময়ে তার পরনে ছিল ঘিয়া রংয়ের প্যান্ট, টেট্রনের সাদা ফুলশার্ট, চশমা এবং হাতে ছিল একটি ব্রীফ কেস।

হালিশহরে বৈঠকের শেষে যখন তারা বেবীট্যাক্সীতে উঠছেন ঠিক সে সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে 'লিফট' চায়। সিরাজ সিকদার জানতে চান—

—আপনি কোথায় যাবেন ?

—আমি সামনে গিয়েই নেমে যাব।

—অন্য ট্যাক্সি দেখুন না।

—আপনারা যদি আমাকে নিয়ে যান, তাহলে খুবই উপকার হয়। (অনুনয়ের সঙ্গে)

এরপরই সে ট্যাক্সীতে চড়ে বসে।

পুলিশ পূর্বের সংবাদ অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহর থেকে হালিশহর পর্যন্ত পুরো রাস্তার উপর কড়া নজর রেখেছিলো। বেবীট্যাক্সী যখন নিউ-মার্কেটের (বিপণী বিতান) কাছে আসে তখনই সেই অনাহূত সহযাত্রী ট্যাক্সী থামাতে বলেন।

এ পর্যায়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগন্তুক লাফ দিয়ে বেবীট্যাক্সীর সামনে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারকে থামাতে বলে। ভয়ে ড্রাইভার রোধ করে গতি। আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে স্টেনগান হাতে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘেরাও করে ফেলে বেবীট্যাক্সী।

ঘটনার আকস্মিকতায় জমে যায় লোকজন। একজন ভদ্রলোকের এই পরিণতির কারণ জানতে চাইলে জবাব দেয়া হয়—'সে একজন পলাতক কালোবাজারী। তাই তাকে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

বেবীট্যাক্সী আটক করার পরপরই, ছয়জন স্টেনগানধারীর একজন এগিয়ে এসে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয় এবং চোখ বেঁধে ফেলে। সঙ্গী মহসীনেরও ঘটে একই পরিণতি।

গ্রেফতারের পর সিরাজ সিকদারকে নিয়ে যাওয়া হয় ডবলমুরিং থানায়। এই থানা থেকেই খবর পাঠানো হয় সর্বত্র এবং জরুরী ভিত্তিতে সেদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-ঢাকা বিমানে বন্দীদের জন্য আসন সংগ্রহ করা হয়। ৬·৪৫ মিঃ যে বিমানে তাদের ঢাকা নিয়ে আসা হয়, সে বিমানটি যাত্রী নিয়ে আসছিলো কক্সবাজার থেকে। চট্টগ্রাম পেঁছার পর, নিয়মভঙ্গ করে ঢাকাগামী যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়।

যাত্রীরা নেমে গেলে একটি বিশেষ গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয় বন্দীদের। ককপিটের পরেই, সামনের চারটি আসন সংরক্ষিত করা হয় তাদের জন্য।

কিন্তু বিমান ছাড়ার সময় দেখা দেয় বিপত্তি। বিমানের পাইলট বন্দী অবস্থায় কোন যাত্রীকে বহন করতে অস্বীকার করেন। কিছুটা বাকবিতন্ডার পর ঢাকার উদ্দেশে পাড়ি জমায় বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফকার বিমানটি।

ঢাকা পেঁছানোর পরপরই, তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দেয়া হয় যাত্রীদের। তারপর বিমানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় হ্যাঙ্গারের কাছে। আগে থেকেই পেছনের গেট দিয়ে আসা পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিলো সেখানে।

বিমান থেকে অবতরণের সময় আকস্মিকভাবে পুলিশের জনৈক ইন্সপেক্টর দৌড়ে এসে তার বুকে লাথি মেরে চীৎকার করে ওঠে। 'হারামজাদা' তোর বিপ্লব কোথায় গেল ? এ পর্যায়ে উপস্থিত পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা হস্তক্ষেপ করে নতুন আক্রমণের হাত থেকে সিরাজ সিকদাররে রক্ষা করে। এবং মন্তব্য করে—'এত অস্থির হচ্ছ কেন কা...... ...ঘরে নিয়েই আমরা দেখে নেবো।'

বিমানবন্দর থেকে সিরাজ সিকদারকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। সেখানে 'পাগলা ঘন্টি' বাজিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয় সবাইকে। সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে যায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস ঘিরে ফেলে কয়েকশ পুলিশ। এ বক্তব্য, সে সময়ে আটক এক রাজনৈতিক কর্মীর।

সিরাজ সিকদারকে যখন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় তখন সামনে-পেছনে ছিলো কড়া প্রহরা। জানা যায়, সাইরেন বাজিয়ে সরিয়ে দেয়া হয় রাস্তার লোকজন। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় 'কমিউনিস্ট টাস্ক ফোর্স' এবং রক্ষীবাহিনীর উপর।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে আসার পর কর্তাব্যক্তিদের ভিড় বেড়ে যায় সেখানে। সবাই এই মূল্যবান বন্দীকে এক নজর দেখতে চায়। কিন্তু নিরা-

পত্তার কারণেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী বা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টের পদমর্যাদার নীচে কাউকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন পুলিশের নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা।

গ্রেফতার সত্ত্বেও, পুলিশের লোকজনও প্রাথমিক পর্যায়ে তার পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। তাই স্পেশাল ব্রাঞ্চে আটক তার দলীয় কয়েকজন কর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রাথমিক হেফাজতেই তার ওপর চালানো হয় অত্যাচার। অত্যাচারে কথা বের করতে ব্যর্থ হলে শুরু হয় কথোপকথন ঃ

—আপনি জানেন, আপনার পরিণতি কি?

—আমি জানি, একজন দেশপ্রেমিকের পরিণতি কি হতে পারে তা ভালোভাবেই আমার জানা আছে।

—আমরা আপনাকে শেখ সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলব।

—জাতীয় বিশ্বাসঘাতকের কাছে একজন দেশপ্রেমিক ক্ষমা চাইতে পারে না।

—তাহলে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

—সে মৃত্যুকেই আমি গ্রহণ করব, সে মৃত্যু দেশের জন্য মৃত্যু, গৌরবের মৃত্যু।

(কথোপকথন রেকর্ডকৃত ভাষা নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মহল যা জানিয়েছেন তার মর্মার্থ এই)

এ পর্যায়ে টেলিফোনে নির্দেশ আসে উপস্থিত পুলিশের জনৈক উর্ধ্বতন কর্তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় পাততাড়ি গুটানোর পালা। কোথায় যেতে হবে কেউ জানেন না। জানেন শুধু কয়েকজন।

রাত দশটার দিকে চলতে থাকে এক সাঁজোয়া বাহিনী। এবারের গন্তব্যস্থল গণভবন। সেখানে অধীর আগ্রহে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অপেক্ষা করছেন বেশ কিছু লোক।

রাত সাড়ে দশটায় পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে হাজির করা হয় শেখ মুজিবের সামনে। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তখন আলাপে ব্যস্ত ছিলেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। এ সময় সিরাজ সিকদার প্রশ্ন করেন—

—রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্যবোধ কি আপনার নেই?

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে থেকে একজন পুলিশ সুপার এগিয়ে এসে পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন।

গণভবনে কথা কাটাকাটির পর তাকে নিয়ে যেতে বলেন শেখ মুজিব। রাত তখন বারোটা।

মধ্যরাতেই সোরগোল বেধে যায় শেরেবাংলা নগরের তৎকালীন রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে। তাড়াহুড়ো করে সেখানে আটক অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র।

সমগ্র এলাকা আলোকিত করে জ্বালিয়ে দেয় হয় সার্চ লাইট। পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে রক্ষীবাহিনী। সকলের মুখে গুঞ্জন, ফিসফিসানি। তখনও কেউ জানেনা, কাকে নিয়ে আসা হচ্ছে?

রাত সোয়া বারোটায় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী প্রধান অপারেশন প্রধানসহ হেটকোয়ার্টারে আসেন। এসেই ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার গার্ড থেকে সিরাজ সিকদারের দলের দু'জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে হেড-কোয়ার্টার কোয়ার্টার গার্ডে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।

রাত সাড়ে বারোটায় মহসিনসহ সিরাজ সিকদারকে নিয়ে আসা হয় রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে। তারপরই একজনকে আরেকজনের কাছ থেকে আলাদা করে নেয়া হয়।

রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের বিশেষ টিম ও রক্ষীবাহিনীর ১১ ব্যাটেলিয়নের এস, পি কোম্পানীর উপর।

পরবর্তী প্রহরগুলোয় তেমন উল্লেখ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। ২রা জানুয়ারী ভোর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় তাকে আটক রাখা হয় রক্ষীবাহিনী হেড-কোয়ার্টারে।

২রা জানুয়ারী' '৭৫ সকালে সিরাজ সিকদারকে কড়া প্রহরাধীনে নিয়ে যাওয়া হয় সাভারে। চারটি ডজ গাড়ি ও একটি টয়োটা গাড়ি অনুসরণ করে তাকে।

সাভারে তাকে সারাদিন রেখে দেয়া হয় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে।

সন্ধ্যার পর পুলিশের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত হন সেখানে। রাত ন'টার দিকে তাকে আনা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেকটু এদিকে। সেখানেই হাত বেঁধে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে গুলী করা হয় বলে অনুমান করা হয়।

পার্শ্ববর্তী এলাকার যারা গুলীর শব্দ শুনেছেন, তারা কেউ ভয়ে বের হননি। ভেবেছেন সে সময়ের নিত্যদিনের মতই একটি ঘটনা। পরদিন, অনেকেই রাস্তার উপর দেখেছেন জমাট বাঁধা রক্তের দাগ।

'মৃত্যুর পর তার লাশ নিয়ে আসা হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে নেয়া হয় কন্ট্রোল রুমে। তারপর পাঠানো হয় মর্গে।'

ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর এমনি মৃত্যু এদেশে বা বিদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু ঘটলে তা নিয়ে, দেখা দেয় প্রশ্ন। তাই প্রশ্ন উঠেছিলো চারু মজুমদারের মৃত্যুকে নিয়ে চে-গুয়েভারার মৃত্যুকে নিয়ে, হাসান নাসিরের মৃত্যুকে নিয়ে।

আর এই ১৯৭৮ সালে চে-গুয়েভারার মৃত্যু সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছে বলিভিয়ার প্রাক্তন সরকার প্রধানকে। বাংলাদেশের নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় সিরাজ সিকদারের মৃত্যু।

প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাকে সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব দিতে হয় এ প্রশ্নের, জনসভায় ব্যাখ্যা করতে হয় পরিস্থিতি। এ প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট জিয়াও বলেছেন, 'আইন তার নিজস্ব পথ বেছে নেবে।'

'সিরাজ সিকদারের পিতা দাবী করেছেন তদন্ত। জনগণ দাবী করেছেন তদন্ত। এখন প্রশ্ন—কখন এ ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত হবে শ্বেতপত্র।'

(সিরাজ সিকদার হত্যার নেপথ্য কাহিনী :
বিচিত্রা : ১৯ মে ১৯৭৮

এই ঘটনা সম্পর্কে সাপ্তাহিক সংহতিতে লেখা হয়ঃ ৯ জানুয়ারী ১৯৭৫ সাল। চট্টগ্রামের হালিশহরে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিতে এলেন সিরাজ সিকদার। তিনি আগেই খবর পেয়েছিলেন মুজিব সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। তাকে গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। একজন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে তিনি গোপন আস্তানায় চলে যাবেন।'

তিনি নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাথে জরুরী বৈঠক শেষে বেরিয়ে এলেন। চট্টগ্রাম নিউমার্কেটে ওঁৎ পেতে থাকা বাহিনীর হাতে তিনি গ্রেফতার হন। সেদিনই বিশেষ বিমানযোগে তাকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

'পরদিন তাকে হত্যা করা হয়। সরকারী ভাষ্য মতে, সাভারের নিকট তিনি পলায়নরত অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হন।'

সরকারী ভাষ্যটিতে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে সাধারণের ধারণা।

বিভিন্ন সূত্রে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, সিরাজ সিকদারকে ঢাকা বিমান বন্দর থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর উপর অত্যাচার চালানো হয়। এখানে তাঁকে বলা হয়েছিলো, আপনি কি জানেন আপনার পরিণতি কি ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন : একজন দেশপ্রেমিকের পরিণতি কি হতে পারে তা আমার জানা আছে।

তাঁকে শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমা চাইতে বলা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : জাতীয় বেঈমানের কাছে একজন দেশপ্রেমিক ক্ষমা চাইতে পারে না।

সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছিলো তাহলে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

তিনি জবাব দিয়েছিলেন : সে মৃত্যুকেই আমি গ্রহণ করবো।

সেদিন রাত দশটায় কড়া প্রহরাধীনে তাঁকে গণভবনে শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পেছন দিকে তাঁর দু'হাত বাঁধা ছিল। তাঁকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে শেখ মুজিব প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাথে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। তখন সিরাজ সিকদার শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্য কি আপনার নেই ?

এখানে তাঁর উপর আরেক দফা নির্যাতন চালানো হয়। এতে তিনি প্রচণ্ডভাবে আহত হন। ঐদিন রাতে অভুক্ত অবস্থায় তাঁকে আটকে রাখা হয়।

পরদিন ২রা জানুয়ারী সকালে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কড়া প্রহরাধীনে তাঁকে সাভার আনা হয়। এখানে তাঁকে সারাদিন রাখা হয়। রাত ন'টার দিকে তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এক স্থানে আনা হয়। সেখানেই হাত বেঁধে রাস্তার উপর সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে তাঁর বুক লক্ষ্য করে গুলী করা হয়।

মৃত্যুর পর তাঁর লাশ নিয়ে আসা হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চে। সেখান থেকে আনা হয় কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকে মর্গে। মেডিক্যাল রিপোর্টে তাঁর বুকে দু'টো গুলীর চিহ্নের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রমাণ করে তাঁকে পরিকল্পিতভাবেই বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

(সিরাজ সিকদার একজন বিপ্লবীর জীবনালেখ্য : আতা সরকার : সাপ্তাহিক সংহতি : ৮ জানুয়ারী, ১৯৮৪)

'আওয়ামী লীগের তেমনি আরও চারজন কৃতি সন্তান ছিলো ময়মনসিংহের বাজিতপুরের হত্যাকাণ্ডের মহানায়ক আবুলাল গং। তারা বাজিতপুরের একটি হাটে হাজার হাজার মানুষের সামনে চারজন মাঝিকে গাছে ঝুলিয়ে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। মাঝিদের অপরাধ ছিলো : তারা আবুলালদের বেআইনী টোল দিতে অস্বীকার করেছিল। স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী দল মালেক গ্রুপ আওয়ামী লীগ নেতারা সেই চারজন খুনীকে আপন দলের সদস্য (নাকি জল্লাদ ?) বলে শনাক্ত করে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড

প্রতিরোধ করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয়।
শোষিত মানুষের কি ভাগ্য! আন্দোলনের হুমকী দেয়, মি
মিটিং করে। তারা যে হত্যাকারী নয়—একথা প্রমাণ কর
আওয়ামী নেতারা। তারা বললেন যে, খুন করুক, ওরা যে
ছিলো। তারা যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল না স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্
দেয়। তবুও থামে না আওয়ামী লীগাররা। কিন্তু আবদুলাল
গুলীতে যারা হারিয়েছিলেন তাদের সন্তান, হারিয়েছিলেন
শিশু হারিয়েছিলো তার পিতা, ফ্যাসিবাদী এই শক্তি তাদের প্র
না সামান্যতম বেদনাও। এর নাম আওয়ামী লীগ। এ
রাষ্ট্রবিরোধীরাও আওয়ামী লীগের সম্মানিত সদস্য।'

(আওয়ামী লীগের কৃতি সন্তানরা : রেজোয়ান সিদ্দিকী :
ধ্বনি—১৮ জানুয়ারী ১৯৮১)

'বামপন্থী নিধন মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক নিবন্ধে সাপ্তাহিক
লেখা হয় :

'বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরি
সম্প্রতি এই নব স্বাধীনতালব্ধ দেশের দেশপ্রেমিক বামপন্থ
করার একটি মহা-পরিকল্পনা অনুযায়ী কতিপয় বিদেশী গো
কাজ করে যাচ্ছে। বামপন্থীদের সমূলে উৎখাতের এই প্র
কিছু নয়। তথাকথিত পাকিস্তানী আমলেও এ ধরনের পরিক
সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিলো। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর
দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীরও বামপন্থীদের সম্পর্কে এব
শত্রুতামূলক ও সন্দেহপ্রবণ মনোভাব রয়েছে। আর এই
পিছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে কতিপয় বিদেশী গোয়েন্দা সং
ভাবে এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে
ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। স্বাধীনতা সংগ্রাম
কিছুদিন আগে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ
কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই-এর একটি ষড়য
দলিল সম্পর্কে ইংগিত দেন। আর স্বাধীনতার পর সোভিয়েতে

প্রতিষ্ঠান কে, জি, বি এবং ভারতের কংগ্রেসী হায়েনাদের নরহত্যা উৎসবের প্রধান জল্লাদবাহিনী রুথলেস স্যাডের নতুন পরিকল্পনা সি, আই, এর নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এই রুশী-মৈত্রীর লক্ষ্যও হচ্ছে এ দেশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতে অনিচ্ছুক, ভারতীয় শাসক ও বণিক গোষ্ঠীর শোষণ বিরোধী, নিজ মাতৃভূমিতে লুটপাট সমিতি এবং ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রত প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।

বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। সংগ্রাম চলছে দেশীয় শোষক, সাম্রাজ্যবাদ আর সংশোধনবাদী চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, সংগ্রাম চলছে অবাধ চোরাচালান আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে, পারমিট লাইসেন্স শিকারীদের হাত থেকে শোষিত, লাঞ্ছিত মজলুম মানুষের মুক্তির স্বপক্ষে জনতার এই সংগ্রামী কাফেলাকে বিভ্রান্ত করে, ভয় দেখিয়ে, গুপ্ত হত্যা চালিয়ে এই দেশে দেশী-বিদেশী শোষক চক্রের আসনকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনারই একটা ধাপ হচ্ছে আজকের এই হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার অভিযান। এই একটি জায়গায় উল্লেখিত শক্তিগুলোর মহা-পরিকল্পনার আশ্চর্য মিল, অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের প্রতিটি মানুষ, প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলই নির্ভয়ে তাদের বক্তব্য বলতে পারবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের বলেই বিরোধী দলগুলো তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে, এটা আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী যেমন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করতো, বিরোধী দলীয় কর্মী ও নেতাদের ভারতীয় চর, কমুনিস্ট বলে চিত্রিত করত এবং ষড়যন্ত্র থেকে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও রেহাই পায়নি। আজ ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তে আর্জিত স্বাধীনতার পর বর্তমান সরকারের কাঁধেও যেন পাকিস্তানী ভূত ভর করে আছে।

তাইতো অবাধ চোরাচালান, সরকারী দলের পান্ডাদের লুটপাট, দ্রব্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললে দেশ-প্রেমের একক দাবীদার মহলটি এর মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত আর ষড়-যন্ত্রের গন্ধ পান। তাই তো স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ জননেতা আজীবন স্বাধীনতাকামী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে রাজাকার আর বদরবাহিনীর দোসর হিসেবে প্রচার করার ঘৃণ্য চক্রান্তের খেলা চলে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই নির্ভীক স্পষ্টভাষী বর্ষীয়ান নেতার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে ক্ষিপ্তপ্রায় এককালের জনদরদী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ এবং বর্তমানে অজস্র টাকা, বাড়ী, গাড়ী, আর লাইসেন্স-পারমিটের মালিক নেতৃবর্গ আর তাদের জী-হুজুরের দল একের পর এক মিথ্যা, ভিত্তিহীন কুৎসার জাল রচনা করে চলেছে এবং অবশেষে ব্যাপক গণহত্যার কর্মসূচী গ্রহণ করে উস্কানী-মূলক কাজের মাধ্যমে নরসিংদী, টঙ্গী, খুলনা, পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নীরিহ কৃষক-শ্রমিকের উপর আগ্নেয়াস্ত্রসহ আক্রমণ, সভা-সমিতি পন্ড এবং নেতৃবৃন্দের উপর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ, সর্বোপরি দিল্লী, মস্কো, ওয়াশিংটনের বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রগতিশীল কর্মীদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে বাংলাদেশে নতুন ইন্দোনেশিয়ার সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাদের আশু লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে যখন দেশের বুভুক্ষু, ক্ষুধিত মানুষের প্রশ্ন এড়ানো সম্ভব হয় না, নিজেদের কৃতকার্যের ফল ভোগ করার আতংক বিকারগ্রস্ত হয়ে এই খুনী আর লুটেরাদের চোখে তখন জ্বলে উঠেছে চক্রান্তের আগুন, রক্তের তৃষা আর হত্যার নীল স্বপ্ন।

কালোবাজারী আর দেশের সম্পদ বাইরে পাচার বন্ধ করা আর দুঃখী মানুষের স্বপক্ষে কথা বললে যদি কোন বিশেষবাদ বা বাহিনীর টার-গেটভুক্ত হতে হয় তা'হলে আমাদের বলার কিছু নেই। সোয়া লক্ষ বামপন্থী হত্যার পরিকল্পনা এক্ষেত্রে অপ্রতুল কেননা দেশের সাত কোটি মানুষের অন্তরের দাবীও আজ তাই—সুতরাং এদের সবার সম্পর্কেই

তাহলে পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। আমরা জানি, ইতিহাস তার পথ নিজেই সৃষ্টি করে—একটি রক্তবিন্দু থেকে জন্ম নেয় সহস্র রক্তকণা। সুতরাং ইতিহাসের চাকা উল্টো ঘুরানোর চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তা যেমন বুঝে নিতে বাধ্য হয়েছে, কেউ যদি সেই পথে অগ্রসর হয় তাদের অভিজ্ঞতাও যে অনুরূপ হতে বাধ্য, সে সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কিউবা আর লাতিন আমেরিকার ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রত্যেকেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সমাধান না করে রাজনৈতিক হত্যার আশ্রয় নিয়ে কোনদিন নিজেদের বাঁচানো যায় না। যুগের দাবী আর লাঞ্ছিত মানুষের অভ্যুদয় ভোরের সূর্যোদয়ের মতোই অনিবার্য।

(হককথা : ২ জুন—১৯৭২)

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমার নির্বাচন দেবার উদ্দেশ্য আছে। এমনি এমনি নির্বাচন দেই নাই। ৭ই মার্চের (১৯৭৩ সালের) বার আমি 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেব।'

(গণকন্ঠ : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২)

'শেখ মুজিবের পূর্ববর্তী শাসকেরা বামপন্থীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন একথা নিশ্চয়ই বলব না। কিন্তু শেখ মুজিবই বোধকরি বামপন্থী আন্দোলনকে প্রধান এবং একমাত্র শত্রু বিবেচনায় সর্বশক্তি নিয়োগপূর্বক তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল।'

(শেখ মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না ; রফীক চৌধুরী : নয়া পদধ্বনি : ১২ অক্টোবর ; ১৯৮০)

'প্রতিদিন আমাদের কাছে এমন অসংখ্য সংবাদ আসে যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ, গুলী করে হত্যা বা ডাকাতে-পুলিশে গুলী বিনিময়, সশস্ত্র ডাকাতি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এ সব হত্যা ও রাহাজানির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের খবর তেমন একটা আসে না।' (সোনার বাংলা, ২৮ মে, ১০৭২)

'অনুমান করা হচ্ছে যে, সমগ্র বাংলাদেশে দৈনিক গড়ে ৭০ থেকে ১০০টি আদম সন্তান দুবৃত্তদের হাতে খুন হচ্ছে।

(সোনার বাংলা জুন ৪, ১৯৭২)

'ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার পাটুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জনৈক কর্মকর্তা দলীয় কর্মীদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে জনৈক মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দিয়েছেন। এই অপরাধে পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া নারায়ণগঞ্জে চালান দিলে জনৈক এম-সি-এ হস্তক্ষেপ করিয়া এই নরঘাতকটিকে মুক্ত করাইয়াছেন।'

(হককথা, ২ জুন, ১৯৭২)

'খুলনা জেলার তালা থানায় সরকার যুবশক্তি নিধনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিরক্ষা ও শৃংখলা বিধায়ক বাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী-কেও লেলিয়ে দিয়েছেন। যারাই এমসিএ-দের দুর্নীতির সমালোচনা করছেন, তাদেরকেই গোপনে ভারতীয় সেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পাইকারীভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা চলছে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই পালিয়ে জীবন বাঁচাচ্ছেন বলে এক পত্রে জানিয়েছেন। মাওবাদী যুবফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধারা এখনো প্রচুর অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছেন। অথচ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার একপেশে নীতি গ্রহণ করে নিরীহ যুবকদেরকে হত্যা ও অত্যাচার চালিয়ে শৃংখলার নামে মারাত্মক বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছেন। ফলে যুবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।'

(হককথা : ৩০ জুন ১৯৭২)

'কুষ্টিয়া শহরে মুজিববাদ কায়েম হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে কাগজপত্রে মুজিববাহিনী নিষিদ্ধ হলেও কুষ্টিয়ার বিপ্লবী মুজিব বাহিনী সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছে। ভারতে কয়েক ট্রাক পাট পাচা-রের কেলেংকারির প্রধান নায়ক এম সি এ-টি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়েছেন। তার সব পাপ মাপ হয়েছে। তার কেলেংকারি যে ছাত্র নেতা ধরে ফেলেছিল বিপ্লবী মুজিববাহিনী তাকে

একদিন বেদম মারপিট করেছে। তাকে প্রহারের খবর ছাত্র নেতার নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার দু'একদিন পর শহর থেকে ১৪ মাইল দূরের আমলা সদরপুর থেকে হাজার হাজার লোকের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল এম সি এ-কে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে শহরের দিকে আসতে থাকলে কলংকিত এম সি এটি টেলিফোনে ঢাকায় মহাপ্রভুর সাথে যোগাযোগ করেন। ততক্ষণাৎ একটি হেলিকপ্টার এসে তাকে তুলে ঢাকায় নিয়ে যায়। মিছিল এগিয়ে এলে মুজিব বাহিনীর গুন্ডারা শহর ছেড়ে নদীর অপর পাড়ে পালিয়ে যায়।... ...মুজিববাদী গুন্ডাদের কীর্তিকলাপ স্থানীয় 'শান্তির ডাক' সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর ২৭শে মে পত্রিকা অফিসে হামলা চলে এবং সম্পাদকের বুকে রিভলবার ধরা হয়। থানায় জানানো হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। অবশ্য মুজিববাদীদের চাপে সাথে সাথে গুন্ডাদেরকে ছেড়েও দিতে হয়েছে। গত ২০মে (১৯৭২) মুজিব-বাহিনীর লোকেরা ১২টার সময় ল্যান্ডরোভার ধরনের একটি গাড়ি জোরপূর্বক নিয়ে যায়। সন্ধ্যার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, রহস্যজনক-ভাবে বিদ্যুৎও ছিল না শহরে, ডাকাতি করার জন্য হাসপাতালের গাড়ি নিয়ে ঐ দুর্বৃত্তরা বেরিয়ে গেলে থানার সম্মুখে টহলদার পুলিশের ট্রাকের সামনাসামনি পড়ে যায়। মুজিব বাহিনীর ডাকাতরা হঠাৎ করে পজিশন নিয়ে পুলিশের উপর এলোপাথাড়ি গুলীবর্ষণ শুরু করলে পুলিশ ট্রাকসহ পেছনে সরে থানায় যায় এবং শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসে। পরে হাসপাতালের গাড়িখানি একটা গাছের সাথে ধাক্কা লাগা অবস্থায় পাওয়া যায়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর কুষ্টিয়া শহরে নতুন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে ৫০ জন। সবাই মুজিব বাহিনীর লোক। এরা দখলকৃত বাড়ীতে বসে আরামে ব্যবসা চালাচ্ছে।

এগ্রোনমি অফিস থেকে জীপ অপহরণ করে ভিন্ন জেলার প্লেট লাগিয়ে মুজিব বাহিনীর নেতা ভাটে গাড়িটি চালাচ্ছে। এজাহার দিয়েও লাভ নেই। মুজিববাদে বিশ্বাসীদের উপর হাত তোলা সম্ভব নয়। অনেক গাড়ির সম্মুখে "বঙ্গবন্ধুর অনুমতিক্রমে" প্লেট লাগিয়ে চালানো হচ্ছে।
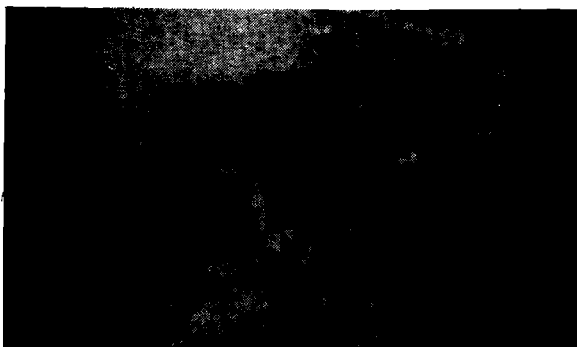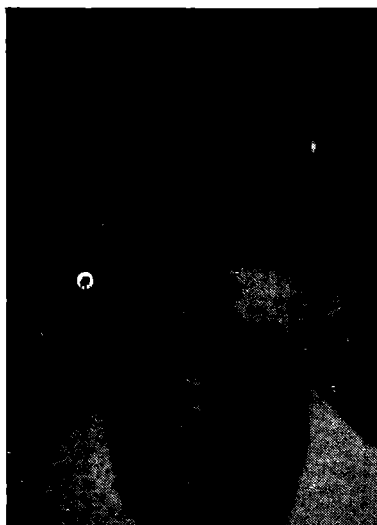
মুজিববাদ কায়েম হবার পর কুষ্টিয়াবাসীরা হাবিয়া দোজগতুল্য শাস্তিতে বাস করছেন।

(হককথা : ৭ জুলাই, ১৯৭২)

'দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে রং বেরং-এর বাহিনীগুলি দুষ্কৃতকারী বিরোধী অভিযান চালিয়েছে, দ্রব্যমূল্য সাবেক পর্যায়ে কমিয়ে আনার ওয়াদা দিয়ে ঘোষিত মহৎ 'উদ্দেশ্য' সাধনে জনগণও সহযোগিতা করেছেন অকপটে। কিন্তু জনগণের আকাঙ্খা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে আজ অবধি। তবে দেশটাকে আরেক দফা দখলদার আমলের আতঙ্ক ও শিহরণ দিয়ে বেসরকারী পকেটবাহিনীগুলি নিজেদের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে নিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণাম আসবে ভবিষ্যতে। সরকারী বাহিনীগুলি বাদ দিয়েই লাল-সবুজেরা জনপদে নামবে। যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি করবে। তখন কেউ টু শব্দটি করতে সাহস পাবে না। কেননা, জুন মাসেই সেনাপুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সমমর্যাদার ক্ষমতা এরা ব্যবহার করে নজির সৃষ্টি করে রেখেছে যে, এরা কোন বিশেষ দলের বাহিনী হলেও ক্ষমতার বদৌলতে এরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদ কায়েমের পূর্বশর্ত হিসেবে পকেটবাহিনীগুলিকে অথরিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার স্টেজ রিহার্সেল সম্পন্ন। এখন সহস্র রজনীর অভিনয় পালা শুরু।

(হককথা : ৭ জুলাই, ১৯৭২)

'যশোরের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার খবরে প্রকাশ, দৌলতপুর, ডুমরিয়া, বাগেরহাট ও সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বত্র নগ্ন অত্যাচারে আবার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ১২ বছরের কিশোরদের পিটিয়ে সারা-জীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের গাছের ডালে পা উপরের দিকে বেঁধে বেপরোয়া পিটানো হচ্ছে।'

'নৃশংসতম অত্যাচারে রক্তাক্ত হচ্ছে অসংখ্য প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। পাক-বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা তরুণী বাঙ্গালী বাহিনীর দ্বারা পুনরায় ধর্ষিতা হচ্ছে। 'রাজাকার ধরার জন্য' বলে প্রচারিত সপিং

আপ অপারেশনে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন উক্ত অঞ্চলসমূহে ঘরে ঘরে মা-বোনদের কান্নার রোল প'ড়ে যায়। বাগেরহাটে শেষ পর্যন্ত দুইশত মা-বোন পথে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছেন।

(হককথা : ১৪ জুলাই, ১৯৭২)

অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভাসানীর প্রতিবাদ

'রাজশাহী জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত খোন্দ'হরিপুর প্রকাশে চুলিয়াপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীগণের উপর পুলিশী জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা পাক আমলকেও হার মানিয়েছে।

ঘটনায় জানা যায় যে, ২/৩ দিন অনাহারের জ্বালায় ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠলে উক্ত চুলিয়াপাড়া সাকিনের সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত গদাইমাল নামক এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামের হাজি চানতুল্লা মণ্ডলের গাছ হতে একটি কাঁঠাল অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়ালে পর হাজি সাহেবের হুকুমমতো তাহার 'মুক্তিফৌজ' নামধারী এক নাতি গদাইমালকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলে। তৎসম্পর্কে থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও থানা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় উত্তেজিত জনতার হাতে হাজি সাহেবের মৃত্যু হয়।

আমি জানতে পারলাম যে, উল্লেখিত ঘটনার পর স্থানীয় এম, সি, এ পুলিশ বাহিনীসহ তথায় যান এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করতে ব্রতী হন। উক্ত এম, সি-এর সহযোগিতায় পুলিশ বাহিনী ঐ এলাকায় বহু নিরীহ লোককে, বিশেষ করিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদিগকে অকারণ মারপিট ও গ্রেফতার করিতেছে। ভয় প্রদর্শন করে এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের খবরও পাওয়া যাই-তেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে বহু লোক প্রাণহানি ও অত্যাচারের ভয়ে চাষ-আবাদের কার্য ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র পালাইয়া গিয়াছে।'

'আমি সরকার ও সরকারী বাহিনীর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান করিতেছি।'

(হককথা : ১১ আগষ্ট, ১৯৭২)

'প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দেহরক্ষী জালাল উদ্দিন আহম্মদ এবার গৌরনদী কেন্দ্র থেকে বি, এ পরীক্ষা দিয়েছেন। সান্ধ্য-আইন জারি করে যখন অস্ত্র উদ্ধার চলছে, তখন দেহরক্ষী পরীক্ষার্থীটি বগলে রিভলভার ঝুলিয়ে পরীক্ষা হলে এসেছেন। পরীক্ষার খরচ বাবদ তিনি সরকারের কাছ থেকে নজরানাস্বরূপ ১০০ রাউন্ড পিস্তলের গুলী পেয়েছেন বলে তাকে প্রচার করতে শোনা গেছে। তিনজন সহযোগী জুটিয়ে তিনি কিভাবে পরীক্ষা দিয়েছেন তা না বললেও চলে।'

(হককথা : ১২ আগষ্ট, ১৯৭২)

'বদরগঞ্জে নক্সাল দমন?' শীর্ষক এক পাঠকের চিঠি

জনাব,

২৮শে জুলাই ভোরবেলা রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর আনুমানিক সাড়ে সাত শতের একটি দল রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার লোহানীপাড়া ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে কার্ফু দিয়ে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী করে তহমুল লোহানী নামে বদরগঞ্জ থানা ন্যাপের সদস্য-সহ অপর এক গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। অভিযোগে প্রকাশ, 'নক্সাল কোথায়? ধরিয়ে দাও' বলে গ্রামের বহু নিরীহ জনসাধারণকে প্রহার করা হয় এমনকি তাদের গুলী করে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। কিন্তু নক্সাল কি? কে নক্সাল? আর কোথায়ই বা তাদের অবস্থান বলতে না পারায় তাদেরকে প্রহার করা হয় বলে তারা মনে করছে।

এছাড়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরও দু'বার উক্ত এলাকা-গুলোতে বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলিতভাবে 'নক্সাল' দমন অভিযানে গিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী মনে করছেন যে রংপুর জেলার জনৈক

নেতার অদৃশ্য প্রভাবের ফলেই গ্রামবাসীর ভাগ্যে নেমে এসেছে নির্মম নির্যাতন। কার উক্ত ন্যাপ (মোজাঃ) নেতার চাচা মোঃ সোলায়মান শাহ লোহানী-পাড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাক-বাহিনীর সহযোগিতায় উক্ত গ্রামগুলি কয়েকবার 'অপারেশন' করে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে সক্রিয় সহযোগী ছিলো বলে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তার বাড়ী দু'বার আক্রান্ত হয় এবং সে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।'

'স্বাধীনতার পর দালাল মোঃ সোলায়মান শাহ রংপুর শহরে উক্ত মোজাফফর ন্যাপ নেতার বাসায় আশ্রয় নিয়ে আছে। এ ব্যাপারে অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে রংপুর জেলা 'দুর্নীতি দমন বিভাগে' আবেদনও করা হয়েছিলো। কিন্তু আবেদনের পর আজ প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত দালাল ব্যক্তিটি উক্ত ন্যাপ নেতার বাসভবনে আশ্রয় নিয়ে রংপুর 'ক্যান্টনমেন্টে' জ্বালানী খড়ি সরবরাহ করে বেশ দু'পয়সা রোজগারের একটা পথও করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি 'খোলা চিঠি'ও তারা দিয়েছিলো।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দালাল চাচা কি করে অদ্যাবধি ন্যাপ নেতা ভাতিজার মক্কেল হয়ে আছেন? 'দুর্নীতি দমন বিভাগ' এবং কোতয়ালী থানা কর্তৃপক্ষ কি ক্যান্টনমেন্টে জ্বালানী খড়ি সরবরাহের মুনাফার মোহে পড়ে ঘুমাচ্ছেন? 'খোলা চিঠি' পাওয়ার পর সরকারই বা নীরব কেন? আরো প্রকাশ, উক্ত ন্যাপ নেতা গ্রামগুলোর বহু নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মিথ্যে ডাকাতি ও চুরির মামলা দায়ের করাচ্ছে। নক্সাল দমন অভিযান বোধ হয় এরই অন্যতম দিক।

ইতি

ওবায়েদ লোহানী, রংপুর।

(হককথা : ২৫ আগস্ট : ১৯৭২)

'জনসাধারণের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার পরিচালনায় ফেনী মহকুমার সোনাগাজী থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক প্রধান হোসেনের জুড়ি

নেই। সংপ্রতি চরখোয়াজ গ্রামের দু'জন অধিবাসীকে ধরে এনে উক্ত ছাদেক অন্যায়ভাবে মারপিট শুরু করলে এলাকার ক'জন বিবেকসম্পন্ন লোকের চেষ্টায় তারা আহত অবস্থায় উদ্ধার পায়।'

'পরে জনসাধারণের বিচারে ছাদেক হোসেনের ১০০ টাকা জরিমানা হয় এবং প্রকাশ্যে জনসমক্ষে সে কৃত অপরাধের জন্য করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে।'

এর পরেও কিন্তু তার দৌরাত্ম্য শেষ হয়নি। লোকটি এখন সিগারেট এজেন্সী নিয়ে টুপাইস কামাচ্ছে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে।

(হককথা ঃ ২৫ আগস্ট ঃ ১৯৭২)

'কয়েকদিন আগে এম, সি, এ হাবিবুর রহমান আফিল জুটী মিলে গিয়েছিলেন শ্রমিকদের ছবক দিতে। অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দালাল মিল প্রশাসক আছলাহু উদ্দিনকে শক্তি যোগানো, কেননা আজকাল তিনি আছলাহু উদ্দিনের 'আমব্রেলা' হিসেবে কাজ করছেন, আর তাতে মালপানিও মন্দ জুটছে না।'

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে এম,সি, এ স হেব বলেন, "জানেন আপনারা (অর্থাৎ শ্রমিকরা) বাংলাদেশে আরো ত্রিশ লাখ লোক মারা হবে, মানে হত্যা করা হবে, বুঝলেন! আমি এ খবর আনঅফিসিয়ালি বলছিনে-অফিসিয়ালি বলছি। আর ভাসানী ন্যাপ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নে যারা আছে তারা সব নকশাল। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ স্বাধীনতার পরই হয়েছিলো কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই সমস্ত নকশালদের অবিলম্বেই খতম করা হবে। সুতরাং সাবধান। আই এ্যাম এম, সি, এ স্পিকিং।"

জনাব হাবিবুর রহমান এখন খুলনার বহু আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা। পাক-সরকারের আমলের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই নেতা বর্বর সেনাবাহিনীর আমলেও একমাত্র আওয়ামী লীগের গণ-পরিষদ সদস্য যিনি খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। ইনিই একমাত্র সদস্য যিনি স্বাধীন হওয়ার পর বহু অপ-

কর্মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইনিই খুলনার গণ-পরিষদ সদস্যদের মধ্যে প্রথম, যিনি সবসময়ই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কাজের বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করে থাকেন। এমনকি কোন আসামী ধরা পড়লে এই এম, সি, এ সাহেব থানায় যান পুলিশের উপর মেজাজ দেখিয়ে আসামী ছাড়াতে। পাক-আমলের দালালদের পুলিশ গ্রেফতার করলে এম, সি, এ সাহেব তৎক্ষণাৎ থানায় যান তদবীর করতে। সেখানে গিয়ে তার প্রথম বুলি হোলো, "ডু ইউ নো আই, এ্যাম এম, সি, এ ?"

(হককথা : ১ সেপ্টেম্বর : ১৯৭২)

'সন্দ্বীপের সারিকাইত, মাইটভাঙ্গা প্রভৃতি এলাকার ৫ জন প্রবীণ আওয়ামী লীগার সন্দ্বীপের বুকে বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর জের টেনে এক পত্রে লিখেছেন, দু'একদিন নয়, ১০/১২ বছর ধরে আওয়ামী লীগ করে আসছি আমরা, কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসনের চেহারা দেখে আমরা বীত-শ্রদ্ধ। "দরকার বশতঃ লোক হত্যা করে পথের কাঁটা সরানো—এটাই কি স্বাধীনতা ?"—তাদের অভিজ্ঞতা : কথায় কথায় স্টেনগান নিয়ে তেড়ে আসা, এটা কি সরকারী আদেশ ?

দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে তাঁরা লিখেছেন, সরকারের কাছে বহুবার জানানো হয়েছে, কিন্তু আজ আর কালি নেই, কলম মুষড়ে আসছে।

তাঁদের আকুল ফরিয়াদ : শেষে নিরুপায় হয়ে হককথার শরণাপন্ন হলাম, আমাদের এই দ্বীপবাসীর জনগণের মর্মন্তুদ কাহিনী সারা দেশের মানুষকে জানিয়ে দিন।

সারিকাইতের সামছুল হক রিলিফের চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আওয়ামী লীগের অসৎ নেতৃত্বের চাপে তার বিচার হয়নি। প্রতিটি ইউনিয়নেই চলছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সাতঘড়িয়ার সত্যেন, গনেশ কর্মকার ও কামাল উদ্দিন মুক্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে জনসাধারণের উপর চালাচ্ছে নির্মম অত্যাচার।

মুজিববাহিনীর নামে দুলাল চন্দ্র, অমর কর্মকার, নারায়ণ চন্দ্র, মুনাল বাবুরা সারা দ্বীপে সৃষ্টি করেছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। "বলার ইচ্ছে ছিলো না, সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আমরাও ঘৃণা করি, তবু কি অসহায় অবস্থায় পড়ে বলছি ভেবে দেখুন"—এ কথা লিখে তারা জানাচ্ছেন মুসলমানদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী, সামাজিক, সৎচরিত্র তাদেরকে এরা অহরহ দালাল বলছে। এ:দের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র তো রয়েছেই উপরন্তু জনগণের মধ্য থেকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে চক্রটি গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সমাজকর্মী আওয়ামী লীগার দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছেন, অন্যত্র বাস করছেন।

"বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এসে তদন্ত করে আপনারা দেখুন, এই স্বাধীন বাংলায়—এই দ্বীপে পাঞ্জাবীদের কায়দায় কারা আমাদের মা-বোনদের উপর হিংস্র হায়েনার মতো নির্যাতন করছে। আবারও বলছি, সাম্প্রদায়িকতাকে তাড়াবার জন্য আমরা আওয়ামী লীগরা, ন্যাপ কর্মীরা এক শতাব্দীর একচতুর্থাংশব্যাপী সংগ্রাম করেছি। আজ আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু তদন্ত করে দেখুন, জেনে রাখুন। কারা আজ এই সম্প্রীতির পবিত্রতার উপর আঘাত হানছে।"

শুনেছি, মুসলমান বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত লোকদের একটা তালিকা হয়ে গেছে। এ:দের সরিয়ে ফেলতে পারলে, নব্য ফ্যাসিস্টরা দ্বীপের নেতৃত্ব পাবে বলে আশা করছে।

ইতিমধ্যে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে আবদুল খালেক সওদাগর অন্যতম। রাতের অন্ধকারে তাকে মেরে দু'লাখ টাকার অলংকার ও অর্থ অপহরণ করেছে মুজিববাহিনী। হাই স্কুল পলিটিক্সে বি কম, বি এড মোহাম্মদ কামালকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রদের সন্তানের মতো জেনে তিনি পড়াতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাই স্কুলটি আজ গোশালা। তৃতীয় শিকার [সফিউল্লা সওদাগর। সফিউল্লা সওদাগরকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হলে তার শ্যালক ভগ্নিপতিকে বাঁচাতে গিয়ে গুলী বুকে নিয়ে মরেন। সফিউল্লা বেঁচে যান।

সংগ্রামকালে আওয়ামীভিত্তিক কমিটিকে সংগ্রাম পরিষদে রূপান্তর করা হলে গণ-আদালত বসলো। স্থানীয়ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিববাহিনী শুরু করলো এক নারকীয় উৎসব। স্টেনগান বুকে ঠেকিয়ে বেপরোয়া পাইকারী হারে লোকজনকে হাজির করলো গণ-আদালতে। আদায় করলো হাজার হাজার টাকা। টাকা না থাকলে দিতে হয়েছে জান। যার হাতে অস্ত্র নেই, তারাই হলো এদের শিকার।

রমজান মাসে দঃ সন্দ্বীপ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত মুজিববাহিনী এক উৎসুক ১৩ বছরের কিশোরকে গুলী করে হত্যা করলো। ঈদের দিনে ঘেরাও অভিযানের সাথে চললো সান্ধ্য-আইন। ছালামত নামে জনৈক আওয়ামী লীগারকে হত্যা করলো তারা। অথচ সালামতের দু'ছেলে তখন মুক্তিবাহিনীতে।

মুজিববাহিনীর উদ্যত স্টেনগানের ভয়ে এবং জানকবজের তালিকায় নাম থাকায় অনেক আওয়ামীলীগার ও দেশপ্রেমিক সমাজকর্মী বউ-ছেলে-মেয়ে ফেলে কোথাও পালিয়ে আছেন।

মদের আড্ডা জমেছে এখন যত্রতত্র। প্রগতিশীল কর্মীকে ও ছাত্রদের নকশাল বলে হত্যা করা হচ্ছে।

গোপনে নমিনেশন এনে চোর-বদমায়েশ ও লুটেরাগুলো বানিয়েছে পঞ্চায়েত কমিটি।

হাজি মতিউর, মৌলবী ইউনুছকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে দেড় লক্ষ টাকার অলংকার ও নগদ অর্থ লুট করা হয়েছে।

ডাকাতি চলছে চমকপ্রদভাবে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত ডাকাতি ও হত্যাকান্ড হয়েছে অনেক। সবকয়টিই ধনী ও মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নবিত্ত মুসলমানের বাড়ীতে। হিন্দু জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের একজনও যদি ডাকাতির খপ্পরে পড়তো, তবু না হয় কথা ছিলো। ডাকাত কেবল মুসলমান চিনছে কেন ?

"সন্দ্বীপ থানা প্রধানের কাছে যে পুলিশ আছে তা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের পাহারাই চলে না। বিচারপতির কাছে মামলা গেলে তিনি পাঠান আওয়ামী

লীগের দুর্দান্ত সম্পাদক চৌধুরীর কাছে। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর আওয়ামী লীগ খোল নৈচা বদল করে এখন হয়েছে তাতার বাহিনী।

'পত্রলেখকগণ প্রশ্ন করেছেন, বলুন শেখ সাহেব ভারত প্রেমই কি এ দেশের জন্য দেশপ্রেম? তাঁরা প্রশ্ন করেন, শেখ সরকার দেশ চালায়, না হিন্দু প্রধান মুক্তিবাহিনী চালায় দেশ। তিনলাখ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বার বার বিপর্যস্ত সন্দ্বীপের বুকে স্বস্তি ফিরিয়ে দেবে কে?'

(হককথা: ৮ সেপ্টেম্বর: ১৯৭২)

ভাসানীর বিবৃতি: "আমি গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছি যে, একদিকে যখন সরকারের চরম ব্যর্থতা ও দুর্নীতির ফলে খাদ্যাভাবে মানুষ দিন দিন ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অন্যদিকে সরকার ও জনগণের এ অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে চরম ফ্যাসিবাদী কায়দায় গণ-বিক্ষোভকে দমন করতে চাচ্ছে। এই সুযোগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জনগণের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বন্ধুরবেশে এই সব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধন-বাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহ বাংলার মানুষকে চিরদিনের মতো গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আর আমাদের সরকার এইসব বিদেশী শক্তির দাবার গুটি হিসেবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মিশিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুর নির্দেশে একের পর এক জন-গণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী পন্থায় তারা সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, বাড়ি-ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় কর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার অশুভ চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ভুখা মানুষের খাদ্যের দাবীতে কথা বলার অধিকার নাই। অস-হায় মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে দেশে যে দু'একখানা বিরোধী দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো চরম স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধ-তিতে একে একে তারও কণ্ঠরোধ করে দেয়া হচ্ছে। সাপ্তাহিক 'গণশক্তি" তালাবদ্ধ করা হয়েছে। 'হককথা'র সম্পাদক জনাব ইরফানুল বারীকে

মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে সাপ্তাহিক 'মুখ-পত্রের' সম্পাদককেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অফিস জবরদখল করা হয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত 'হককথা'সহ পাঁচটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার নোটিশ জারি করা হয়েছে। এককথায় সরকার বিরোধী সকল সংবাদপত্রের টুটি টিপে হত্যা করতে এই সরকার বদ্ধপরিকর। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ আজ রুদ্ধ। জনগণের অর্থনৈতিক জীবন ও গণতান্ত্রিক অধি-কার উভয়ই আজ চরম সংকটের সম্মুখীন।

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারি না। দল মত নির্বিশেষে সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে তাই আমার আকুল আবেদন, আসুন ১লা অক্টোবর সারাদেশেব্যাপী সভা ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করি।

(হককথা : ১৫ সেপ্টেম্বর : ১৯৭২)

এ সব গুপ্তঘাত করা যে সব সময় লুকিয়ে হত্যা করছে এমন নয়। অনেক সময় প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে মানুষ খুন করে ঘাতক আবার বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘাতকদের অনেকেরই মুখ মহল্লার লোকদের চেনা। তারাও প্রকাশ্যে ডাকাতি করে। অনেক ডাকাত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেয়। অনেকে আবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের সুপারিশে ছাড়া পেয়ে যায়।'

(মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

'বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন খান পত্রিকা হকারের উপর তথাকথিত লালবাহিনীর লোকদের গুন্ডামীর নিন্দা করে এক বিবৃতি দেন।'

তিনি বলেন, 'হকার সিরাজুর রহমানকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব-দিকে তথাকথিত লালবাহিনীর লোকেরা ডাকিয়া নিয়া যায় এবং তাহাকে মারধোর করিয়া 'লাল পতাকা', 'হককথা', 'মুখপত্র' এবং 'নবযুগ' ও অন্যান্য

পত্রিকা ও টাকা-পয়সা লুট করিয়া তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়।'

'কোন অবস্থাতেই এইসব গুন্ডামী সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেন, 'যদি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ আইন-শৃংখলা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সচেতন শ্রমিকশ্রেণী এই সমস্ত গুন্ডাদের দমন করিতে কুন্ঠাবোধ করিবে না।'

'প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এক শ্রেণীর গুন্ডা সু-পরিকল্পিতভাবে হকারদের মারধোর ও হয়রানি করছে। এর পিছনে বিশেষ মহলের হাত রয়েছে বলে সকলের ধারণা। এই ধরনের গুন্ডাদের জনগণের স্বার্থের খাতিরেই চরম শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।'

(মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

'সম্প্রতি নবীগঞ্জ থানার আদিত্যপুর গ্রামে একটি প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবক নামধারী কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কারফ্যু দিয়ে লুটতরাজ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।'

এই সশস্ত্র দলটি আদিত্যপুর গ্রামের চারটি বাড়ীতে চড়াও হয়ে নগদ টাকা, অলংকার, রেডিও, ঘড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে।

জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে পারা গেছে যে, দুর্বৃত্তরা পূর্বেই জনসাধারণকে নিজ গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে কারফ্যু জারি করেছিলো।

(মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

'লুট, রাহাজানি আর ডাকাতি নাটোরে জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।

'খবরে জানা যায় যে, গ্রামে রাতে আর শহরে দিন-দুপুরে ডাকাতি এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণতি হয়েছে। গ্রামে ডাকাত আর শহরে (কথিত) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আমলের ন্যায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে।'

খবরে আরো জানা যায় যে, গ্রাম থেকে কোনো লোক শহরে পদার্পণ করলে অযথা তাকে রাজাকার কিম্বা আলবদর বলে আখ্যায়িত করা

হয়। ফলে এসব সরলমনা মানুষকে সেলামী দিয়ে রক্ষা পেতে হয়।

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন বলে অভি-যোগে জানা গেছে।

স্থানীয় জনগণ তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে এবং দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

(মুখপত্র : ১০ ভাদ্র : ১৩৭৯ বাংলা)

'জাতীয় শ্রমিক লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান লালবাহিনীর ১৭টি দায়িত্ব অর্পণের আহ্বান জানান শেখ মুজিবের কাছে। এর দ্বিতীয়টি ছিলো : সকল দুর্বৃত্ত দমনে লালবাহিনীকে অস্ত্রের মোকাবেলা করার জন্য এবং সশস্ত্র আক্রমণ থেকে নিরীহ শ্রমিক জন-সাধারণকে রক্ষার জন্য লালবাহিনীর নিকট অস্ত্র ও প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ব্যবহারের হুকুম প্রদান করা হোক।'

'লালবাহিনীকে শুদ্ধি অভিযানের ক্ষমতা দানের আহবানও তিনি জানান।'

(গণকণ্ঠ : ৫ জুন : ১৯৭২)

জনৈক অধ্যাপকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শাহজাদপুরের ঘটনাবলী

'গত ৯, ৬, '৭২ তারিখে জাতীয় কৃষক লীগের থানা সম্মেলনের আয়ো-জন করা হয়েছিলো। সেখানে লতিফ, আমির ও অন্যান্যদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির যে মন্ত্র ও পথ আমরা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছিলাম, তাতে অবহেলিত কৃষককুল সাড়া দিয়েছিলো অভূতপূর্বভাবে। তাতে আঁৎকে উঠছিলো গুটিকয়েক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। তাই সম্মেলন নষ্ট করার উদ্দেশ্যে, আমরা তখন শান্তি-পূর্ণভাবে কাউন্সিল অধিবেশন চালিয়ে যাচ্ছিলাম কলেজের ১৮নং কক্ষে, তখন "মুজিববাদের" প্রচারক এম সি এ আবদুর রহমান তার গুন্ডা-বাহিনীকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করে অতর্কিতে হামলা চালায় আমা-দের উপর। আরম্ভ করে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ। আমার ৬জন কর্মীকে বাড়ী বাড়ী থেকে খুঁজে বের করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কি অপ-

রোধ করেছিলো তাঁরা—মানুষের মুক্তির কথা বলে? আমার সবচেয়ে দুঃখ "গণকণ্ঠে" ছাপানো খবর। আপনারা কি চান আমাদের কাছে? অতীতে রহমান সাহেবদের মতো জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সম্বন্ধে অনেকবার বলা হয়েছে আপনাদের। তারপরও আপনারা আমাদের শুধু কাজ করে যেতে বলেছেন। আমরা মেনে নিয়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম জাতীয় কৃষক লীগের কার্যকরী পরিষদে সদস্য হিসেবে আব্দুর রহমান স্থান পেয়েছে। এলাকায় প্রায় ৪/৫ মাস অবধি কাজ করলাম আমরা, আর আপনারা ঢাকায় থেকে বহাল তবিয়তে নাম কাঠালেন এমন একজন লোকের যার সঙ্গে নীতির ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে আমাদের। যার ফলস্বরূপ আমাদের দিতে হলো ৬টি মূল্যবান জীবন, যাদের মধ্যে রয়েছে আপনার স্নেহের শহীদুজ্জামান হেলালও।'

(গণকন্ঠ : ১৭ জুন : ১৯৭২)

'প্রকাশ্য দিবালোকে এম সি এ সাহেবের আত্মীয়-স্বজন সহযোগে ভাড়াটে গুন্ডারা স্টেনগান, এস এল আর ও রিভলভারসহ কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলী ছুঁড়তে থাকে। গুন্ডাদল হায়েনার মতো বিপ্লবী কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কলেজ প্রাঙ্গণেই সিরাজগঞ্জ দোকান কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কোরবান আলীকে গুলী করে হত্যা করে। গুন্ডারা একজন কলেজ ছাত্রকে না পেয়ে তার পিতা দোকানদার সফিযুদ্দিনকেও গুলী করে হত্যা করে। গ্রামের একপ্রান্তে পুকুরপাড়স্থ মহল্লার এক বাড়ীতে শাহজাদপুর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও শাহজাদপুর কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ও গণকণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা শহীদুজ্জামান হেলাল আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুন্ডাদল উক্ত বাড়ীতে ঢুকে শহীদুজ্জামান হেলাল ও ফরহাদ হোসেনকে ধরে ফেলে এবং পৈশাচিক উল্লাসে উক্ত বাড়ীর দোতলা থেকে নীচে ফেলে দেয়। তারপর আঘাতের পর আঘাত হেনে তাদেরকে হত্যা করে। দুর্বৃত্তরা তাদের লাশ পার্শ্ববর্তী করতোয়া নদীতে ফেলে দেয়।'

'চারটি হত্যাকান্ড সমাধা করে গুন্ডারা এম সি এ সাহেবের কাছে যায়। পরে দুর্বৃত্তরা আবার হত্যার নেশায় মেতে উঠে। বাড়ী বাড়ী

তল্লাসী শুরু হয়। তারা কালাম ও দিলিপকে ধরে এম সি এ সাহে-বের বাড়ীতে নিয়ে যায়। অত্যাচার চালানোর পর বাজারের উপর নিয়ে এসে গুলী করে হত্যা করা হয়।'

'দুর্বৃত্তরা ওয়াহিদ খানের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা শহীদুজ্জামান, হাবিব, নুরু, গোলাম ও অধ্যাপক আউয়ালের বাড়ীতে লুটতরাজ চালায়। শাহজাদপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দোকানপাটও তছনছ করে। উল্লেখ্য যে, গুণ্ডা-দলের কয়েকঘণ্টাব্যাপী এই তাণ্ডবলীলা বিনা বাধায় চলতে থাকে। ঐ সময় পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত সফিজুদ্দিনের ছেলে মান্নান তার পিতাকে হত্যা করার সময় থানার পুলিশের সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করেও কোন সহায়তা পায়নি বলে অভিযোগে প্রকাশ।'

(গণকণ্ঠ : ২১ জুন : ১৯৭২)

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য এবং ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রশাসনযন্ত্র পুলিশী নির্যাতনের পথকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সত্যিই আমাদের অবাক লাগে যে, রাজনীতিবিদরা মাত্র সাত মাস আগে যে কোনো ধরনের নির্যাতন, পুলিশ বা মিলিটারীর গুলী চালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতো, সেই রাজনীতিবিদরা ক্ষমতাসীন হয়ে গত সাত-মাসে বাংলাদেশের বুকেই প্রায় ডজনখানেক জায়গায় নিরীহ ছাত্র-জনতার মিছিল ও সমাবেশের উপর গুলী চালনা করেছে। শুধু তাই নয়, ছাত্রকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সহযোগিতা-কারী দালালদের সহযোগে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিবিদেরা প্রশাসন-যন্ত্রকে প্রভাবিত করে ছাত্রকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করছে ও গ্রেফতার করছে।'

(গণকণ্ঠ : ১৩ জুলাই : ১৯৭২)

'২১শে জুলাই থেকে ছাত্রলীগের তিনদিনব্যাপী যে কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তারই প্রস্তুতিস্বরূপ আজ সন্ধ্যায় একটি মশাল মিছিল

বের করা হয়। মিছিলটি এস ডি ও-র বাসার সামনে এলে মুজিববাদের সমর্থক কিছুসংখ্যক গুণ্ডা উক্ত মিছিলে হামলা চালায় এবং মহকুমা শাখার সভাপতি বাবর শেখ, সাধারণ সম্পাদক সিরাজ খান ঠাকুর ও খুলনা বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে স্থানীয় এম সি আবদুর রশীদ সাহেবের বাসায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে বেদম মারধোর করা হয়। এ পর্যন্ত তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।'

(গণকণ্ঠ: ১৯ জুলাই : ১৯৭২)

'আরেকটা নক্ষত্রের পতন হলো.........এমন একটা বাহিনীর দ্বারা যারা যারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের প্রচারক ও জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবী করে। ... গত ২৩ জুলাই আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী ও সরকার সমর্থক এন এস এফ মার্কা ছাত্রদলের ফ্যাসিবাদী হামলায় আহত আব্দুল মালেক গতকাল সকাল সাড়ে ছ'টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।'

(গণকণ্ঠ: ২৬ জুলাই : ১৯৭২)

'ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের আক্রমণে গত পরশু (বৃহস্পতিবার) কালিগঞ্জ ইউনিয়নের আব্দুর রহিম (২৩) নামে আর একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছেন। সেদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কালিগঞ্জ ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একদল সশস্ত্র মুজিববাদী নামধারী গুণ্ডা সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। ফলে ১০ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। আহতদের ফেনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সন্ধ্যার সময় আব্দুর রহিম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'

(গণকণ্ঠ: ৫ আগস্ট : ১৯৭২)

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, মুজিববাহিনীর সার্টিফিকেট নিয়ে রাজাকাররা এখন রক্ষীবাহিনীতে ঢুকছে। গফরগাঁওয়ের লঙ্গাইর গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার মুহম্মদ আনোয়ার খান ওরফে নশী এখন সাভারে রক্ষীবাহিনীতে ট্রেনিং নিচ্ছে। উক্ত কুখ্যাত রাজাকার গফরগাঁও অঞ্চলে একদা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো এবং সে বহু হত্যা, ধর্ষণ ও লুট-তরাজের সঙ্গে জড়িত ছিলো। সে তার প্রভাবশালী মাতুল ময়মনসিংহের রক্ষীবাহিনী প্রধান সামসুদ্দিন আহমদের বদৌলতেই রক্ষীবাহিনীতে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।'

(গণকণ্ঠ: ৫ আগস্ট : ১৯৭২)

আহত একজন —গণকণ্ঠ

সাইফুল ইসলাম ঃ যাকে জবাই ক
মুজিববাদীরা। গলায় এখনো কাটা দ
লেখক

আহত একজন

'আজ বিকেল ৪টায় যশোহর থেকে নড়াইল যাবার পথে চাঁচড়ায় বাংলার যুব সমাজের কন্ঠস্বর আসম আবদুর রব মুজিববাদী সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট দুর্বৃত্তদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিপ্লবী নেতা আবদুর রব তার সঙ্গীদের সাথে নড়াইলের জনসভায় যোগ দেয়ার জন্য যখন নড়াইল যাচ্ছিলেন তখন যশোহর থেকে ৬ মাইল দূরে চাঁচড়ায় দুর্বৃত্তরা তার গাড়ীকে ঘিরে ফেলে। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, জনাব রব চাঁচড়ায় পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই দুষ্কৃতকারীরা প্রত্যেকটি গাড়ী তল্লাসী চালিয়ে আসম রবকে খুঁজছিল। দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। জনাব রব ও তার সঙ্গীরা গাড়ী থামালে দুর্বৃত্তরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে জনাব রবকে বের করে আনা হয় এবং তার হাতে, পিঠে এবং কপালে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাঁর সঙ্গী কামরুজ্জামান টুকু, জুলফিকার এবং গোরাও দুর্বৃত্তদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মুজিববাদী গুন্ডাদেরকে তাড়া করলে তারা পালিয়ে যায়।'
(গণকন্ঠ ঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)

'যশোহর জেলা ও শহর ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট ছাত্র গণ মিছিলের উপর মুজিববাদী ফ্যাসিস্ট গুন্ডারা হামলা চালালে যশোহরের গণকন্ঠ সংবাদদাতা একরামুল হক সহ কমপক্ষে ৪ জন ছাত্র লীগ কর্মী আহত হয়েছেন।' (১৫ সেপ্টেম্বর—'৭২)

'বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার দশজন প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক-শ্রমিক নেতাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করার জন্য "গেস্টাপো" বাহিনী গঠন করেছেন। গতকাল পল্টনের জনসভায় বিপ্লবী যুব নেতা আসম আবদুর রব এতথ্য উদ-ঘাটন করেছেন।'

তিনি বলেন, তিনজন পরিচিত নেতার (?) নেতৃত্বে মীরপুর ও মোহাম্মদপুর থেকে ঘাতক সংগ্রহ করে কতগুলো দল তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি দলে রয়েছে ৫ জন করে ঘাতক। এভাবে বাংলাদেশের মাটি থেকে সমাজ-

তান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাত করে দেয়ার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে তিনি জানান।' (১৬ সেপ্টেম্বর '৭২)

'শাসক আওয়ামী লীগ দল ও সরকার গণতন্ত্রকে চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শের একটি বলে ঘোষণা করলেও গণতন্ত্রের প্রতি তাদের নিষ্ঠা একান্তই মৌখিক প্রকৃতপক্ষে দেশে বিভেদ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অস্থিতিশীল অবস্থাকে অব্যাহত রাখা হয়েছে। এই অস্থিতিশীল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শাসকদল বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতা ও কর্মীদের হয়রানি করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দলের নেতা ও কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের উপর আক্রমণ ফ্যাসিস্ট আকার ধারণ করেছে। কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।' ডাকসু-'র প্রাক্তন সহসভাপতি বিপ্লবী জননেতা জনাব আসম আবদুর রবের উপর এ পর্যন্ত দু' দুবার আক্রমণ ও হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এছাড়া মমতাজ বেগমের উপরও আক্রমণ করা হয়। ছাত্রলীগের বর্তমান সম্পাদক আ, ফ, ম মাহবুবুল হকের উপরও এ ধরনের জঘণ্য আক্রমণ চালানো হয়েছে। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধরপাকড়, নির্যাতন ও হয়রানী অবাধে চলছে। এ পর্যন্ত অসংখ্যক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। (গণকন্ঠ: ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)

'কুমিল্লায় মুজিববাদী গুন্ডাদের ফ্যাসিবাদী হামলায় আহতদের মধ্যে আবদুল হক (১৪) নামক একটি কিশোর শ্রমিক গতকাল (শুক্রবার) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। উল্লেখ্য গত বুধবার রাতে ডাকাতি করার সময় কুমিল্লার মুজিববাদী সংগঠনের পান্ডা পাখিকে দলবলসহ অস্ত্র ও জীপগাড়ী সমেত গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ফ্যাসিস্ট সংগঠনের অপরাপর পান্ডারা ডাকাত পার্টির মুক্তির দাবিতে শহরে হরতাল আহবান করেছে। জনগণ তাদের আহবানে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয়নি।'
(গণকন্ঠ: ৭ অক্টোবর '৭২)

'গতকাল স্থানীয় কলেজের বিএ শ্রেণীর ছাত্র বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্র নেতা জনাব মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান মুজিববাদী গুন্ডাদের গুলীতে নিহত হন। প্রকাশ, গফফর গাঁও কলেজের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু দিন পূর্বে মুজিববাদী গুন্ডারা ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত মাসুদুজ্জামানকে প্রকাশ্য ভাবে মারধর করে এবং এ ব্যাপারে থানায় এজাহার দিলে তাকে প্রাণে মারা হবে বলে হুমকী প্রদর্শন করে। জনাব মাসুদুজ্জান থানায় এজাহার না দিয়ে স্থানীয় এম, সি-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু এমসিএ সাহেব এ ব্যাপারে মোটেও গা করেন নি। এরপরই মুজিববাদী গুন্ডারা জনাব মাসুদুজ্জামানকে তার নিজ বাড়ী কান্দি পাড়া গ্রামে খুন করে। গভীর রাতে মুজিববাদীরা দরজা ভেঙ্গে তার ঘরে ঢুকে তাকে গুলী করে হত্যা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুজিব বাদীদের ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ এই অঞ্চলে দারুন ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। গত আগস্ট মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য উত্তর বঙ্গ থেকে আগত ছাত্রলীগ কর্মীদের গফফর গাঁয়ে নামিয়ে মারধর করে।'
(গণকণ্ঠ: অক্টোবর ১২, ১৯৭২)

'ঈশ্বরদী থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, গতকাল রোববার রাতে (৫ নভেম্বর) ঈশ্বরদী ছাত্র লীগ কর্মী জনাব ইকবাল হোসেন গতকাল মুজিব বাদী গুন্ডাদের গুলীতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে আছেন। মুজিববাদী গুন্ডারা জাতীয় শ্রমিক লীগের ঈশ্বরদী শাখার সদস্য জনাব তমিজ উদ্দিনের উপর এস এম জি-র ৫/৬ রাউন্ড গুলী নিক্ষেপ করে। সে সময় পাশের ইকবালের মাথায় লাগে।
(গণকণ্ঠ: ৬ নভেম্বর ১৯৭২)

'গত রোববার ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় জাতীয় কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের অন্যতম শিক্ষক জনাব সিদ্দিকুর রহমান খান দুষ্কৃতকারীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে জনাব সিদ্দিকুর রহমান যখন স্কুল

হোস্টেলের বারান্দায় বসে নামাজের জন্য ওজু করছিলেন ঠিক সেই সময় তার উপর স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শবাদী সমাজকর্মী ছিলেন। তার জনপ্রিয়তার জন্যে অঞ্চলে সাধারণ্যে তিনি সিদ্দিক মাস্টার বলে পরিচিত ছিলেন। জনাব সিদ্দিক মাস্টার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন প্রাক্তন সদস্য। ইদানিং তিনি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। গতকাল সোমবার জনাব সিদ্দিক মাস্টারের দেহ ঢাকায় আনা হয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি অত্র এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তিনি স্থানীয় এম-সি-র রোষানলে পড়েন। কিছুদিন পূর্বে এনিয়ে নবাবগঞ্জে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালালে ৪ জন আহত হয়। এরপর উক্ত এম সি এ-কে অপদস্ত করার অভিযোগ করে সিদ্দিক মাস্টারকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তাকে বার বার হত্যার হুমকি দেয়া হয়।'

(গণকণ্ঠ ১৪ নভেম্বর: ১৯৭২)

'পরদিন জাসদ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন: যেসব বিপ্লবী পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা ফ্যাসিবাদের শিকার হচ্ছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সুপরিকল্পিত ভাবে এপর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশী প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ তারা নরসিংদির শ্রমিক মুক্তিযোদ্ধা কাদের, সিরাজ ঈশ্বরদির কচি, কুষ্টিয়ার হাবিব, টাঙ্গাইলের জিন্নাহ ও নবাবগঞ্জের শহীদ সিদ্দিকুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন।'

(গণকণ্ঠ ১৬ নভেম্বর—১৯৭২)

'ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসলীলা, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধের প্রতিবাদে ছাত্রদের একটি মিছিল শান্তিপূর্ণ-

ভাবে রাজপথ বেয়ে এগিয়ে আসছিলো। মিছিলটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তথ্য কেন্দ্রের সামনে এলে পুলিশ কোনো সংকেত বা শতর্কবাণী ছাড়াই বেলা ১২টা ১০ মিনিটে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র মতিউল ইসলাম ও ঢাকা কলেজের ছাত্র মীর্জা কাদির ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুলিতে অসমর্থিত খবর অনুযায়ী কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে।

(গণকণ্ঠঃ ২ জানুয়ারী ১৯৭৩)

একই দিনে গণকন্ঠের 'লালঘোড়া, শীর্ষ' সম্পাদকীয়ের একাংশে বলা হয় 'ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকের তাজা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের নবর্ষের যাত্রা শুরু করেছে ... তাহলে কি আওয়ামীলীগের অশ্বমেধের লালঘোড়া নিরীহ ছাত্র-যুবকদের ওপর দিয়ে এইভাবেই চলতে শুরু করলো? এতো তাড়াতাড়ি ?

'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আহুত ভিয়েতনাম দিবসের কর্মসূচীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে গতকাল (বুধবার) তথাকথিত মুজিববাদী ছাত্রনামধারী গুন্ডারা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত জনসভা ও মিছিলের উপর বেপরোয়া ও নির্লজ্জ হামলা চালায়। মুজিববাদীদের এই ফ্যাসিস্ট হামলায় বাংলাদেশ জাতীয়লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ও জনৈক সাংবাদিক ফটোগ্রাফার সহ বহু ছাত্র ও শ্রমিক গুরুতররূপে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।'

(গণকণ্ঠ : ৪ জানুয়ারী—১৯৭৩)

ঈশ্বরদীতে এখন সন্ত্রাস। বাজারে মানুষ আসেন না। যারা আসেন তারাও সন্ধ্যা হবার আগেই ঘরে ফেরেন। মুজিববাদের সমর্থকরা সরকারী সাহায্য পেয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। তারা ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগের কর্মীদের হত্যা করছে এবং হুমকী দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ... গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে অতি সম্প্রতি ছাত্রলীগ কর্মী মতিউর রহমান

কবিকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর গণমনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, গত ১১ই নভেম্বর দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে একজন মুজিববাদী গুন্ডা পুর্বাশা বিতান নামক দোকানে মতিউর রহমান কবিকে পরপর ছয়টিগুলী করে হত্যা করে। তার মাথা ও বুকে এস এম জি থেকে ফায়ার করা হয়। ... প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন যে, ঐদিন সন্ধ্যার সময় দলটি পাকশীতে যায়। সেখানে একটি মাঠে ১০ জন মেয়েসহ ১২৩ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে লাইন করে দাঁড় করায়। তারা তাদেরকে মৃত্যুর হুমকি দেয় ও অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফাঁকা গুলী ছুড়ে। তাদের কাছ থেকে মুজিবাদ সমর্থন করার বিবৃতি আদায় করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের বলা হয় যে, তাদের সন্তানেরা যদি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করে তাহলে তাদের চাকরি যাবে।'
(গণকণ্ঠ : ১৯ নভেম্বর ১৯৭২)

'গত ১০ জানুয়ারী জয় পাড়ায় জাসদের জনসভা শেষে পথিমধ্যে মুজিববাদী গুন্ডা বাহিনী ব্রাস ফায়ার ও বেয়োনেট চার্জ করে বাদলকে হত্যা করে।'
(গণকণ্ঠ : ১২ জানুয়ারী—'৭৩)

মৌলভী বাজার জেলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের যুগ্ম আহবায়ক জনাব মীরজা ফরিদ আহমদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব মীরজা হারুন আহমেদ গত ১৮ই জানুয়ারী গভীর রাতে মৌলভী বাজার থানার অন্তর্গত মাথারপুর গ্রামে তাদের বাড়ীতে আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন।'
(গণকণ্ঠ : ১৯ জানুয়ারী '৭৩)

ফরিদপুর শহরের অদূরে কতিপয় দুর্বৃত্ত ছাত্রলীগ কর্মী এবং সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কামালুজ্জামান মোস্তাককে (১৬) নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।—২৭শে জানুয়ারী শনিবার উক্ত কামালুজ্জামান মোস্তফা তার নিজ গ্রাম কোমল পুর থেকে গোয়ালন্দ যাবার পথে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হয়।

পরদিন অম্বিকাপুরের অদূরে রেলওয়ে পুলের নিকটবর্তী নদীতে জেলেদের জালে তার লাশ উঠে আসে।
(গণকণ্ঠ : ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩)

চট্টগ্রামে নারকীয় ও চাঞ্চল্যকর শ্রমিক হত্যা সম্পর্কে গণকণ্ঠ লিখেছে : 'রোববার রাত সাড়ে ১২টায় সরকারী শ্রমিক সংগঠনের কয়েক শ'তের একটি দল স্টেনগান, এস এল আর, এল এমজি এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বারবকুণ্ড শিল্পাঞ্চলের আর আর টেক্সটাইল মিলে হামলা চালায়। গুণ্ডাবাহিনী সমগ্র মিল এলাকা চারদিক থেকে ঘেরাও করে বেরুবার পথ বন্ধ করে দেয় এবং পার্শ্ববর্তী আশ্রয়স্থলে পাহাড়া মোতায়েন করে কাঁচা ঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, শ্রমিক ব্যারাক থেকে বেরুবার সব ক'টি পথে সশস্ত্র গুণ্ডারা 'এ্যামবুস' করে থাকে। ব্যারাকে ঢুকে একদল গুণ্ডা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্র থেকে অনবরত এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত শ্রমিকরা গুণ্ডাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করলেও বহু সংখ্যক শ্রমিককে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। প্রাণ ভয়ে পলায়ন পর শ্রমিকদের উপর গুণ্ডাবাহিনী গ্রেনেড চার্জ করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী জানান। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে পলায়নপর শ্রমিকদের অনেককে হাত পা বেধে কাঁচা ঘরের জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। উক্ত মিলের সম্মুখস্থ মুদি দোকানদার মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তাকে হাতপা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।'

'উক্ত টেক্সটাইল মিলে এ পর্যন্ত কোনো 'বার্গেনিং এজেন্ট' কিংবা সরকারী শ্রমিক সংগঠনের কোন ইউনিট ছিলনা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বার্গেনিং এজেন্ট নিযুক্তির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বহুবার চেষ্টা করে ইউনিট প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে সরকারী শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিরা ভাড়াটিয়া কতিপয় দালালের সহযোগিতায় এই নৃশংস

প্রতিশোধ নিয়েছে বলে শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে।
(গণকণ্ঠ : ৬ ফেব্রুয়ারী-১৯৭৩)

'গত পরশু (৮ ফেব্রুয়ারী'৭৩) ১/১ গজনবী রোডে অবস্থানরত বরিশালের প্রাক্তন এম সি এ হেমায়েত হোসেনের ভাই আবদুর রহমান আলি আহাদ নামক জনৈক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে গুলী করে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।'
(গণকণ্ঠ : ১০ ফেব্রুয়ারী'৭৩)

'রক্ষীবাহিনী খুলনার ফকির হাট ও সদর থানার দু'টি গ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বিস্তারিত খবরে জানা গেছে ফকির হাট থানার বাহির দিয়া গ্রামে ও খুলনা সদর থানার স্বল্প বাহির দিয়া গ্রামে রক্ষীবাহিনীর লোকেরা ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। গ্রামবাসীদের বাড়িঘরও নাকি তারা জালিয়ে দেয়। গ্রাম দু'টির বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর নির্মম প্রহারে আবদুল খালেক শেখ এবং আবদুল জব্বার শেখ নামের দু'জন কৃষক মারা গেছে বলে জানা গেছে।
(গণকণ্ঠ : ২৫ ফেব্রুয়ারী-১৯৭৩)

'শনিবার (১০ মার্চ-৭৩) সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোটালী পাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাচ্ছিলেন। তারা যখন টুকুরিয়া গ্রামে পৌঁছেন তখন চারদিক থেকে বেশ বড় একটা দুর্বৃত্ত দল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্বৃত্তদের আকস্মিক আক্রমণে তারা হতভম্ব হয়ে যান। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাদের হাতপা বেধে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর চলতে থাকে নির্দয়ভাবে লাঠিপেটা। এই বর্বরোচিত আক্রমণে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা গেছেন। পরে আরো একজন গুরুতর আঘাত নিয়ে ধুকতে ধুকতে মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদপুর- ২ থেকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের মো ন্যাপ প্রার্থী শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট

পার্টি'র স্থানীয় নেতা জনাব ওয়ালিউর রহমান লেবু, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা লুৎফর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যানার্জী। এ ছাড়াও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন।'
(গণকণ্ঠ: ১১-'৭৩)

'৭ই মার্চের ভোট পর্বে শাসকদল আওয়ামীলীগ 'বিজয়ী' হবার পর পরই বাংলাদেশে বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর এক চরম আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে বলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসছে। তাদের সেই আক্রমণের লক্ষ্য হিশেবে যুবতী মেয়েরাও লাঞ্ছিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। ভালুকায় দোলনা নামক ১৬ বছরের একটি যুবতীকে মারাত্মক মারধর করায় সে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে জানা গেছে।...... নাটোরে মুজিববাদীরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন কর্মীকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে বলেও জানা গেছে।'
(গণকণ্ঠ: ১২ মার্চ '৭৩)

'ঢাকা জেলার ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ জাতীয় লীগের বিশিষ্ট কর্মী আবদুল মন্নাফকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে দলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।'
(গণকণ্ঠ: ১৫ মার্চ-'৭৩)

'রক্ষীবাহিনী গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে বেঙ্গু (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সেখানে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। পরে অচৈতন্য অবস্থায় থানায় আনার পথে তার মৃত্যু ঘটে।
(গণকণ্ঠ: ১১ মে-'৭৩)

'ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর খুনী হাতে মেহনতি মানুষের তাজা রক্তের দাগ পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ

ও উপনিবেশবাদের লেজুড় আওয়ামীলীগের প্রাইভেট বাহিনীগুলো গতকাল সোমবার হরতালের দিনে কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করেছে এবং অসংখ্য মানুষকে আহত করেছে। নিহত ১০ জনের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ বিমানের পন্যসরবরাহ কর্মচারী নূর হোসেনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কোনো লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হত্যা করার পর প্রাইভেট বাহিনীর লোকেরা নিহত ব্যক্তিদের লাশ জীপে করে সরিয়ে ফেলেছে।'
(গণকণ্ঠ : ২২ মে-১৯৭৩)

'মুজিববাদী গুন্ডারা গতকাল (২৪ মে) রাতে ঈশ্বরদি থানার শাহপুর গ্রামের বিশিষ্ট ছাত্রলীগকর্মী রিয়াজ উদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ......মুজিববাদী গুন্ডারা নিহত রিয়াজ উদ্দিনকে তার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যায়। আজ সকালে তার লাশ পাওয়া গেছে।
(গণকন্ঠ : ২৬ মে-'৭৩)

'সরকারী গুন্ডাবাহিনীর গুলীতে আবার নরসিংদী রক্তাক্ত। অধিকার হারা ১০টি প্রাণ আবার আত্মহুতি দিলেন গতকাল শোষক গোষ্ঠীর গুলীতে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহুত গতকালকের গণ বিক্ষোভ দিবসের মিছিলে গুলী চালানো হয়। ফলে ৯জন বঞ্চিত -মানুষ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আহত হয়েছেন বহু সংখ্যক।··· ···ঘটনাস্থলে নিহত তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের লাশই গুন্ডারা নীল রংয়ের একটি পিক-আপ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। যে তিন জনের লাশ নিয়ে যেতে পারেনি তারা হচ্ছেন নরসিংদী থানা জাসদের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল মোমেন। অন্যজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। থানার ওসি এবং ঢাকার ডিসি তিনজনের মৃত সংবাদ স্বীকার করেছেন।'
(গণকন্ঠ : ২৮ মে-'৭৩)

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সম্মানের ছাত্র হাসান ইমাম আজাদ প্রিয় গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে। কিন্তু

ঢাকায় আর ফিরে আসতে পারেননি। তার এলাকার সংসদ সদস্য নুরুল হকের হত্যার পরদিনই হাসান ইমাম প্রাণ হারিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ জনতার নাম নিয়ে রক্ষী বাহিনীর জনৈক কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল মুজিববাদী গুণ্ডা নির্মমভাবে বুটের তলায় পিষে তাকে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় অনেকে অভিযোগ করেছেন। তার সঙ্গে প্রান হারিয়েছেন মোহাম্মদ হানিফ নামের একজন প্রথম বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র। নিহত হাসান ইমান কোনো ছাত্র সংগঠন কিম্বা রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন কি না জানা যায়নি।'

(গনকণ্ঠ ঃ ১ জুন-'৭৩)

'সংসদ সদস্য জনাব নুরুল হকের হত্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল নড়িয়া থানার বিভিন্ন অঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচেছ। ঘর-বাড়ী জ্বালানো, হত্যা, নির্যাতন লুঠ, নারী ধর্ষণ চলছে অবাধে। শুধু বিরোধী দলই নয়, নিরীহ সাধারণ মানুষও এ অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। নিহত সংসদ সদস্যের আত্মীয়-সৃজন আওয়ামীলীগ ও মুজিব-বাদী গুণ্ডাবাহিনী সংঘবদ্ধ ভাবে এ নির্যাতন চালাচ্ছে। রক্ষীবাহিনী তাদের সাহায্য করছে। ১২ বছরের ওপরের কোন ছেলে এ অঞ্চলে থাকার সাহস পাচ্ছে না। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল বন্ধ। বাতি জ্বলে না রাতে। হাটবাজার এক রকম বসে না বল্লেই চলে। চামটা, বরিসার, ডিঙ্গামানিক, ভুমগাড়া, চর আত্রা ও কেদারপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দু'হাজার নারী পুরুষ শিশু বাড়ীঘর ছেড়ে ঢাকা আসছেন। এ এলাকা থেকে সদ্য আগত জনৈক আতংকগ্রস্ত বৃদ্ধকে এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সভায় জানতে চান আমি আওয়ামী লীগ করি কিনা, রক্ষীবাহিনী কিনা। আশ্বাসে অবশেষে বিশ্বাস করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ৫০ বছরের বৃদ্ধা। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কান্না জড়িত কন্ঠে জানা-লেন, নাড়িয়া থাকার ৪০ মাইল এলাকাব্যাপী সন্ত্রাসের নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনী ও ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার পাক-সেনা-দের নির্যাতনকেও হার মানিয়েছে। প্রতিদিন দল বেঁধে গ্রাম পোড়াতে

আসে।'......পণ্ডিতেশ্বর গ্রামের ডাঃ আলাউদ্দিনের ৫টি পাকা ঘরের একটিও নেই। পাকা ঘর, ঘরের ধান-পাট ভস্মীভূত করা হয়েছে। একইদিন পাশের বাড়ীর স্বপন কুমারের পাকা দালান পোড়ানো হয়েছে। শালদহ গ্রামের মরুর উদ্দিন ডিলারের বাড়ী এবং গোলার বাজারের রেশন দোকান গম ও চালসহ ভস্মীভূত করে। অন্যান্যের ঘর বাঁচানোর জন্যই নাকি উক্ত ডিলারের ঘর ভেঙে বাজারের বাইরে নিয়ে পোড়ানো হয়। মরুর ডিলারের অপরাধ তিনি নির্বাচনে বিরোধী দলকে সমর্থন করেছেন। কাঠহুগলী গ্রামের নিহত ছাত্র জামাল ইমামের বাবা ফরহাদ কাজীও ভিটে ছাড়া। তারও বাড়ী পুরানো হয়েছে। দেওজুড়ি গ্রামের সেকান্দর হাওলাদারের বাড়ী ২/৩ শ'মন ধান ও শ' দুয়েক মন পাট সহ পোড়ানো হয়েছে। পোড়ানো হয়েছে তেলিপাড়ার চৌধুরী বাড়ী, দত্ত পাড়ার শ্যামসুন্দর দত্তের বাড়ী।..................এ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিহত সংসদ সদস্য নুরুল হকের শালা অজিত বিশ্বাসের পুত্র, আবদুল হাই মাস্টার, থানা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক কাজী সিরাজুল ইসলাম-সহ আওয়ামী ও মুজিববাদী গুন্ডারা। এ কথা গতকাল সদরঘাটের লঞ্চ ঘাটে এলাকা থেকে সদ্য আগত জনৈক ব্যক্তি জানালেন। তিনি আরো জানান, বিগত নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ আওয়ামীলীগরাই সংসদ সদস্য নুরুল হককে হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু এ হত্যার সুযোগ নিয়ে বিরোধীদলীয়, বিরোধী দল সমর্থক নিরীহ মানুষের উপর চালাও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত শত্রুতা হাসিলের জন্য অত্যাচার চলছে। রক্ষীবাহিনীর অফিসার নিহত সংসদ সদস্যের ভাই চিনুকে বদলী করে আনা হয়েছে এবং নির্যাতনের সর্বময় ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে বলেও বিভিন্ন সূত্রের অভিযোগ।'

(গণকণ্ঠ ১৪ জুন—'৭৩)

'গত ১৩ জুন (বরিশালে) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মী জনাব ফারুক আলম দুষ্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।

(গণকণ্ঠঃ ১৬ জুন '৭৩)

'রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে আজ (১৭ জুন) দুপুরে ১২টার সময় স্থানীয় (বগুড়া) কারাগারে জাসদের অন্যতম কর্মী শ্রী মানিক-দাস গুপ্ত মৃত্যু বরণ করেছেন।.........৮ জুন রাত ১০টায় রক্ষীবাহিনী হঠাৎ করে গ্রেফতার করে। তাকে গ্রেফতার করার পরপরই তার উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। বেদমভাবে মারপিটের ফলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কারাগারে থাকাকালে তার আহার্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এবং শেষ পর্যায়ে তার আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলা হয়। এহেন অত্যাচারের শিকার হয়ে শ্রী মানিক আজ দুপুর ১২টার সময় মারা যান। ইতিপূর্বে গত ৮ জুন বিকেল ৫ টায় মুজিববাদী গুন্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ার রাজপথে আতা এবং রঞ্জু নামে ছাত্র লীগের দু'জন কর্মীকে গুলী করে হত্যা করে।'
(গণকণ্ঠ ঃ ১৮ জুন '৭৩)

'সকাল আনুমানিক ৯টায় (২৯ জুন-'৭৩) একটি যাত্রীবাহী বাস পতেঙ্গা রেল ক্রসিং-এর কাছে রক্ষীবাহিনীর একটি ভ্যান ওভারটেক করে। রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে যাত্রী বাহী বাসটিকে ওভারটেক করে রাস্তা আটকে দাঁড়ায় এবং ওভারটেক করার অভিযোগে বাসের ড্রাইভার কনডাকটর সহ কয়েকজন যাত্রীকে মারধর করতে শুরু করে। এতে পথচারী ও বাসের যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং রক্ষীবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিরোধে পরাস্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সাথে সাথে বাসটিকে অনুসরণ করে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর কাছে পুন-রায় বাসটিকে অবরোধ করে। এক প্লাটুন রক্ষীবাহিনীর সদস্য ত্বরিতে বাস-টিকে ঘিরে ফেলে। ভীত সন্ত্রস্ত বাস যাত্রী, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর ইস্টার্ণ রিফাইনারীর ভেতরে আশ্রয় নেয়। প্রাণ ভয়ে পলায়মান জনতাকে পিছু ধাওয়া করে রক্ষী বাহিনী মিল অভ্যন্তরে বে-আইনীভাবে ঢুকে পড়ে এবং বেপরোয়া গুলী চালায়। ফলে ২৫ জন হতাহত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী জানান। এদের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। জেলা কর্তৃপক্ষ এক জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে।'
(গণকণ্ঠ ৩০ জুন-'৭৩)

'রক্ষী বাহিনী কালিগঞ্জ মসলিন কটন মিলের শ্রমিক মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।
(গণকণ্ঠ : ১ জুলাই—৭৩)

'লোহাগড়ার জনগণের ওপর রক্ষী বাহিনী, বিডি আর ও রিজার্ভ পুলিশ যৌথভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে ৬ বছরের বালিকা এবং অশীতিপর বৃদ্ধরাও রেহাই পাচ্ছে না। তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে ইতিমধ্যে দু'জন মৃত্যুবরণ করেছে।'
(গণকণ্ঠ : ১৫ জুলাই—৭৩)

'গত ২৬শে আগস্ট মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে জেলা ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন ছিলো। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না। জনাব মান্না অপরাপর সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য জেলা শাখার কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হবার আগেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন।'

'কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেবেন্দ্র কলেজটি প্রায় ৫'শ রক্ষীবাহিনী ঘিরে ফেলে। তবুও কলেজ মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশন চলছিলো। কিন্তু রাত সাড়ে নয়টায় রক্ষী বাহিনী মিলনায়তনে প্রবেশ করে এবং ছাত্র লীগ কর্মীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রায় এক হাজারেরও উপর কাউন্সিলরের একটা বিরাট অংশকে রক্ষী বাহিনী গ্রেফতার করে। অন্যরা মিলনায়তনের পেছনের বিরাট জলাশয় সাতরিয়ে পালিয়ে যায়।

'গ্রেফতারকৃত কর্মীদের উপর রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার চরমে ওঠে। এদের মধ্যে সাটুরিয়া থানা ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব দেলোয়ার হোসেন হারেজের শরীর কেটে কেটে তার উপর লবন ছিটিয়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে। পরে আরো জানা গেছে যে, শুধুমাত্র হারেজ ছাড়া রক্ষী বাহিনী এর মধ্যে

গ্রেফতারকৃত সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু হারেজকে কেন ছাড়া হয়নি বা তার নামে নির্দিষ্ট কোন মামলা আছে কিনা জানা যায়নি।'
(গণকণ্ঠ : ১ সেপ্টেম্বর '৭৩)

'শাহজাদপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে আগত ২ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র নিতে এসে প্রাণ হারিয়েছেন মুজিববাদী গুণ্ডাদের হাতে। মুজিববাদীরা এদের গলা কেটে ফেলেছে।
(গণকণ্ঠ : ২ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'এখানে (হোমনা) একজন আওয়ামীলীগ কর্মীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের গুণ্ডাবাহিনী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা নিরীহ জনগণের উপর পাইকারী নির্যাতন চালাচ্ছে। গুণ্ডা বাহিনী জনসাধারণের উপর ১০ টাকা করে চাঁদা ধরেছে। এই দুর্দিনে তারা চাঁদা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অথচ, চাঁদার টাকাটা দিতে সামান্য বিলম্ব হলেই গ্রামবাসীদের চোখ বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।...রক্ষী বাহিনীর আস্কারা পেয়ে আওয়ামী গুণ্ডা বাহিনী হোমনার ছোট ছোট বাজারগুলোও লুট করে নিয়েছে। আড়াই হাজারের খবরে জানা গেছে খাককান্দা ইউনিয়নের ডেঙ্গুরকান্দি ও কমলাপুর গ্রামে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চরমে উঠেছে। অত্যাচারে এলাকার মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
(গণকণ্ঠ : ৫ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'ডক শ্রমিকের রক্তে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বন্দর এলাকা আবার রঞ্জিত হয়েছে। সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডাদের সম্মিলিত হামলায় নিহত হয়েছেন ডকের দু'জন শ্রমিক। আহত হয়েছেন ১০ জন। নিখোঁজ হয়েছেন ৬ জন। নিহতরা হচ্ছেন আবদুল মান্নান সরদার (৪০) ও দারোয়ান আবদুল গণি।'
(গণকণ্ঠ : ১৫ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'বর্তমান সভ্যতাকে এদেশে আরো একবার সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করা হয়েছে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। আপাততঃ এই সর্বশেষ বধ্য

শান্তি সেন ও অরুণা সেন

মৃত্যুকূপ থেকে ফিরে আসা চঞ্চল সেন

ভূমিটি হচ্ছে ঢাকা জেলার নওয়াবগঞ্জ। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ এই বিরাট মুজিববাদী অপারেশনে কত জীবন যে বলি হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের হাসপাতালের মর্গে গতকাল পর্যন্ত ৭টি লাশ এসে পৌঁছেছে। এই সাত জনের মধ্যে রয়েছে খালিদ হোসেন সম্পদ (নবাবগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক) এবাদত আলী (ছাত্রলীগ আগলা হাইস্কুল শাখার সভাপতি, বাবলু (ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী) এবং এবারকার এস এসসি পরীক্ষার্থী রবি (ছাত্রলীগ কর্মী), মোতালেব, কালু এবং এবাদত (২)। — গতকাল বিকেল পর্যন্ত নওয়াবগঞ্জের নদীতে দু'টো মহিলার লাশ ভাসতে দেখা গেছে বলে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। ... বাংলাদেশ স্টাইলে নওয়াবগঞ্জকে বধ্যভূমি বানাবার পৈশাচিক নায়ক হচ্ছে ঐ এলাকার আওয়ামীলীগের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি গত ১৬ তারিখ ঢাকা থেকে রক্ষীবাহিনী নিয়ে রাতেই নওয়াবগঞ্জ যান এবং ঐ রাতেই নাকি ঐ অঞ্চলের মুজিববাদীদের সাথে এক গোপন বৈঠকে বসেন।······১৭ তারিখে সকালে মুজিববাদীরা রক্ষীবাহিনীর সাথে এল এম জি. স্টেনগান এস এল আর. চায়নিজগান, রিভলভার এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রসহ রাস্তায় নামে। সকাল থেকেই তারা বাড়ীবাড়ী জাসদ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ কর্মীদের তল্লাশী শুরু করে। তারা সদম্ভে ঘোষণা করে মুজিববাদের বিরোধীদের এক আপোষহীন মৃত্যুর খেলা দেখানো হবে। ... অপরাহ্নের দিকে রক্ষীবাহিনী এবং মুজিববাদীরা বাবলুকে বাগমারী নিয়ে যায়। বাগমারায় রবির সিগারেটের দোকানে খালেদ হোসেন সম্পদ উপস্থিত ছিলো। সম্পদ, রবি আর বাবুলকে মুজিববাদীরা অগণিত ভয়ার্ত জনতার সামনে গুলী করে হত্যা করে। তখন বিকেল প্রায় পৌণে পাঁচটা। — সেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়েই পান্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিশিষ্ট কর্মী কাজী দারাজউদ্দিনের বাড়িতে হামলা চালায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন তার উপর মেশিনগানের গুলী ছোঁড়া হয়। তবে দারাজউদ্দিন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। তখন তার বাড়ীতে আগত অতিথিকে

মুজিববাদীরা টে[illegible] [illegible] করে [illegible]ের উপরও গুলী চালায়। ঠিক এমন সময় পাশের ঢাকা থেকে নওয়াবগঞ্জে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ যাচ্ছিল। মুজিববাদী এবং রক্ষীবাহিনী মনে করে ঐ লঞ্চে হয়তো তাদের বিরোধী কেউ রয়েছে। তখন রক্ষীবাহিনী ঐ লঞ্চকে থামতে বলে। সারেং লঞ্চ থামাচ্ছিলেন, কিন্তু থামাবার সময়ও সারেং পাননি। তার আগেই উপর্যুপরী কয়েকবার ব্রাশ ফায়ার করা হয়। আর সেই সঙ্গে লঞ্চে যে কত জীবন মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছে তার সঠিক হিশেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।...... ঢাকা পুলিশ সূত্রে গত রাতে জানানো হয়েছে ৭জনের মৃত্যু ও ২জনের আহত হবার কথা।'
(গণকণ্ঠ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'নওয়াবগঞ্জে সংঘঠিত বর্বর হত্যাকাণ্ডের রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতেই মুজিববাদী গুণ্ডারা এবার বগুড়ায় এক পৈশাচিক রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।......মুজিববাদী গুণ্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তিনজন কর্মীকে প্রকাশ্য রাস্তায় স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করেছে। বাকী তিনজনকে অপহরন করে নিয়ে গেছে। এদেরকেও একই কায়দায় শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে রুনু এবং আবদুর রশিদ। নিহত অপর জনের নাম তোতা।

'সকালের দিকে মুজিববাদী গুণ্ডারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সুত্রাপুর আঞ্চলিক শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য চঞ্চলসহ ছাত্রলীগের আরো দু'জন কর্মীকে গুম করে ফেলে।...... সন্ধ্যার দিকে নিহত রুনু, রশিদ এবং তোতা রিক্সায় করে এদের খুঁজতে বের হয়। রিক্সা জলেশ্বরীতলায় জনাব মোজাম পাইকার ও হামিদ শাহের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্য একটি রিক্সা থেকে রুনু, রশিদ এবং তোতার উপর স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করা হয়। এতে দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আহত তোতাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।'
(গণকণ্ঠ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা জনাব আনিসুজ্জামানের ছোট ভাই জনাব গোলাম কিবরিয়াকে গতকাল (২ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন ২টায়

সময় মুজিববাদীরা গুলী করে হত্যা করেছে।
(গণকন্ঠ: ৪ সেপ্টেম্বর—'৭৩)

'বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিপ্লবী সাথী, জাকসুর সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন রোকন পরিণত হয়েছেন গুপ্ত হত্যার শিকারে।...... ক্ষমতাসীন দলের পোষ্য গুন্ডা বাহিনী রাতের অন্ধকারে বর্বর কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে তাকে। গত শনিবার রাতে নারায়নগঞ্জ জাসদ অফিস থেকে তার বোনের বাসায় যাবার পথে প্রকাশ্য রাস্তা থেকে মুজিববাদীরা বুকের উপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রোকনকে ছিনতাই করে। তার সাথে রিক্সার সহযাত্রী অন্য একজন ছাত্রলীগ কর্মীও ছিল। গতকাল রোববার (৭ অক্টোবর) লক্ষীনারায়ন কটন মিলের সামনে রোকনের লাশ পাওয়া গেছে।'
'রক্ষীবাহিনী ভালুকা থানার নিরীহ জনসাধারনের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করেছে। রাতে বাড়ী বাড়ী ঘেরাও, পাকিস্তানীদের কায়দায় লুন্ঠন ও নারী নির্যাতন সবই তারা করেছে।
(গনকন্ঠ: ৮ অক্টোবর—'৭৩)

'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পাবনা জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক জনাব আসফাকুর রহমান কালু, বিশিষ্ট জাসদ কর্মী ফারুক ও পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি জনাব মাসুদকে সম্প্রতি রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে ঢাকায় প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে। ইতিপূর্বে রক্ষীবাহিনী পাবনা জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহসান হাবিবের ছোট ভাই সিদ্দিকুর রহমানকেও পিটিয়ে হত্যা করে।'
(গনকন্ঠ: ২৪ অক্টোবর—'৭৩)

'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজশাহী জেলা শাখার সহ সভাপতি এবং বাগমারা থানা জাসদের সাধারন সম্পাদক জনাব মনিরুদ্দিন আহমদ ও তার ছোট ভাইকে রক্ষীবাহিনী গত ২১ শে অক্টোবর রাতে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।'
(গনকন্ঠ: ২৫ অক্টোবর—'৭৩)

'গতকাল শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর), পল্টনে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নির্মম পৈশাচিকতার একজন মৃত স্বাক্ষী উপস্থিত ছিলেন। তার নাম হারুন। বাড়ী চাপাই নবাবগঞ্জ। ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান তাকে পল্টনের জনতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনিই তাকে মৃত স্বাক্ষী বলে অবহিত করেন। কারন রক্ষীবাহিনী হারুনকে গুলী করেছিলো রাতের অন্ধকারে। আর্তনাদ শুনেছিলো তার/তাকে মৃত বলেই তাদের জানার কথা।'

'হারুন পল্টনের জনতাকে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়েছেন। তার ভাষায় কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ "আমি আমার বাড়ীতে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ রাত তিনটের সময় আমার স্ত্রী বলল, তোমাকে কেউ ডাকছে। উঠে দেখলাম দরজায় ৫/৬ জন রক্ষীবাহিনী আমার ভাইকে ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাকেও ধরলো। এতো চুপচাপ আমাদেরকে বাড়ী থেকে নিয়ে গেলো যে মা'ও টের পেলেন না কিছুই। আমার হাতে ঘড়ি ছিলো। রক্ষীবাহিনী বললো, "ঘড়ি ও আংটিটা রেখেদে।" তখনই বুঝতে পারলাম, আমরা আর ফিরে আসতে পারবোনা। আমাদেরকে ট্রাকে তোলা হলো। সেখানে শীষ মোহাম্মদ ও মন্টুকে দেখলাম। ট্রাক চললো। কোথায় নিয়ে গেলো জানিনা। পদ্মার পাড়ে এক জায়গায়। আমাদেরকে নামানো হলো। উদ্দেশ্য গুলী করা হবে। ওরা নাম ধরে ডাক দিলো। 'জালাল' ও গোবিন্দ নাম দু'টো শুনলাম। আমি বুঝলাম মৃত্যু অনিবার্য। একজন রক্ষী আমাকে ধরে রেখেছিলো। আকস্মিকভাবে তার হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে দৌড় দিলাম পদ্মার দিকে। একটা বেড়ায় আটকে গিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। গুলী ছুড়লো ওরা। ঝট করে মাটি থেকে উঠে এ'কে বে'কে দৌড়ে পদ্মায় ঝাঁপ দিলাম। আড়াই মাইল সাঁতার কাটার পর মাঝিদের ডাক শোনা গেলো। আমার মনে হলো রক্ষীবাহিনীই বুঝি ডাকছে। ভোরে এক মাঝির লুঙ্গী পরে তীরে উঠলাম। জানিনা আমার কি অপরাধ? ডঃ মেজবাহুল হক এম পি একদিন আমার কাছে টেলিফোনের কল চেয়েছিলেন। কল দিতে সামান্য দেরী হওয়াতেই

আমার উপর এই মৃত্যুদণ্ড। জানি না মা কোথায়?— আমার কোনো আশ্রয় নেই। আপনাদের কাছে আমি নিরাপত্তা চাই।'
(গণকণ্ঠ ১৫ ডিসেম্বর '৭৩)

'গত ১০ ডিসেম্বর তানোর থানার মোহাম্মদপুর, চৌবাড়িয়া, পূর্বপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ১৩১ ব্যক্তিকে যৌথ বাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাদের প্রত্যেককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বলা হয়েছে নিহত ব্যক্তিরা বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করছিলো।'
(গণকণ্ঠ ১৯ ডিসেম্বর—'৭৩)

'সমগ্র সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সশস্ত্র মুজিববাদী গুণ্ডাবাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সশস্ত্র মুজিব বাদী গুণ্ডারা সিরাজগঞ্জে ২১ টি সুরক্ষিত ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এই ২১ টি ঘাঁটি থেকেই সারা মহকুমায় অপারেশন চালানো হচ্ছে। এদের নির্যাতন এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে মহকুমার ৯টি থানার ১৩ টি রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প থেকে সাহায্য করা হচ্ছে।.......ইতিমধ্যে এই যৌথ বাহিনী জাসদ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য প্রগতি শীল বামপন্থী বিরোধী দলীয় প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইজ্জত বাচানোর জন্য যুবতী মেয়েরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছেন।
(গণকণ্ঠ : ২৬ ডিসেম্বর—'৭৩)

'ঈদ বোনাস দাবীর জবাব এসেছে প্রাণঘাতী বুলেটের ভাষায়। হয়েছে নির্যাতন, চলেছে গুলী।··· নওয়া পাড়ার কার্পেটিং জুট মিলের শ্রমিকদের উপর রক্ষী বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের গুলী বর্ষণে ৪ জন নিহত এবং ৫০ জন আহত হয়েছে।'
(গণকণ্ঠ : ৩ জানুয়ারী—১৯৭৪)

'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বরিশাল জেলা শাখার সহ সম্পাদক জনাব গোলাম কবিরকে গতকাল মঙ্গলবার রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে গেছে। জানা গেছে, পরে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়।'
(গণকণ্ঠ : ১১ জানুয়ারী—'৭৪)

'মুজিববাদীদের গুলীতে যশোরের বিপ্লবী জননেতা মোশাররফ হোসেনের জীবনাবসান ঃ আরো ২ জন গরুতর আহত। জাসদের সহ সভাপতিকে গুলী করে হত্যা।··· গতকাল রোববার (৩ ফেব্রুয়ারী) রাত সাড়ে আটটার সময় এডভোকেট মোশাররফ হোসেন যশোহর শহরের গুরুদাস বাবু লেনস্থ জাসদ কার্যালয়ে বসে যখন যশোর জেলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের এবং স্থানীয় জাসদ নেতা আবদুল খালেকের সাথে সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করছিলেন—ঠিক সেই সময় অন্ধকারে কালো চাদর মুড়ি দেয়া দু'জন মুজিববাদী সশস্ত্রঘাতক আলোচনারত জনাব মোশাররফ হোসেন এবং অপর দু'জনকে লক্ষ্য করে দু'টো স্টেনগান থেকে একযোগে গুলী চালায়। তাদের পরনে ছিল প্যান্ট, রুমালে মুখ বাধা ছিলো যাতে কেউ সহজে সনাক্ত করতে না পারে। দরজার দিক থেকে ছোড়া স্টেনগানের ব্রাস ফায়ারে তার বুক ঝাঝড়া হয়ে যায়। যে চেয়ারটিতে বসে তিনি কথাবার্তা বলছিলেন সেই চেয়ার থেকে এলিয়ে পড়লেন ঘরের মেঝেয়। মুখ থেকে শুধু একটা কথা বের হলো 'আল্লাহ।' তার স্ত্রী, পুত্র কন্যারা ছুটে আসার সুযোগও পেলেন না। তার পূর্বেই জনাব মশাররফ শাহাদাত বরণ করেন। গুলীবিদ্ধ জনাব আবদুল কাদের এবং জনাব আবদুল খালেকের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।'
(গণকণ্ঠ ঃ ৪ ফেব্রুয়ারী '৭৪)

'রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা গত বৃহসপতিবার ১০ অক্টোবর—'৭৪) অস্ত্রের মুখে ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার একটি বাড়ী থেকে ৯ হাজার ২শ' ৮০ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। গতকাল ১৮৫, ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার জনৈক আবদুল হাকিম এক লিখিত অভিযোগে (লালবাগ থানায়) একথা জানিয়েছেন।
(গনকণ্ঠ ঃ ১২ অক্টোবর—'৭৪)

'গত ২৪শে অক্টোবর শাসক গোষ্ঠীর পোষ্যগুন্ডারা জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল তালা থানার সাধারণ সম্পাদক আবদুল হালিম ও জাতীয়

কৃষকলীগের একজন কর্মী জনাব হাতেম আলীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বলে নিজস্ব সংবাদ দাতা জানিয়েছেন।'
(গণকণ্ঠ ২৮ঃ অক্টোবর—'৭৪)

'জাসদের খাড়োরা ইউনিয়ন (নান্দাইলের) কোষাধ্যক্ষ জনাব গিয়াস উদ্দিন মাস্টার রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন।'

(গণকণ্ঠ ২৮ঃ অক্টোবর—'৭৪)

'বাগের হাটে রক্ষীবাহিনী ২জন জাসদকর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এদেরকে ২৬শে নভেম্বর হরতালের দিন গ্রেফতার করা হয়েছিল। ... রক্ষীবাহিনীর নির্মমনির্যাতনের শিকারে নিহত জাসদ কর্মীদ্বয় হচ্ছেন আজমল খান এবং মৃনালকান্তি পাল।'

(গনকণ্ঠ ১ ডিসেম্বর—'৭৪)

'গত বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর—'৭৪) সকাল সাড়ে ৯টায় একজন সশস্ত্র মুজিববাদীর হামলায় তিন ব্যক্তি নিহিত ও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। ... সশস্ত্রগুন্ডাবাহিনীর গুলীতে শামসুদ্দিন আহমদ গুরুতর ভাবে আহত হন ও পরে অপহৃত হন। সশস্ত্র ব্যক্তিদের ভয়ে বাড়ীর সবাই দরজা বন্ধ করে রাখলে তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে। এবং খন্দকার হুমায়ুন ও তার ভাগিনাকে ধরে নিয়ে প্রকাশ্যগুলী করে হত্যা করে। সামসুদ্দিন আহমদের ভাই কুটি মিয়া দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলে মুজিববাদীরা তার উপরও গুলী চালায়। এবং হাতে গুলীবিদ্ধ কুটি মিয়াকে পরে পিটিয়ে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটে নবাবগঞ্জ থানার আগলা ইউনিয়নের বেজুখালী গ্রামে।'

(গনকণ্ঠঃ ২৮ ডিসেম্বর—'৭৪)

স্বাধীনতার পর শ্রমিকদের হত্যা ও নির্যাতন করা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর '৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেখেনঃ

'সমাজতন্ত্রের ভেকধারী বাংলাদেশ সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় বিশেষত খুলনা ও চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে শ্রমিক হত্যা শুরু হয়েছে। এই ব্যাপক শ্রমিক হত্যা যে অরাজনৈতিক নয়, সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়।'

'কিছুদিন পূর্বে খুলনায় একদল শ্রমিককে আর এক দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং এ দেশের গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রুরা অসংখ্য শ্রমিককে খুন করেছে, তাদের গৃহ লুন্ঠন ও দাহ করেছে, তাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও তারা কোনদিক থেকেই রেহাই দেয়নি। শ্রমিকদের এক বিরাট অংশকে এইভাবে শাসক-শোষক শ্রেণীর সুপরিকল্পিত ও সশস্ত্র হামলার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এই কাজ সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে চাতুর্যের সাথে শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।'

'১৯৭৩ সালের গোড়াতেই জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ভিয়েতনামকে উপলক্ষ করে পরিচালিত বিক্ষোভ মিছিলের ওপর গুলীবর্ষণকে কেন্দ্র করে যখন ঢাকা এবং দেশের সর্বত্র তোলপাড় হচ্ছে সেই সুযোগ শ্রমিক-শ্রেণীর শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত একটি শ্রমিক সংগঠনের আক্রমণে কালু-ঘাটে অসংখ্য শ্রমিক হতাহত হয়। সেখানে শ্রমিক ইউনিয়নকে ভেংগে দিয়ে নিজেদের তাবেদার ইউনিয়ন গঠনের জন্যে তারা এ কাজ করে।'

'বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাড়বকুন্ডে অবস্থিত আর, আর, টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক হামলার খবর এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সর-কারী হিসেব মতে সেখানে নিহতের সংখ্যা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে ২২ জনে। বেসরকারী শ্রমিক ও অন্যান্য সূত্রের খবরে বলা হচ্ছে যে, সেখানে নিহতের সংখ্যা শতাধিক। সব মিলিয়ে সেখানে হতাহতের সংখ্যা বিরাট।'

'শ্রমিকদের ওপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিরাট এক বাহিনীর এই সংগঠিত আক্রমণ যে অপরিকল্পিত ও রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন

গুণ্ডাশ্রেণী ও দুষ্কৃতিকারীদের কর্মকাণ্ড এটা মনে করার কোন কারণ নেই। যা কিছু তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে তা থেকে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত এবং শোষকশ্রেণীর রাজনীতির সাথে গভীর ও নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই ফ্যাসিবাদী হামলা যে সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান শ্রমিক ইউনিয়নকে ভেংগে দিয়ে শোষক শ্রেণীর একটি আবেদার শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'
(বাংলাদেশে শ্রমিক হত্যা: গণকণ্ঠ: ৯ ফেব্রুয়ারী-১৯৭৩)

'গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত সাড়ে দশটা। নিস্তব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। অন্ধকার রাস্তা। সেই নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করিয়া একটি জীপ আসিয়া দাড়াইল শামসুন্নাহার হল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানে। জীপ হইতে নামানো হইল হাত পিছমোড়া দিয়া বাঁধা, মুখ চোখ বাঁধা পাঁচটি তরুণকে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া স্টেনগানের গুলীতে ঝাঁজরা করিয়া দেওয়া হইল পাঁচটি তরুণ বক্ষ। একবার, দুইবার, কয়েকবার। শিহড়িত হইল মানবতা। রাত্রি সাড়ে দশটায়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাঁচটি রক্তাপ্লুত তরুণ আর পৈশাচিক বিভীষিকাকে পিছনে ফেলিয়া জীপটি ফিরিয়া গেল। পেছনে একটি সদো মাজদা গাড়ী রক্ষক হিসাবে।'
(ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭৩)

১৯৭৩ সালের ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে ১২ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক রিপোর্টার লেখেন:

'গতকাল সোমবার ডাকসু হল নির্বাচনের ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দে সচকিত হইয়া উঠে। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল ব্যতীত অন্যান্য হলের অধিকাংশ ব্যালট বাক্সই অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়। তবে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালটবাক্সগুলি ভোট গ্রহণের পর কড়া প্রহরাধীনে রাখার ফলে ছিনতাই হইতে পারে নাই। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, ডাকসুর ভোট গণনা স্থগিত করা হইয়াছে।

গভীর রাত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহিত যোগাযোগ করিলে জানা যায় যে, ডাকসু নির্বাচনের ভোটগণনাকালে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনায় আহত পাঁচজন ছাত্রকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

'এদিকে গত কালের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও রব সমর্থিত ছাত্রলীগ পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছে। রাত্রি সাড়ে বারোটায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি ও চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছিল। সাধারণ ছাত্ররা গোলাগুলি শুরুর পর থেকেই হল ছাড়িতে শুরু করেন।

বামপন্থীদের উপর আওয়ামী লীগ সরকারের দমন পীড়ন সম্পর্কে '৭৩ সালের নভেম্বরে বদরুদ্দীন উমর লেখেন :

বিগত ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সংগে ডাকাতদের কোন পার্থক্য নেই। —রাতের অন্ধকারে গোপনে হত্যা করে বিপ্লব করা যায় না। তোমরা যে পথ ও দর্শন বেছে নিয়েছো তা ভুল।... আমরা গণতন্ত্র দিয়েছি ঠিক। কিন্তু কেউ যদি রাতের বেলায় নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে তা'হলে জনগণের সরকার হিসেবে আমাদেরও তাদের গুলী করে হত্যা করার অধিকার আছে।"
(বংগবার্তা, ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩)

'প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত ছাত্র সম্মেলনে আরও বলেন, "সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রয়োজনবোধে আরও রক্ত দিতে হইলে বা চিলির মত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেও এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"
(ইত্তেফাক, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৩)

ঐ একই দিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রাজশাহীর এক জনসভায় বলেন, "সরকার যে ভাবে

বিরোধী দলীয় কর্মী হত্যা করা শুরু করেছে তার ফলে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ হতে চলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আর কোন সভা-সমিতিতে ন্যাপ অংশগ্রহণ করতে পারবে না।...দমননীতির দ্বারা এবং মানুষকে হত্যা করে দেশ শাসন করা যায় না। আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের পতন হয়েছে, এভাবেই হত্যার রাজনীতি চলতে থাকলে এ সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী।... ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও! নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিরোধী দল ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক সরকার বেঁচে থাকতে পারে না।"
(বঙ্গবার্তা, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৩)

'বিরোধী দলীয় কর্মীদের হত্যা সম্পর্কে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্যও এক্ষেত্রে মৌলানা ভাসানীর বক্তব্যের অনুরূপ।'

'প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে রক্ষা ও পরিচালনার প্রাথমিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে কর্মী ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করছেন এবং সেই হিসেবে ডাকাতদের সাথে তাঁদের কোন পার্থক্য নেই। এবং পার্থক্য নেই বলেই তাদেরকে হত্যা করার অধিকার সরকারের আছে বলেও তিনি ঘোষণা করছেন। এই হত্যা করার "অধিকার" বলে বলীয়ান হয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার বিরোধী দলীয় এই "ডাকত" রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যক্তিদেরকে বাস্তবত হত্যা করছেন কিনা সে-কথা প্রধানমন্ত্রী অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেননি।

এদিকে মৌলানা ভাসানী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ সরকারের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, সরকার যেভাবে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করছেন তাতে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ হতে চলেছে। বিরোধী দলগুলির প্রতি সরকারের চরম শত্রুতামূলক আচরণের উল্লেখ করে মৌলানা ভাসানী সরকারকে ইতিহাস

থেকে এই শিক্ষা নিতে বলেছেন যে, বিরোধী দল ছাড়া কোন দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।'

এ সরকার ও বিরোধী পক্ষের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে প্রথমেই যে জিনিসটি স্পষ্ট হয় তা হলো আজকের বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির আবহাওয়া বর্তমান আছে একথা কেউই স্বীকার করছেন না। উভয় পক্ষই একমত হয়ে বলেছেন যে, এদেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে সেটা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরূপ। কিন্তু এই একমতের পর দ্বিমত হচ্ছে তখন যখনই এই বাধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টনের প্রশ্ন উঠছে। বাংলাদেশ সরকার এবং তার প্রধানমন্ত্রী বলছেন, এই অবস্থা সৃষ্টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিরোধী দলের। এবং বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে. সরকার তার বিভিন্ন বাহিনীর মাধ্যমে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে এবং সেই সরকারী সন্ত্রাসের কারণেই সমগ্র দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ আজ রুদ্ধ হয়েছে।'

'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দুটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত এক ধরনের বিরোধী দলীয় কর্মীদেরকে 'ডাকাত' হিসেবে বর্ণনা। এবং দ্বিতীয়, যেহেতু তারা 'ডাকাত' সেজন্যে তাদেরকে গুলী করে হত্যার ক্ষেত্রে সরকারের 'অধিকার' থাকার কথা।'......

'দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি প্রসঙ্গে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেটা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাথে ১৯৭২ সালের মার্চ-ডিসেম্বরে সহযোগিতার অপরাধে অপরাধীদের সরকার সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করলেও বাংলাদেশের কারাগারসমূহ এখনো শূন্য হয়নি। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন কারাগারে এখনো আটক রয়েছেন, তাদের অনেকের বিরুদ্ধে এখনো মামলা চলছে এবং অনেকের মাথার ওপরে হুলিয়া ঝুলছে। মহানুভব আওয়ামী লীগ সরকার তাঁদেরকে "ক্ষমার" অযোগ্য বিবেচনা করছেন।

'বাংলাদেশে এই তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সরকার বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে নিজেদের ক্ষমার অযোগ্য এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতাকারীদের ক্ষমার যোগ্য কেন বিবেচনা করলেন, সেটা বোঝার জন্য স্মরণ রাখা দরকার উল্লিখিত সহযোগিতাকারীদের রাজনৈতিক চরিত্র কি। আমরা পূর্বেই বলেছি, এই সমস্ত ব্যক্তিরা সাধারণ ভাবে সাম্প্রদায়িক হিসেবে ভারতবিরোধী মাত্রেই (তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ভারত বিরোধী মাত্রেই সাম্প্রদায়িক), সোভিয়েত বিরোধী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত। অন্যদিকে আটক বামপন্থী অসাম্প্রদায়িক কারণে ভারতবিরোধী এবং মার্কিন ও সোভিয়েতবিরোধী। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সোভিয়েত ও ভারতবিরোধিতার (দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন কারণে) ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বর্তমানে আটক ব্যক্তিদের একটা বাহ্যিক মিল থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও মার্কিন বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন মিল, ঐক্য অথবা সাদৃশ্য নেই।'

(বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি : বঙ্গবার্তা : ১৫ নভেম্বর-১৯৭৩)

'সব ধরনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনী আইনের মধ্যেও তাদেরকে আদালতে উপস্থিত করার যে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে তা না করে তাদের ওপর তারা হিংসাত্মক শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে।...রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর অস্বাভাবিক নির্যাতন ও তাদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির কাহিনীও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের এমন কি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের মাধ্যমেও ফাঁস হয়ে পড়ছে।......

"বাংলাদেশ সরকার বিরোধী দলীয় মতামতকে দমনের চেষ্টা করছেন শুধু তাদেরকে জেল দিয়ে এবং নির্যাতন ও শারীরিকভাবে খতম করেই নয়; তারা এর জন্য ১৪৪ ধারাও দেশময় জারি করেছেন। বাহ্যত এটা তারা করেছেন দুইমাস পূর্বে আরম্ভ করা তাদের তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের সুবিধের জন্যে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল, এদেশে বিরোধী মতামত প্রকাশ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত হতে না দেওয়া।"

(মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির দেয়া বিবৃতির একাংশ; প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর দৈনিক বাংলায়)

'মুজিবের নয়া মন্ত্রীসভার তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলী তার এলাকায় একটা ঘাতকবাহিনী তৈরী করেছে। এলাকার দাগী আসামী, খুনী, চোর ডাকাতদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই বাহিনী।.........শুধু কোরবান আলীই নয়, ঢাকার গাজী গোলাম মোস্তফা থেকে শুরু করে বরিশালের হাসনাত পর্যন্ত সমস্ত আওয়ামীলীগ ও যুবলীগারদের নিজস্ব বাহিনী আছে।'

(লড়াই : ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫)

১৯৭৪ সালের ৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৭ খুনের ঘটনা সম্পর্কে ১২ এপ্রিল '৭৪ ইত্তেফাকের রিপোর্ট :

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবার রক্ত ঝরিয়াছে, আবার স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হইয়াছে রাত্রির অন্ধকার। আবার মানবতার হৃদপিন্ড হিংস্রতার কুটিল নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি দুইটা এগার মিনিটে মহসীন হলের টিভি রুমের সম্মুখস্থ করিডোরে একই সঙ্গে সাতটি ছাত্রের দেহ ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে বুলেটের সুতীক্ষ্ম আঘাতে। রক্তাপ্লুত প্রাণহীন সাতটি তরুণের দেহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকের নিকট প্রশ্ন রাখিয়াছে, এ হত্যাকান্ড যদি রাজনীতির পরিণতি হয়, তাহা হইলে সাতটি তরুণ-দেহের বিদ্ধ প্রতিটি বুলেট কি রাজনীতিকেই হত্যা করিবার জন্য বর্ষিত হয় নাই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি নিহত তরুণের আত্মা চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, কোথায় সুস্থ জীবন যাত্রার নিরাপত্তা, হত্যাকারীর সদম্ভ প্রস্তুতি প্রতিহত করার দায়িত্ব যাহাদের হাতে সরকারী ভাবে ন্যস্ত, কোথায় তাদের তৎপরতা?

সূর্যসেন হলের প্রতিটি কক্ষে সে রাতেও ঘুম নামিয়াছিল, ঘুম নামিয়াছিল হলের ৬৩৫ ও ৬৮ নাম্বার কক্ষেও। কিন্তু প্রভেদ শুধু এটুকুই, এই

দুই কক্ষে ঘুমন্ত সাতটি তরুণ বৃহস্পতিবার রাত্রি আড়াইটার পর চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়া পরিণত হইয়াছে এক শিহরণ জাগান খবরে।

সেই ভয়াল রাতে দশ পনেরজন সশস্ত্র ব্যক্তি হলে প্রবেশ করিয়াছে। ফাঁকা গুলী ছুঁড়িয়া সগর্বে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করিয়া তাহারা পাঁচ তলায় উঠিয়া যায় এবং প্রথমে ৬৩৪ নাম্বার রুমের দরজায় করাঘাত করিয়া কোহিনুর কোহিনুর বলিয়া ডাক দেয়। তাহার পর দরজা খুলিয়া গেলে সামরিক কায়দায় হ্যান্ডস আপ করিবার নির্দেশ নেয়। ঐকক্ষে তখন কহিনুরসহ চারজন ছাত্র অবস্থান করিতেছিল। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর কোহিনুর দরজা খুলিলে তাহারা ঘরের চারজনকেই হ্যান্ডস আপ করাইয়া রুমের বাহিরে লইয়া আসে। ঐ সময়ে সশস্ত্র ব্যক্তিদের এক অংশ ৬৪৮ নাম্বার কক্ষ হইতে তিনজনকে 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থায় বাহির করে এবং সাতজনকে একত্রে স্কট করিয়া লইয়া যায়। ঐ সময় কোহিনুরকে কাকুতি মিনতি করিয়া প্রাণে না মারার জন্য অনুরোধ করিতে শোনা যায়।

তাহারা দোতালায় নামিয়া ২৫ নাম্বার কক্ষের একটা ছাত্রকে চিৎকার করিয়া খোঁজ করে। সেই ছাত্রটি অবস্থা বেগতিক দেখিয়া কক্ষের জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়ে। ঐ সময় ছাত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করা হয়। সৌভাগ্যবশত গুলি তাহার গায়ে লাগে নাই। দোতালা হইতে লাফাইয়া পড়ার ফলে আহত হইলেও সে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

সাতটি হতভাগ্য তরুণকে যখন সূর্যসেন হল হইতে হাজী মুহসিন হলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন রাত্রি দুইটা চার মিনিট। মুহসীন হলের টিভি রুমের সম্মুখস্থ করিডোরটিকে বধ্যভূমি হিসাবে নির্বাচিত করিয়া সাত জনকে সেখানে দাঁড় করান হয়।

রাত দুইটা এগার মিনিটের সময় হতভাগ্য তরুণদের লক্ষ্য করিয়া ব্রাস ফায়ার করা হয়। তাহাদের প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়ার পরও কয়েকবার ফাঁকা ব্রাস ফায়ার করা হয়। অতঃপর রাত ২-২৫ মিনিটে তাহারা ধীরে
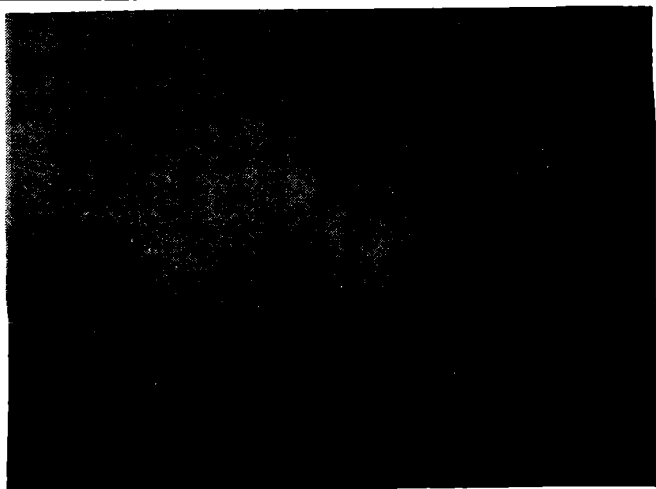
আহত একজন —গণকণ্ঠ

রক্তপাতের মানচিত্র

কাজী শামিম ঃ শরীরে এখনো রক্ষীবাহিনীর মারের দাগ

সঙ্গে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ভোর ৪টার পর পুলিশকে খবর দেয়া হয় এবং লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়।

এই ঘটনায় যারা নিহিত হন তাদের নামঃ ১। নজমুল হক ওরফে কোহিনুর ২। মোহাম্মদ ইদরীস, ৩। রেজওয়ান রব ৪। সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ, ৫। বশির উদ্দীনআহমদ, ৬। আবুল হোসেন; ৭। এবাদ খান।'

এই ঘটনার দু'দিন পর ছাত্রলীগেরই একটা অংশের নেতাসহ বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বিচারে তাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সনে পূর্ণমেয়াদ কারাভোগের অনেক আগেই মুক্তি দেয়া হয়।

জেলেও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের স্বস্তি ছিল না। এ সম্পর্কে হলিডে ১৯৭৪ সালের ১০ নভেম্বর লিখেছে: 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েকজন রাজবন্দীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ন্যাপ (ভাসানী) এর জেনারেল সেক্রেটারী মশিয়ুর রহমানের (৫২) উচ্চরক্তচাপ, গ্যাসট্রিক ও হৃদযন্ত্রের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তিনি বিশেষ ক্ষমতা আইনে গত জুলাই থেকে আটক আছেন।.........জাসদের তরুণ সাধারণ সম্পাদক আ,স,ম আবদুর রব গত মার্চে গ্রেফতার হবার পর তাকে একটি নির্জন সেলে রাখা হয়েছে যেখানে তিনি ভীষণভাবে শারীরিক ও মানসিক উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করছেন। তার পাশের সেলেই রয়েছে ২০ জন উন্মাদের কক্ষ যারা মানসিক ভাবে খুব বিশৃংখল এবং এদের হৈ চৈ চিৎকারে রাত্র-দিন দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছে জনাব রবের।.........বিপ্লবী নেতা ওয়াহিদুর রহমানের ছোটভাই একরাম (২৩) ঢাকা জেলে বিভিন্ন পন্থায় নির্যাতিত হয়ে এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি বিচারাধীন বন্দী হয়ে আটক আছেন বহুদিন ধরে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ এখনো প্রমাণিত হয়নি। তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতির কারণে বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাকে দীর্ঘদিন আটক রাখার বিষয়টিই এখন মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

জাসদ নেতা এম, এ আউয়াল ১৯৭২ সাল থেকেই ঢাকা জেলে ছিলেন। তার ক্রোনিক সাইনাস, দাঁতের রোগ ও গ্যাস্ট্রিক সমস্যা বেড়েছে। ঢাকা জেলে শুধুমাত্র তার স্ত্রীরই তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল, তাও প্রতিবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমতি দিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। গত জুলাই মাসে আউয়ালকে বিনা কারনেই রাজশাহী জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঢাকা জেল গেটে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ খবর শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস আউয়াল। ঢাকা থেকে চার শ' মাইল দূরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে অসম্ভব যাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে।

রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ও জংলী ব্যবহার করা হয়. কোন নোটিশ ছাড়াই নিয়ম কানুন বদলানো হয়। বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বলে অভিযুক্তদের সংগে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের-ও টার্গেটে পরিণত করে হয়রানী করা হয়।.........রাজবন্দীদের সংগে সাক্ষাতের নিয়মকানুন জটিলতর করে এ ব্যাপারে কৌশলে নিরুৎসাহ প্রদান করা হয়।

দীর্ঘ আটক জীবনে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে যাদের দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না তারা হচ্ছেন : কুমিল্লা জেলের টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমান যশোহর জেল, তাঁর স্ত্রী পারুল রাজশাহী জেল, ঢাকার জেলের সাংবাদিক হাবিবুর রহমান, একরাম, শহীদ, রেফাজ, আহমেদুল্লাহ, চঞ্চল সেন, সুব্রত সহ হাজার হাজার আটক বন্দী, যাদের জীবন হারিয়ে যাচ্ছে জেলের চার দেয়ালে,

(Appaling Condition in Bangladesh Jail : Holiday : November 10, 1974)

'সাপ্তাহিক গণশক্তি' থেকে

'বাকশালী আমলে সরিষা বাড়ীতে অত্র এলাকার বাকশালী এম পি মালেক তার ভাড়াটে ঘাতকদের দ্বারা জবান ও সোবান নামক দু'জন দেশ-

প্রেমিক প্রেমিককে তাদের ঘর থেকে ল্যাংটা অবস্থায় বের করে এনে হ্যাজাক লাইটের আলোয় প্রকাশ্য পথে প্রথমে গুলী করায় এবং পরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করায়।

উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডের রাতে নাকি খুনী এম পি মালেকের ইঙ্গিতে বাজারের পুলিশ প্রহরা তুলে নেয়া হয়েছিল। এই ঘটনার দিনকয়েক পরে ঘটনার নায়ক বাকশালী খুনী এম পি-র পুত্র শাহজাত রাজজাক তার বাবার ভাড়াটে গুণ্ডা মুনছেরের পুত্রসহ আরো কতিপয় গুণ্ডার সহযোগে এস, এম, জি-র মাধ্যমে হীরু নামক জনৈক ছাত্রকেও হত্যা করার চেষ্টা করে। স্থানীয় জনগণ নাকি হীরুকে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

বাজারে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকেও তারা একটি মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে স্থানীয় লোকদের ধাওয়া খেয়ে পরে দা দিয়ে উক্ত লোকদের জবাই করতে গিয়েছিল।

সরিষাবাড়ী আর, ডি, এম স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব হারুনুর রশিদ যাতে নির্বাচনে খুনী এম পি-র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে তার জন্য উক্ত শিক্ষক মহোদয়কে কৌশলে আখাউড়া রেল সড়কের ধারে নিয়ে হত্যা করিয়ে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথের বাধাকে অপসারিত করে।

খুনী মালেক তার কন্যার (প্রেমিককেও হত্যা করার জন্য ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিল। কিন্তু উক্ত প্রেমিকের চিৎকারে অত্র এলাকার লোকজন প্রেমিক প্রবরটিকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে উদ্ধার করেছিল। খুনী এম পি মালেকের নামে বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে একটি মামলাও নাকি দায়ের করা হয়েছিল. টাকার জোরে উক্ত মামলা এখন নাকি নেই। এছাড়াও মাত্র দিন কয়েক পূর্বে মালেকের গুণ্ডা মনসুর আলী ও তার দলবল জনৈক অধ্যাপককে স্টেশনে প্রহার করে আহত করে। সরিষা বাড়ীর জনগণ উক্ত বাকশালী খুনী এমপি-র

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ তদন্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
(গণশক্তি : ১৬ জানুয়ারী ১৯৭৭)

'সম্প্রতি সিরাজ গঞ্জের সাবেক এমপি ও গণহত্যাকারীর নায়ক সৈয়দ হায়দার আলী ঢাকায় গ্রেফতার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ হায়দার আলী বিগত মুজিব আমলে সিরাজগঞ্জে জার্মানী হিটলারের কায়দায় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প (কশাইখানা) বানিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সেখানে দেশ প্রেমিক বামপন্থী ও তাদের সমর্থকদের ধরে এনে নির্মম ও নৃশংস ভাবে খুন করেছে, যার সংখ্যা বিপুল। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার বা সামান্য প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নিরীহ জনগণের ছিল না। এই হায়দার আলী আরো কয়েকজন দুর্নীতি পরায়ন সহযোগী এখনো আইনকে ফাঁকি দিয়ে ঢাকা শহরে ও সিরাজগঞ্জে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে চার্লি ও আনোয়ার হোসেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।'
(গণশক্তি : ৬ ফেব্রুয়ারী ৭৭)

কামালপুরের ফজিলাতুন্নেসার মায়ের চিঠি

জনাব,

আমার ছেলে-মেয়ের মধ্যে অধ্যাপক লুৎফর রহমান সর্বকনিষ্ঠ। আমার পুত্র একজন দেশপ্রেমিক এবং রুশ-ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একজন নির্ভীক যোদ্ধা। ১৯৭১ সালে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমার ছেলে চাকুরী ও ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর সংগে ছিল এবং মুক্তিবাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর মুজিবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আমার ছেলে ছিল সোচ্চার। আমার ছেলে ছিল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে একজন সংগ্রামী ব্যক্তি। মুজিবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আমার ছেলে দেশের জনগণকে সচেতন করার কাজে নিয়োজিত ছিলো। এই অপরাধের (!) জন্য আমার ছেলের উপর

স্বৈরাচারী শাসনের খড়গ উত্থিত হয়। কুখ্যাত যুবলীগের সদস্যরা আমার ছেলের কয়েকজন সহযোগীকে হত্যা করলে আমার ছেলে কলেজের চাকরী ছেড়ে বাড়ী থেকে সরে পড়ে। স্বৈরাচারী শাসনের নির্যাতন এখানেই শেষ হয় না। এর পর আঘাত আসে আমার পরিবার ও সংসারের উপর। ১৯৭৩ সালের ১১ই জুন কুখ্যাত যুবলীগের সদস্যরা আমার বড়ছেলের স্ত্রী ফজিলাতুন নেছাকে গুলী করে হত্যা করে এবং তার কোলের দু'মাসের শিশু-সন্তানকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফজিলাতুন নেছা ছিল রুশ-ভারতের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী মহিলা। কুখ্যাত মুজিব বাহিনীরা এর পরও আমার ঘরটি ধ্বংস করে দেয়। আমার কাছে আশ্চর্য লাগে যে, যখন দেখি বর্তমান সরকারের আমলেও ঐ সমস্ত কুখ্যাত যুবলীগের সদস্যরা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করছে তখন আমার সংগ্রামী ছেলে কারগারে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে।

আমার ছেলে ১৯৭২ সালের ৬ই জানুয়ারীতে গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে ঘোরার পর দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে আটক আছে।

আমার পুত্রকে আমি দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ দেখি নাই। বর্তমানে আমি বার্ধক্যজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছি। মৃত্যুর শেষ কয়টি দিন আমার ছেলেকে আমি কাছে পেতে চাই।

আমার ছেলে বর্তমানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার ওজন প্রায় ২৫ পাউন্ড কমে গিয়েছে। আমার পায়ে infection হয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না। তাছাড়া সে বর্তমানে চোখের পীড়ায় অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। কারাগারের অভ্যন্তরে চোখের পীড়ায় কতখানি চিকিৎসা করা সম্ভব এ বিষয়ে আমি বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার ছেলে বর্তমান ঘরে ও বাইরে স্বাধীনতার শত্রুরা নতুন উদ্যমে অত্যন্ত তৎপর। রুশ-ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমার ছেলে পূর্বের ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এমতাবস্থায় আমার ছেলে সহ সকল দেশপ্রেমিক রাজ বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেবার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

নিবেদিকা—
ময়মন নেছা
গ্রাম—কামালপুর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

(গণশক্তি. ফেব্রুয়ারী—১৯৭৭)

সাতাত্তর সালে সি এম এল-এর কাছে কমলা সাহার চিঠি ঃ

মহাত্মন,

আমার স্বামী শ্রী মৃন্ময় সাহা (কালু). (পিতা মৃত অশ্বিনী কুমার সাহা, গ্রাম-হতালবুনিয়া, ডাকঘর—থানা বটিয়াঘাটা, জেলা–খুলনা এক-জন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রুশ-ভারত বিরোধী আন্দোলনের দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং রাজনৈতিক কর্মী। বটিয়াঘাটা থানার বিভিন্ন সমাজকল্যাণ-মূলক কাজের সাথে জড়িত থাকায় অত্র অঞ্চলের তথা খুলনা জেলার অধি-বাসীদের কাছে বিশেষ করে কৃষক সমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিতি।

পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন্ ন্যাপ-এর অংগ সংগঠন 'কৃষক সমিতি'র খুলনা জেলা শাখার সদস্য ও পরে বামপন্থী রাজনৈতিক লাইন (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল) অনুসরণ করে বিভন্ন এলা-কায় কৃষকের দাবীতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। কৃষক জনতার আন্দো-লনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও মুসলিম লীগের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালে গ্রেপ্তার করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তি পায়।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগের লুটেরা বাহিনী সারা দেশে স্বৈরতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলে। মুজিবশাহীর সময় যখন জনগণ

চরম শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে নিপতিত—কৃষক সমাজ যখন পদদলিত—সাধারণ মানুষ যখন ভাত-কাপড়ের সংস্থান থেকে বঞ্চিত তখন আমার স্বামী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের শত্রু রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অন্যদিকে রক্ষীবাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন সহ দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবক ও কৃষকের উপর হয়রানি ও নির্যাতন চরমে ওঠে। নরঘাতক বাকশালীরা বহু দেশপ্রেমিক কর্মী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের হত্যা ও তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যাবানোয়াট মামলা দায়ের করে এবং জীবনের উপর হুমকি দিতে শুরু করে। এ হেন হীন এবং জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমার স্বামী সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে সাবেক এম-পি, আওয়ামী-বাকশালী মনি- মোজাফফর চক্রের যোগসাজশে ২৮-২-৭৫ তারিখে আমার স্বামীকে বন্দী করে। প্রকাশ থাকে যে, থানার উপরই আমাদের বাড়ী, ও-সি নিজে এসে তাঁকে থানায় ডেকে নেয় এবং কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই জেল হাজতে পাঠানো হয়। পরে জানতে পারি জরুরী নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (কেস নং বটিয়াঘাটা থানা জি-ডি এনট্রি নং ৬০৭ তাং ২৮-২-৭৫ ধারা ৫৪ সি-আর-পি-সিও ১৪/৭৪ বিশেষ ক্ষমতা আইন)।

বন্দী হওয়ার কয়েক মাস পরে মুজিবশাহীর নরঘাতকরা খুলনা জেল হাজত থেকে ঢাকায় নিয়ে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে। দীর্ঘ দুই বছর কারারুদ্ধ থাকায় নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন দিন জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলছে ও মৃত্যুর দিন গুণছে। শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক। বর্তমানে দিনাজপুর জেল হাজতে আছে। সংসার পরিচালনার মত কেউ না থাকায় তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে দারুন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছি।

স্বৈরাচারী মুজিব শাসনের অবসানে আশা করেছিলাম মুজিব আমলের সাজানো মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে এবং রুশ-ভারত বিরোধী দেশ-

প্রেমিক রাজবন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য এবং মুক্তির জন্য সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে কয়েকবার আবেদন জানিয়েছি।

মাতৃভূমির জঘন্যতম ও হিংস্রতম শত্রু রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ও দেশের ভেতরকার দেশদ্রোহী জাতীয় বেঈমান মীরজাফরদের বিরুদ্ধে জনগণকে সুসংগঠিত করার এবং রুশ-ভারত আধিপত্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ও তাদের অঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য আমার স্বামীসহ সকল রুশ-ভারত বিরোধী দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমার স্বামীকে কারামুক্তির নির্দেশ দিয়ে আমার সংসারটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা হোক এবং জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক।

ইতি—

নিবেদিকা

মিসেস কমলা সাহা

গ্রাম—হেতালবুনিয়া

ডাকঘর, থানা—বটিয়াঘাটা

খুলনা।

(গণশক্তি : ১৫ ফাল্গুন—১৩৮৩ বাংলা)

'বিপ্লবীকর্মী মোতালিবের হত্যার বিচার চাই' শীর্ষক একটি চিঠিতে একজন লেখেন :

মহাত্মন,

পাবনার শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে প্রশ্ন মুজিব জল্লাদ বাহিনীর দুই প্রধান বকুল ও নাসিম কোথায়? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য (?) পুত্র নাসিম পাবনার হত্যাকান্ডের নীল নকশা প্রণয়নকারী ভারতের মেহমান হয়েছে।

অপর জল্লাদ বকুল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পাবনা হতে পালিয়ে শাহজাদপুর যায়। তার পর সে ভারতে অবস্থান করে। ভারতে অবস্থান-কালে জল্লাদ নাসিমের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বনিবনা না হয়ে নিজ সাগরেদ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছে।

এই জল্লাদ মুজিব আমলে কতশত দেশপ্রেমিককে হত্যা করেছে সে হিসাব করলে নাৎসী বাহিনী নায়কদের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

১৫ই মে, ১৯৭৫ সালে জল্লাদ বকুল রাজশাহীতে আসে একটা খোলা জীপ নিয়ে, সংগে থাকে তার কশাইরা—যথা রোজ ও সেলিম মুর্শেদ।

রাজশাহীর সোনাদীঘির মোড় হতে বেলা দশটায় বিপ্লবকর্মী মোতা-লিবকে জীপে তুলে নেয়। তখন এই খোলা জীপে বকুল, রোজ, সেলিম মোর্শেদ ও রাজশাহী মুজিববাদী গুণ্ডা কুদ্দুস ছিল। মোতালিবকে তারা খোলা জীপে তুলে নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মুজিব-বাদী দুলুর কেবিনে আটক রাখে।

মুজিববাদী গুণ্ডা কুদ্দুস কোচের ব্যবস্থা করতে যেয়ে কোচ না পেয়ে রহিম নাজিরকে চাপ দিয়ে ডি, সি, পুল হতে একটা জীপ নেয়। সে জীপে মোতালিবকে তুলে নেয় মাঝরাতে। এর মধ্যে মোতালিবের বড় ভাই জনাব আবেদ আলি এস, পি, কে ফোন করেন।

এস, পি, সাহেব অফিসে না থাকায় তিনি সার্কিট হাউসে অতিরিক্ত এস, পি-কে ফোন করে সব ঘটনা বলেন। কিন্তু মুজিববাদী অতিরিক্ত এস, পি, ঘটনায় আমল দেননি।

তিনি শেষ অবধি রক্ষীবাহিনীর নেতা ও জেলা প্রশাসকের কাছে যান।

জেলা প্রশাসক ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ দেন—নাটোর থানায় ফোন করা হয় যে, কোন জীপে এ ধরনের লোক গেলে আটক করা হয় যেন।

কিন্তু জল্লাদ বকুল তার দুই সঙ্গীকে রাজশাহীতে আসার আগে নাটোরে নামিয়ে দেয় সে নাটোর থানাকে হাত করবার জন্য। মাঝরাতে খোলাজীপে আকাশ বিদীর্ণ করতে করতে মোতালিবকে নিয়ে নাটোর এলে পুলিশ গাড়ী থামায় কিন্তু পুলিশ দেখেও ছেড়ে দেয়।

ডি, সি পুলের খোলা জীপ হতে মোতালিবকে চোখ বেঁধে জল্লাদ বকুলের জীপে তুলে দেয় নাটোর পার হয়ে। সংগে গিয়েছিল এলাটমারীর মুজিববাদী গুন্ডা সাত্তার ও ডি, সি, ফুড অফিসের হেডক্লার্কের স্বনামধন্য পুত্র মুজিববাদী গুন্ডা বাবলু। সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় ছিল রাজশাহীর মুজিববাদী ১ নং গুন্ডা কুদ্দুস যে তানোর বিপ্লবী কর্মী হত্যার মূল নায়ক।

মোতালিবের ভাই রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানায় একটা এজাহার করেন। বোয়ালিয়া থানার মামলা নং ২২ তাং ১৫-৫-৭৩ ধারা ৩৬৪ দন্ডবিধি। চার্জশীট হয়েছে। চার্জশীট নং ১৩০ তাং ২৭-১১-৭৩ আসামী রোজ জার্মানীতে চলে গেছে। রাজশাহী হতে পাবনায় ওয়ারেন্ট গেলে পাবনা শহরে থাকা কর্তৃপক্ষ কোন যাদুমন্ত্র বলে সে ওয়ারেন্ট কার্যকরী করেন নাই, কিভাবে একদল পলাতক আসামী জার্মানীতে চলে গেল ?

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর তাদের আসামী সেলিম মুর্শেদকে আটক করলেও পরবর্তীতে ছেড়া দেয়া হয়। মাঝে মাঝে সে পাবনায় আসে। এখনও। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও ছাড়া পেল কিভাবে জনগণের মনে প্রশ্ন জেগেছে ?

জল্লাদ বাহিনীর প্রধান বকুল ঢাকার মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও কল্যাণপুর এলাকায় বহাল তবিয়তে আছে। সংগে দুষ্কর্মের হোতারা রয়েছে।

এই জল্লাদ ১৯৭২ সালের মে মাসে অনুরূপভাবে বিপ্লবী নেতা টিপু বিশ্বাসের বড় ভাই গুলজার বিশ্বাসকে রাজশাহীর লক্ষীপুর হতে ধরে পাবনায় নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে।

পাবনার জনগণ এই জল্লাদ ও তার দলবলের বিচার চায়।

—আবু নাসের

(গণশক্তি : ২০ চৈত্র—১৩৮৩)

"দেশ প্রেমিক কর্মী হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই' শীর্ষক আরেকটি চিঠিকে লেখা হয়ঃ

জনাব,

১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে জনাব কদম রসুলকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে ফুটান মিয়া ওরফে আবুল কাশেম জোয়ার্দার ও হেকু ডাক্তার নির্মমভাবে হত্যা করার প্রমাণাদি ও চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশঃ উপরোক্ত তারিখে চুয়াডাঙ্গা শহরের আওয়ামী লীগ নেতা ফুটান মিয়া ওরফে আবুল কাশেম জোয়ার্দার, তদানীন্তন এম, পি,এ আশাবুল হক জোয়ার্দার ওরফে হেকু ডাক্তারের নির্দেশে তৎকালীন জীবন নগর থানার ও, সি, সিরাজুল হককে দিয়ে ধরে এনে এম, পি, এর জবর দখল করা সি, এন্ড, বি,র বাংলোতে আটক রেখে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দীর্ঘদিন পর কদম রসুলের অশিতপর বৃদ্ধ পাগলপ্রায় পিতা জনাব ডঃ লিয়াকত হোসেন একটি লিখিত দরখাস্ত মারফৎ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সায়েমের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করে, এহেন নারকীয় নরহত্যার সুবিচার প্রার্থনা করেন। দরখাস্ত প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট সাহেব কুষ্টিয়া জেলার এস, পি'র প্রতি এই হত্যাকান্ডের সত্তর তদন্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রেসিডেন্টের জরুরী নির্দেশ প্রাপ্তির পর এস. পি, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা পুলিশের সি, আই, সাহেবকে কথিত কদম রসুল হত্যার তদন্ত করার নির্দেশ দেন। এস, পি, কুষ্টিয়ার নির্দেশ ক্রমে চুয়াডাঙ্গার সি, আই সাহেব জীবন নগরে উপস্থিত হয়ে সরেজমীনে তদন্ত পূর্ব্ক-স্বাক্ষী প্রমাণ সহ থানা, জীবন নগর কেস নং ২ তাং ৮/৩/৭৭ জি, ডি, করেন, এবং সার্বিকভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত করে ও. সি, সিরাজুল হক, ফুটান জোয়ার্দার ও এম, পি, হেক ডাক্তারকে দোষী সাব্যস্ত করে চার্জশীট দাখিলের জন্য এস. পি. কুষ্টিয়ার নিকট গত ২৩/৩/৭৭ তারিখে হুকম চাহিয়া পাঠান।

—কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, তিনি এ পর্যন্ত এস, পির নিকট থেকে কোন হুকুম বা আদেশ নির্দেশ কিছুই পান নাই, ফলে কদম রসুলের বৃদ্ধ পিতা ও বিধবা স্ত্রী আসমা খাতুন ও দুই ছেলে ও এক মেয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছেন যে, অতিসত্তর কুষ্টিয়ার সামরিক আদালতের মাধ্যমে উক্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হোক।

ইহা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, বিচারকার্যের সুবিধার জন্য স্বাক্ষী প্রমাণাদি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। বিগত ৯/১১/৭৩ তারিখে জীবন নগরের ডাক্তার লিয়াকত হোসেন, চেয়ারম্যান সামসুজ্জোহা কদম রসুলকে একজন উচ্চশিক্ষিত সৎনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সামছু মিঞা আঃ ছাত্তার মুক্ত করার জন্য উক্ত থানার ও, সি সিরাজুল হককে কাতর অনুরোধ জানান। কিন্তু পাষাণ হৃদয় আওয়ামী লীগ সমর্থক ও, সি সে অনুরোধ তুচ্ছ সহকারে উপেক্ষা করে।

এর পর স্থানীয় আরো কয়েকজন সামান্য ব্যক্তিসহ নিহত কদম রসুলের পিতা থানায় গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করে পাষাণ হৃদয় ও, সি-র হাত থেকে পুত্রকে ছাড়িয়ে নিতে অসমর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

অতঃপর ও, সি, সিরাজুল হক কদম রছুলকে খুনী ফুটান জোয়ার্দারের হেফাজতে গাড়ীতে তুলে নেয়।

কদম রছুলকে গোপনে হত্যা করার জন্য ও, সি, তার থানায় কোন ডায়েরী লিখে রাখে নাই। তদন্তকালে উক্ত ও, সি, সিরাজুল হক তার জবানবন্দীতে বলে যে, ঐ তারিখে এম, পি, হেকু ডাক্তার আমাকে তার জবর দখল করা, সি, এণ্ড, বি,র ডাক বাংলায় ডেকে পাঠালে, আমি সেখানে গিয়ে এম, পি, এর সাথে ফুটানকে দেখতে পাই, এম, পি, এ, কদম রছুলকে বাড়ী থেকে ধরে এনে ফুটান মিয়ার হেফাজতে রক্ষীবাহিনীর গাড়ীতে করে তার ডাকবাংলোয় পাঠাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়।

আমি ঐ তারিখে বেলা ৩ টার সময় এম, পি, এ,র বাংলো থেকে ফুটান মিয়ার অধিনস্থ একদল রক্ষীবাহিনীর সাথে তাদের ট্রাকে করে থানায় আসি।

এবং কদম রছুলকে ডেকে এনে থানায় আটক রাখি। ফটানের আদেশমত আমি কদম রছুলকে রাত্রিবেলা তার হেফাজতে রক্ষীদের গাড়ীতে তুলে দিই।

ফটান মিয়ার বক্তব্য ঃ

৯/১১/৭৩ তারিখে আমি এম, পি, এ,র ডাক বাংলোয় বসে থাকাকালে জীবননগর থানার ও, সি, সিরাজুল হক এম, পি, এ'র ডাক বাংলোয় এসে জানায় যে, ভাসানী ন্যাপের এক উচ্চ শিক্ষিত (বি, এ, পাশ) নেতাকে ধরে এনে থানায় আটক রেখে এসেছি। এখন কি করতে হবে তার জন্য আপনার নির্দেশ চাই। এম, পি, এ, ততক্ষনাৎ রক্ষীবাহিনীর গাড়ীতে উক্ত ও, সি সিরাজুল হকের সাথে গিয়ে নিহত কদম রছুলকে তার সামনে হাজির করার জন্য আমাকে প্রেরণ করে। আমি তার আদেশ মত সিরাজুল হকের সাথে গিয়ে, রাত্রিকালে রক্ষীবাহিনীর গাড়ীতে করে কদম রছুলকে নিয়ে এসে এম, পি, এ. সাহেবের সরকারী (সি, এন্ড, বি,)র ডাক বাংলায় হাজির করে দিই। এরপর ফটান মিয়া তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের কাছে আর কি বলেছে তা জানা যাইনি। তবে মামলাটি দায়েরা হলে, কোর্ট অফিস থেকে উভয়ের জবানবন্দীর নকল তুলে, আসামীদের স্বীকারোক্তি বা জবানবন্দীর হুবহু বিষয়বস্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকা মারফৎ দেশবাসীকে এবং সদাশয় সরকারকে অবহিত করার জন্য যথারীতি প্রকাশ করা হবে।

এখন নিহত কদম রছুলের অশিতপর বৃদ্ধ পিতা, তার বিধবা স্ত্রী আসমা খাতুন ও শান্তিপ্রিয় সম্পূর্ণ এলাকাবাসী জনগণের একমাত্র জিজ্ঞাসা যে এহেন জঘন্য নারকীয় নর হত্যার বিচার করার ক্ষমতা কি সামরিক সরকারের আছে ? যদি থাকে; তবে অতি সত্ত্বর নিহত কদম রছুলের শোকাহুত বিদগ্ধ পিতা ও নিঃসহায় সম্মানিতা কুল বধুর চোখের পানি আর সরকারের কাছে সুবিচারের জন্য আকুল আবেদন এবং ফরিয়াদ কি বৃথা যাবে ?

প্রকাশ থাকে যে, ৭১-এর যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃদ্ধ ডাক্তার লিয়াকত হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্রকে পাকবাহিনীর লোকেরা হত্যা করে। দুটি মাত্র পুত্র সন্তানকে এ ভাবে হারিয়ে পাগল প্রায় শোকার্ত পিতা কিভাবে বেঁচে আছেন, তা দেশবাসী সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন অতিসত্ত্বর এই হত্যাকাণ্ডের নায়কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে জনগণের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে প্রার্থনা করা হয়।

নিবেদক ঃ

জীবন নগর থানার জনগণ

গণশক্তি, ২৫ শে আষাঢ়, ১৩৮৪

নিহতদের কিয়দংশের একটি তালিকা

আবু জাফর মোস্তফা সাদেক তাঁর 'বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে কমরেড সিরাজ সিকদার' গ্রন্থে রক্ষীবাহিনী, মুজিববাদী ও আওয়ামীলীগারদের হাতে নিহত কিছু অংশের একটি ছোট তালিকা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি যাদের কথা জানতে পেরেছেন তাদের কথাই লিখেছেন। তাছাড়া তিনি তৎকালীন কয়েকটি গোপন সংগঠনের নিহত কর্মীদের সম্পর্কে লিখেছেন। জাসদ ও ভাসানী ন্যাপসহ অন্যান্য আওয়ামীলীগ বিরোধী সংগঠনের নিহতদের নাম এই তালিকায় নেই। আমি তার সংগৃহীত নামগুলো তুলে ধরছি। তার তালিকায় আমার সংগৃহীত কিছু নামও রয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) ঃ

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় মুজিববাদীদের হাতে শহীদ হন ঃ ১। পাকুড়িয়া গ্রামের মন্টু, ২। শাহাপুরের আনছার, ৩। আবদুল করিম, ৪। আবদুল মান্নান, ৫। ভোলা, ৬। আসহাব, ৭। মজিবর রহমান (মেজবর), ৮। মানিক নগরের আফতাব, ৯। আবদুল ১০। মোসলেম, ১১। শাহাপুরের ননী সরদার, ১২। জছিম উদ্দিন সরদারের দুই ছেলে—মন্টু, ও ১৩। আবদুল গাফফার, ১৪। রক্ষী বাহিনীর হাতে—দলিল (পাখী), ১৫। ছাত্রনেতা আংকুর রহমান চুনু (তারা,) ১৬। আফছার (ফেলু) ১৭। মুজিববাদীদের হাতে—ঈশ্বরদীর আবদুস সাত্তার ১৮। লাভলু, ১৯। পাবনার ছাত্রনেতা ওসমান, ২০। ওহিদ হাসান হিল্লোল,

২১। ছাত্রনেতা সামছুর রহমান, ২২। ছাত্রনেতা আজিজুল হক (পাগলা), ২৩। মন্তাজের রহমান, ২৪। রিপু বিশ্বাস, ২৫। তালিশ, ২৬। দাপুনিয়ার প্রামানিক সাহেব ও তাঁর ছেলে, ২৭। আবদুল গাফফার ও তাঁর স্ত্রী, ২৮। লুলু বিশ্বাস সহ আরও তিনজন, ২৯। কমরেড জমসেদের বৃদ্ধা মাতা (জমশেদ পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন) ৩০। কাশীনাথপুরের কৃষক নেতা আব্দুর রহমান, ৩১। ছাত্র কর্মী আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ৩২। কৃষক কর্মী রতন, ৩৩। শাহাজাদপুরের আলাউদ্দিন, ৩৪। সিরাজ গঞ্জের বিখ্যাত নেতা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুনিরুজ্জান তারা, ৩৫। গাড়াদহে আব্দুল হামিদ সহ ৩২ জন ৩৬। রক্ষীবাহিনীর হাতে—শৈলজানার ডাক্তার আব্দুল গাফফার (ঘটু) [ইনি কমরেড মতিনের আপন ছোট ভাই। [তাঁদের পিতাকে রাজাকার এবং অপর ছোট ভাই পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন] ৩৭। আব্দুস সামাদ, ৩৮। চাটমোহরে আব্দুল হামিদ, ৩৯। কুষ্টিয়ার শহীদ (রঞ্জন) ৪০। মুজিববাদীদের হাতে—বাবুলচারা গ্রামের কমরেড আশরাফের ছোট ভাই (কমরেড আশরাফ (মামু), কৃষক নেতা সাবের আলী সহ ১৬ জন পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হন] ৪১। শাহপুরের শহীদুল, ৪২। কুষ্টিয়ার কামালপুরের ফজিলাতুন্নেসা [ইনি ছিলেন ঈশ্বদীর নেতা কমরেড ফজলুর রহমান মোল্লা (জামাতে ইসলামীদের হাতে শহীদ-এর বোন এবং আত্রাই-এর নেতা এমরেড ওহিদুর রহমানের শাশুড়ী। ৪৩। চুয়াডাঙ্গার মহাম্মদ আলী, ৪৪। কৃষকনেতা, কবি ও গায়ক আবতাব আলী ৪৫। মহির উদ্দিন ও তার ভাই, ৪৬। কুষ্টিয়ার জীবন নগরের কদম, ৪৭। ঢাকার এনায়েত, ৪৮। দামুকদিয়ার ইয়াদ আলী (শিক্ষক), ৪৯। ইনসার আলী, এবং ৫০। নোয়াখালী নিবাসী, আত্রাই কলেজের অধ্যাপক বাদল দত্ত (কামাল) এবাদং, রাবিয়া বেগম বেলী, ফজলু সহ আরও ৫ জন।

মুজিববাদীদের হাতে পাবনা জেলার অপর যে সব নেতা কর্মী ও সমর্থক শহীদ হয়েছেন তাহা নিম্নরূপ ঃ—৫১। শালগাড়িয়ার—হেনা ৫২। আলতু, ৫৩। লাটু, ৫৪। রানু, ৫৫। হেলাল, ৫৬। আকমল, ৫৭। রশিদ,

নিহত আবসার উদ্দিনের ভাই সামসুদ্দিন
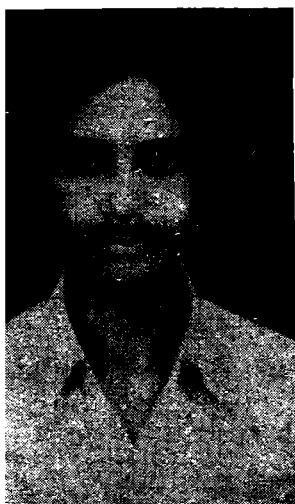
নিহত রাবেয়ার ভাই
আনোয়ারুল হক বাবলু
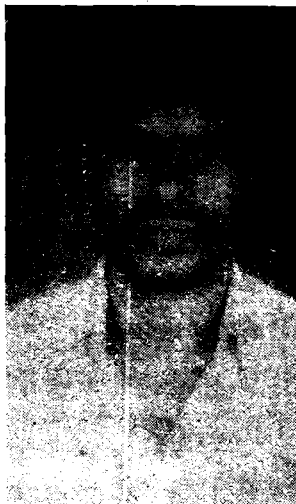
নির্যাতিত ফজলুর রহমান

৫৮। আজাদ; ৫৯। পুষ্পপাড়ার মজনু ৬০। হানিফ; ৬১। সাধু পাড়ার—রানু (কুন্দুস) ৬২। বদন কাজী ৬৩। মহসীন আলী ৬৪। ফিরোজ ৬৫। তানু ৬৬। চুনু ৬৭। চেতন ৬৮। মাখন ৬৯। ছিদু ৭০। বানু ৭১। গেদা ৭২। খেরু ৭৩। ছাত্তার ৭৪। রাধা নগরের—বিলাত ৭৫। মতিন ৭৬। মোসলেম ৭৭। মালেক ৭৮। মোজাম্মেল ৭৯। বুড়ো ৮০। খসরু ৮১। বদো ৮২। বাবু ৮৩। কাঞ্চন ৮৪। সদু ৮৫। রুসনা ৮৬। ফরহাদ ফোরা ৮৭। আবেদ ৮৮। আমিরুল ৮৯। আবু ৯০। নুরপুরের--আনোয়ার ৯১। জেলাপাড়ার—চাঁদ ৯২। সিরাজ শেখ ৯৩। আফতাব ৯৪। বাচ্চু ৯৫। আকুববর ৯৬। মনছের ৯৭। আনছা ৯৮। বদর ৯৯। মানিকদিয়াড় চরে–মকবুল হোসেন ১০০। লুলু বিশ্বাস ১০১। পিনু বিশ্বাস ১০২। বেলাল বিশ্বাস ১০৩। রায়হান খাঁন ১০৪। মোজাম্মেল খান ১০৫। আফজাল খাঁন ১০৬। লতিফ ১০৭। সোনা প্রাং ১০৮। আবুল প্রাং ১০৯। সামু মালিতা ১১০। আবদুল প্রাং ১১১। রিয়াজউদ্দিন প্রাং ১১২। ইয়াজ উদ্দিন ১১৩। কেরামত প্রাং ১১৪। লাটু প্রাং ১১৫। বারু প্রাং ১১৬। চাঁদ প্রাং ১১৭। আটিয়ার নওসের খাঁন ১১৮। আজাহার খাঁন ১১৯। শাবান ১২০। বান্ডা-বাড়িয়ার মোহন মোহন মন্ডল ১২১। বাঘবপুরের জলিল ১২২। বিশু ১২৩। দাপুনিয়া—শ্রীপুরের মহসীন ১২৪। চয়েন ১২৫। ভাদু ১২৬। ইসহাক ১২৭। আফতাব ১২৮। আয়েজ বেপারী ১২৯। নজরুল ১৩০। দেলোয়ার ১৩১। মনসুর ১৩২। মজিদ ১৩৩। দুরান ১৩৪। গোপালপুরে মোতালেব ১৩৫। কামু ১৩৬। হামিদ ১৩৭। আজু ১৩৮। ইমু ১৩৯। তপন প্রমুখ।

এছাড়া রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনার ৩৩টি থানায় এ পার্টি'র কয়েকশত কর্মী সমর্থক মুজিববাদী সশস্ত্রবাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মোঃ লেঃ):

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানায় মুজিববাদী সশস্ত্র গুন্ডারা এপার্টি' [তৎকালিন ই, পি, সি, পি (এম এল)]--এর সাত-

জন কর্মীকে হত্যা করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই বাহিনীর হাতে নবাবগঞ্জ থানার সোল্লা গ্রামের ১। বাদশা ২। আন্দার কোটার আবদুর রশীদ (অনি) ৩। সিঙ্গাইর উদিয়মান কবি আবদুল গফুর (বিক্রমাদিত্য) ১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর লৌহজং থানার ৪। হুমায়ুন কবীর (বাদল) ৫। ২৫শে ডিসেম্বর শওকত হোসেন (লিটন)। এ ছাড়াও ঢাকা জেলার ঢাকা জেলার ঢাকা সদর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, ডেমরা, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ দোহার, মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর, শ্রীনগর, শ্রীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েক শত পার্টি সভ্য ও কর্মীশহীদ হয়েছেন মুজিবের রক্ষীবাহিনীর হাতে (সবার নামসংগ্রহ করা গেল না)।

১৯৭১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের নাপোড়া পাহার গ্রামে এই পার্টির নিজস্ব বাহিনীকে মুজিব বাহিনী বন্ধুত্বের ভান করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায় এবং ঘুমান্ত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। এই শহীদ কমরেডদের নাম—১। আঞ্চলিক নেতা প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য ২। কমান্ডার জাহেদ (ছালে আহমদ) ৩। কৃষক নেতা আবু ছাদেক ৪। ডাক্তার তুহীন (কুষ্টিয়া) ৫। এম, এ, মোস্তফা চৌধুরী ৬। আমানত খান চৌধুরী ৭। মামুন ৮। হাবিলদার রুস্তম ৯। আসাদুল্লাহ ১০। বজল আহমদ ১১। নুরুল ইসলাম ১২। আবুল হাসেম ১৩। কালুমিয়া ১৪। শের আলী এবং ১৫। বিপ্লবী ছাত্র—কবি দবরুদ্দুজা।

১৯৭৩ সালে রক্ষী বাহিনী বন্দী অবস্থায় হত্যা করে—সিলেটের কমরেড আবদুর রহমানকে।

১৯৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তানোরে রাজশাহী শাখার বিশিষ্ট নেতা কমঃ মাহমুদুর রহমান উজ্জল রক্ষী বাহিনীর হাতে শহীদ হন। ডিসেম্বরে রাজশাহীর তানোরে, রুশ-ভারতের পুতুল ও রক্ষী বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ১৮ জন কমরেড ধরা পড়েন। বন্দী (হাত বাধা) অবস্থায় তানোর থানার গোল্লাপাড়ায়

১১ই ডিসেম্বর এই পার্টি নেতা-কর্মীদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একই দিনে মান্দা থানায় হুদয় পুকুর পাড়ের বারেন্দ্র ভূমিতে আরও ২৬ জন বন্দী কর্মীকে হত্যা করা হয়। এই কমরেডদের স্মরণে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল মোঃ লেঃ এখনও ১১ই ডিসেম্বরকে পার্টিতে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করে। এই শহীদ কমরেডররা হলেন—এরাদ আলী, ২। এমদাদুল হক বাবু (মন্টু মাষ্টার,) ৩। ওয়ায়েজ, ৪। আঃ জববার, ৫। মনি, ৬। শামসুদ্দিন, ৭। হারুন, ৮। ওমর, ৯। মজিবর ১০। আঃ রশীদ ১১। ঈসহাক ১২। আজাক ১৩। মনসুর ১৪। মজিবর ১৫। তৈয়ব ১৬। আমির (মধু) ১৭। আলাউদ্দিন ১৮। হযরত ১৯। আজাহার ২০। মহির উদ্দিন ২১। ছলেমান ২২। আলা উদ্দীন ২৩। এক্রাম উদ্দিন ২৪। মোজাফফর ২৫। আনসার ২৬। মজিদ ২৭। রিয়াজ ২৮। আবহার ২৯। খোকা মন্ডল ৩০। আহাদ ৩১। তৈয়ব আলী ৩২। রবু ৩৩। নাজিম ৩৪। এরাজ ৩৫। আমির ৩৬। আছের ৩৭। নিন্দা ফকির ৩৮। কুদ্দুছ ৩৯। রশিদ ৪০। শফি ৪১। আব্দুল ৪২। নজরুল ৪৩। সিদ্দিক ৪৪। সৈয়দ আলী (সিরাজুল)।

১৯৭৩ সালের ২৪শে এপ্রিল, ময়মনসিংহ জেলার বাজিত পুর-পাকুন্দিয়া ও নিলকীতে রক্ষী বাহিনীর হাতে শহীদ হন ১। কমরেড আতাউর রহমান। ১৯৭৪ সালের ২০শে এপ্রিল শহীদ হন ২। কমরেড মজিবর রহমান ৩। হাবিবুর রহমান ৪। ফারুক ৫। মাহবুব এবং মুজিববাদীদের হাতে শহীদ হন—৬। শামছুল আলম ৭। রশিদ ৮। আমিনা, ৯। আনোয়ার ১০। সালাম ১১। মনু মিয়া ১২। খলিলুর রহমান ১৩। আবদুল মান্নান ১৪। নারায়ণ ১৫। নুরু ১৬। লতিফ ১৭। বাতেন ১৮। আলমসহ অত্র অঞ্চলের প্রায় দেড় শত পার্টি কর্মী ও সমর্থক।

নোয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চল প্রগতিশীলদের প্রভাবিত এলাকা হিসাবে সুপরিচিত। এই এলাকায় পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা কমরেড মোহাম্মদ

তোয়াহা স্ব-শরীরে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বে দিয়ে ইয়াহিয়ার বাহিনী ও তাদের সহকারী আলবদর ও রাজাকার বাহিনীকে চরম মার দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে রুশ—ভারতের পুতুল সরকার কমিউনিস্টদের ভয়ে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই অঞ্চলে—বিশেষ করে নোয়াখালী সদর, রামগতি ও লক্ষীপুর থানায় ১৯টি রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প বসিয়ে, ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বে 'কমিউনিষ্ট হত্যার' এক নীল নক্সা তৈরী করে। এই ১৯টি ক্যাম্পের প্রায় তিন হাজার রক্ষী ও মুজিববাহিনী (হেলিকাপ্টারের সাহায্যে) ১৩ই ডিসেম্বরে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এই মাসে ৯০ জন রমনীকে ধর্ষণ ও হত্যার মাধ্যমে শুরু হয় এক নৃশংস অত্যাচারের করুণ ইতিহাস। এই এলাকায় যে কয়েকজন শহীদ কমরেডের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাঁরা হলেনঃ—১। রামগতির তোরাবগঞ্জের কমরেড নুরেজ্জামান ২। লক্ষীপুরের সমাসপুর গ্রামের আলম (রতন), ৩। গন্ধব্যপুরের খোকন বি, এস, সি, ৪। ধর্মপুরের কালু নাপিত, ৫। হাজির হাটের আবুল হালিম, ৬। ফেনী কলেজের ছাত্র নাসের ৭। রায়পুরের আয়াত উল্যা সহ অনেকে। মুজিববাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন—৮। রামগতির চর লরেঞ্জের নেতৃস্থানীয় কমরেড ফয়েজ ৯। সদর থানার লালপুরের বাবর, ১০। বাঁধের হাটের সোলেমান ১১। লক্ষীপুর থানার পেয়েরা পুরের বজু সহ নাম নাজানা শতাধিক কমরেড।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) ঃ

[বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল)]

যশোর জেলা ঃ ১৯৭২ সালে—১। নাহিদ, ২। ভোলা (রক্ষীবাহিনীর হাতে); ১। ১৯৭৩ সালে—১। নুরুল হক, ২। মানিক ভাই (রক্ষী বাহিনীর হাতে); ১। মধু খালীর শাহাবুদ্দিন, ২। আঃ সালাম, ৩। খয়ের ৪। আজিম ৫। আয়ুব ৬। জব্বার ৭। জামাত আলী ৮। নজরুল (নাণ্টু), (৯) সাত্তার ১০। ইনছার ১১। রুন্দী ১২। হানেফ ১৩। খালেক

১৪। বাবর আলী ১৫। আফসার ১৬। রইছ ১৭। ওয়াজেদ ১৮। ধীরেন ১৯। নন্দলাল ২০। শমসের ২১। আক্কাচ ২২। খালেক, ২৩। কালিগঞ্জ থানার দোগাছি গ্রামের হাসেম আলী ২৪। পাঁকা গায়ের সভামিয়া ২৫। কিসমত গাড়িয়ালের আবদুল খালেক ২৬। মুরাদ আলী ২৭। মমতাজ ২৮। বারেক আলী ২৯। ছোবহান আলী ৩০। মনিরুল ইসলাম, ৩১। যাত্রা পুরের আতিয়ার রহমান খোকন ৩২। মন্টু ৩৩। শহীদ ৩৪। মজিদ ৩৫। কাওসার ৩৬। জামাত আলী ৩৭। জলিল ৩৮। সফি ৩৯ নুর আলী ৪০। আলতাফ ৪১ তসিম ৪২। বদর ৪৩। জাহাঙ্গীর ৪৪। আজিজ ৪৫। মতিয়ার, ৪৬। কোটচাঁদপুরের কামরুজ্জামান।

১৯৭৪ সালে—৪৭ পুরাতন কসবার আবুবকর জাফরোদৌলা দিপু (গোরা), ৪৮। কালীগঞ্জ থানার পাইকপাড়ার ওয়াহেদ আলী (রহমান) ৪৯। ঝিনেদা থানার চোরকোলের মহিউদ্দিন (শওকত) ৫০। নরসিংপুরের কামরুজ্জামান (রাজু) ৫১। নুরমোহাম্মদ (বাবু) ৫২। অভয়নগর থানার কান ফুলের আবুল হাসান (জসীম), ৫৩। কোটচাঁদপুর থানার গজরাপুরের হায়দার আলী (গাজী); ৫৪। কালী গঞ্জ থানার কাবিলপুরের রাশিদা খাতুন (ঝর্ণা) ৫৫। তিজারত তাজুল।

১৯৭৫ সালে—৫৬। কোটচাঁদপুর থানার তাল্লের শুকুর আলী. ৫৭। কালীগঞ্জ থানার বেথলীর আকবর (আলা), ৫৮। ভাটাডাঙ্গার বজলু, ৫৯। চিত্ত ৬০। দোগাছির ইনছাব আলী।

কুষ্টিয়া জেলা :—১৯৭২ সালে ১। এডভোকেট বদরুদ্দোজা, ১৯৭৩ সালে—২। লিয়াকত আলী, ৩। শাহ আবদুলহামিদ, ৪। শাহাজাহান. ৫। আবুল কাশেম, ৬। ফজলুল হক ৭। আঃ সাত্তার ৮। নুর হোসেন, ৯। সিরাজুল ইসলাম, ১০। মন্টু, ১১। নবীন।

১৯৭৪ সালে ১২। আবেদ আলী ১৩। খয়বার আলী ১৪। আমানউল্লাহ পল্টু ১৫। রজব আলী ১৬। আবদুর রহমান ১৭। সামছুল ১৮। ভিকু ১৯। মোকলেছ ২০। কাবের ২১। রশিদ ২২। ইসমাইল ২৩। জামাল ২৪। আনার ২৫। এলাহী।

১৯৭৫ সালে—২৬। শামছুল আলম ২৭। বোরহানুল কবির ২৮। মোশারফ হোসেন ২৯। মোঃ শরফি ৩০। আঃ সালাম ৩১। হায়দার আলী ৩২ ইসরাফিল ৩৩। উকিল উদ্দিন ৩৪। পলান। ৩৫। আঃ ছাত্তার ৩৬। জহিরুদ্দিন ৩৮। শমশের আলী।

খুলনা জেলা :—১৯৭৩ সালে ১। শান্তি ব্যানার্জী (রক্ষী বাহিনীর হাতে)। ১৯৭৪ সালে ২। মুজিববাদী গুন্ডাদের হাতে-ননী গোপাল হাওলাদার (নরেশ) এবং ৩। রক্ষী বাহিনীর হাতে—আবদুল ওহাব ৪। রনজিত কুমার মালাকার ৫। হরি মুহুরী ৬। শম্ভু।

ফরিদপুর জেলা :—১৯৭৩ সালে—১। জামাল বিশ্বাস। ১৯৭৪ সালে ২। আতাহার হোসেন, ৩। আতা (মতি) ৪। মনি (জহুর) ৫। পাংশা থানার আবদুল আলী (মাসুম) ৬। কামার্লী তালুকদার (ইদ্রিস), ৬। আনোয়ার হোসেন রতন (মানিক) ৭। আজমল ৮। জয়নাল সর্দার (বশীর) ৯। আবু (আসাদ) ১০। মজিদ; ১১। রাজ বাড়ী থানার আমিনুল ইসলাম (ফিরোজ) ১২। ছিদ্দিক মোঃ সোলাইমান ছোলাই (ছোহরাব)।

১৯৭৫ সালে—(১৪) পাংশা থানার আতিকুর রহমান তারু (কাদের মিয়া) ১৫। আবদুর রাজ্জাক রাজা (তাহের) ১৬। তোফাজ্জেল হোসেন (মামুন) ১৭। হানিফ (কলিম) ১৮। রিজিয়া বেগম (রাহী) ১৯। রাদ বিবি (হেনা) ২০। খায়রুল ইসলাম (স্বপন)। ইহা ছাড়া ২১ জন পার্টি দরদী শহীদ হন।

রংপুর জেলা :—১৯৭২ সালে রক্ষী বাহিনীর হাতে ১। নাহিদ ২। ভোলা। ১৯৭৩ সালে ৩। নুরুল হক ৪। মানিক ভাই।

ময়মনসিংহ জেলা :—১৯৭৫ সালে রক্ষী বাহিনীর হাতে কমরেড আনোয়ার (পাকুন্দিয়া)।

ঢাকা জেলা :—১৯৭৫ সালে রক্ষী বাহিনীর হাতে কমরেড আবদুল মান্নান (কাওরাইদ)।
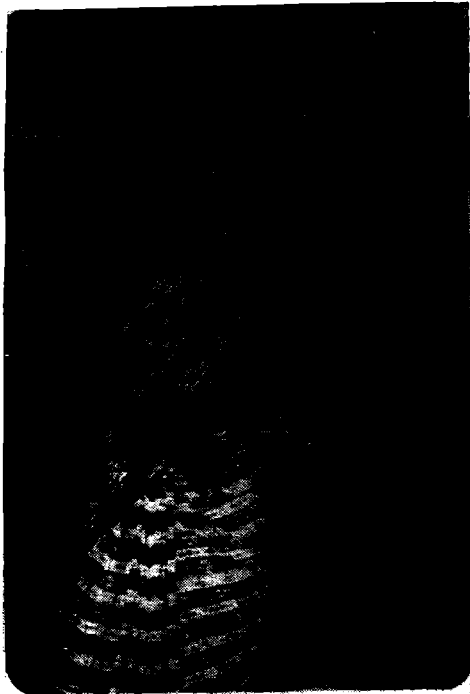
মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সোনালী সিনহা

সর্বহারা পার্টি

১৯৭৩ সাল ঃ

ময়মনসিংহ জেলা ঃ ১। কেদুয়ার নুরুল আমিন ২। ঈশ্বরগঞ্জের নাসির ৩। মতিন ঢাকা জেলা। ৪। কমঃ সাঈদ

ফরিদপুর জেলা—। কালকিনীর আনোয়ার পাশা (আবুল) ৬। জাজিরার জাহেদ আলী সরদার ৭। আজিজুল হক ৮। খালেক ৯। মুনির (আতিক) ১০। মাদারী পুরের মাখন ১১। কোতোয়ালীর খসরু ১২। কালকিনির হিরণ ১৩। পালং এর সামাদ (শহীদ)। ঢাকা জেলা—১৪। লরেন্স ১৫। রফিক ১৬। মনোহর্দীর ফজলু।

১৯৭৫ সাল ঃ

ময়মনসিংহ জেলা—১৭। ইশ্বরগঞ্জের উজ্জল ১৮। ত্রিশালের প্রবীর ১৯। খোকা (মঞ্জ) ২০। শামসু (আলম) ২১ মাহবুব ২২। সুতিয়াখালীর বাঘা। বরিশাল জেলা—২৩। কোতোয়ালীর মতিলাল বড়াই (মনোজ) ২৪। ভোলার গাজী ২৫। বাবুগঞ্জের সত্য। ফরিদপুর জেলা—২৬। মাদারী পুরের আবুল কালাম ২৭। আজাদ ২৮। পালং এর সেকেন্দার হাওলাদার (শহীদ) এবং ২৯। বগুড়াজেলার সালাম।

উল্লেখিত কমরেডগণ প্রায় সবাই রক্ষী বাহিনীর হাতে হহীদ হন। এছাড়া ঢাকা জেলার সাভারে হত্যা যজ্ঞে রক্ষী বাহিনীর হাতে শহীদ হন—ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে (বিপ্লবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য) আগত কমরেড তাহের; বরিশালের মনি দা, সাঈম ও খোকন। অন্যত্র শহীদ হন—কুষ্টিয়ার পলাশ, জিল্লু, পিন্টু এবং ঢাকার চুন্নু।

সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ব্যাপকহারে প্রাণ দিয়েছিল—ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়। এখানে রক্ষী বাহিনীর বর্ষাকালীন অভিযানে গ্রামের পর গ্রামের যুবকদের পাইকারী হত্যায় পার্টি কর্মীরাও জীবন দেয়।

প্রকাশ থাকে যে এখানে রক্ষী বাহিনীর লিডার সহ বেশ কিছু রক্ষী পার্টি'র গেরিলাদের হাতে নিহত হয়। তবে সর্বহারা পার্টিতে কঠোর বিপ্লবী শৃংখলা থাকাতে ব্যাপকহারে সাধারণত গেরিলা সদস্যরা মারা পড়েনি। বরিশাল, কুমিল্লা ও মুন্সিগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় শহীদ কমরেডদের মৃত্যু তালিকা সংগ্রহ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।'

(বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে কমরেড সিরাজ সিকদার: আবু জাফর মোস্তফা সাদেক: পৃষ্ঠা: ৮৭—৯১)

তিনটি চিঠি

আওয়ামীলীগের পতনের পর কমরেড সিরাজ সিকদারের পিতা ও বোন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুজিব আমলে শহীদদের নাম ঠিকানা পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। বেশ কিছু চিঠি শহীদদের আত্মীয়রা পাঠিয়েছিলেন। আমি এখানে তিনটি চিঠি তুলে ধরছি তাদের বানানরীতি সহ।

মাননীয়
(সম্পাদক) সিকদার সাহেব।
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঢাকা-২।

মহাশয়,

আমাদের আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছা জানবেন। আশা করি আমাদের মংগল কামনা থাকবে। আপনারা দৈনিক ইত্তেফাকে বাকশালীদের হাতে নিহত ব্যক্তিদের নাম চেয়েছেন। আমার আজও সেই কথা ও দৃশ্য দেখতে বা লেখতে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। আমার একমাত্র খালাতো ভাই মরহুম মঞ্জু মিয়াকে ওরা এসে ধরে সিরাজগঞ্জ বাকশালী ক্যাম্পে নিয়ে নিশি রাত্রিতে বাকশালী নেতা আনোয়ার হোসেনের (রতু) নির্দেশে নির্মমভাবে কালিবাড়ীর নিকট ওয়াপদার ব্যারেকে রাস্তার উপর আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা খুবই কষ্ট দিয়ে হত্যা করাহয়। তখন তিনি রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে পি, টি, আই এ ছিলেন এমন দৃশ্য পরদিন দেখে ও শুনে নিজেকে কোনমতে সামলিয়ে চলে

এলাম। লাশটা এনে মাটি দেওয়ার ভাগ্যও হলো না। আর বেশী লেখতে ইচ্ছে হয় না।

ইতি

আপনাদের ছোট ভাই

মোঃ সামছুল হক মণ্ডল

সাং হালুয়া কান্দি

পোষ্ট বৈদ্যজাম তৈল, পাবনা

মাননীয়া,

মিসেস শামীম শিকদার

সম্পাদিকা 'দুর্বার'

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট

২নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ

ঢাকা—২

মহাশয়া,

১৪-৫-১৯৭৮ ইং দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদ পত্রে আপনার দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিতে পারিলাম বিগত বাকশালী শাসন আমলে যারা নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন তাদের নাম ঠিকানা আপনাদের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক জানানোর জন্য। আমি অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত স্বৈরাচারী শেখ মুজিব ক্ষমতা থাকাকালিন তাহার পুত্র শেখ কামাল ও তাহার সহকচারীরা আমার পুত্র মোহাং দেলয়ার হোসেন (মণ্টু)'কে ১৯৭৩ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর শামছুন নাহার ও জগন্নাথ হলের মাঝে ও তাহার অন্য ৩ (তিন) বন্ধুকে গুলি করে হত্যা করে। বর্তমান সরকারের ১নং সামরিক আদালতে case দেওয়া হয় এর পরিপেক্ষিতে Court উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রদান করেন। অন্যান্যরা পলাতক।

অতএব, মহাশয়া আমাদের আকুল নিবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেন শহীদের কবরটি শাহজাহানপুরে এখনও অযত্নহীনভাবে আছে। মহাশয়া শহীদের কবরটি বাঁধাই ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করিলে মহাশয়ার আজ্ঞা হউন।—

ইতি—

বিনীত নিবেদিকা

মিসেস আয়েনা বেগম

৪৮৯/c খিলগাঁও

ঢাকা—১৪

কিশোরগঞ্জ হইতে

১৬-৫-১৯৭৮ ইং

পত্রের শুরুতেই রহিল আমার সংগ্রামী অভিনন্দন। পত্রিকায় দেখতে পেলাম ১৯৭১ সনে স্বৈরাচারী মুজিব সরকার যে সব দেশপ্রেমিক মুক্তি-যুদ্ধাদের হত্যা করে ছিল তাদের পরিবারকে আপনারা সাহায্য করবেন বলে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাই আমি একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর কাহিনী আপনাদেরকে শুনাচ্ছি।

মোঃ শাহ্জাহান গ্রাম ঃ করগাঁও. থানা কটিয়াদি জিলা-ময়মনসিংহ। সে আমার বন্ধু ছিল। মুজিব সরকার যখন দেশে এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং বাংলাদেশের সম্পদ ভারতে বেপকভাবে পাচার করতে ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভারত সরকারের হাতে বিকিয়ে দিয়েছিল তখন আমরা যারা শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে-ছিলাম এবং জনগণের কাছে যখন আমরা মুজিব সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেছিলাম তখন আমার বন্ধু শাহজাহান আমাদের এলাকাতে এসেছিল তখন ইটনা থানার অন্তরগত জয়সিদ্দি গ্রামের কুক্ষাত মুজিবে বাদী পান্ডা ফজলুর রহমান ও তাঁর সঙ্গিরা তাকে নিসংসভাবে হত্যা করেছিল।

তাই আপনাদের কাছে আমার বন্ধু শাহ্‌জাহান হত্যার সুষ্ঠ বিচার করিতে সরকারকে অনুরোধ করিবেন।

অপর পৃষ্ঠায় আমার ঠিকানা দেওয়া আছে। যোগাযোগ করিবেন।

ইতি
আসাদ

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত। এই পর্বের আরো কিছু তথ্য সংযোজিত হবে পরবর্তী সংস্করণে)।